ইসলাম ও নারী মুক্তি আন্দোলন ঃ প্রেক্ষাপট বাংলাদেশ (১৯০০-২০০০)

তত্ত্বাবধায়ক

ড.আ.ন.ম.রইছ উদ্দিন
অধ্যাপক
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

GIFT

গবেষক

মোছাঃ শাহিদা খাতুন
এম.ফিল গবেষক
রেজিঃ নং- ১৯১/২০০৩-০৪
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

448487
Dhaka University Library
448487

এম.ফিল ডিগ্রীর জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়-২০০৯

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

প্রত্যয়ন পত্র

প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, **মোছাঃ শাহিদা খাতুন,** এম.ফিল. গবেষক, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, এম.ফিল. ডিগ্রী লাভের নিমিত্ত **ইসলাম ও নারী মুক্তি আন্দোলন ঃ প্রেক্ষাপট বাংলাদেশ (১৯০০-২০০০)** শীর্ষক অভিসন্দর্ভটির কাজ আমার প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে সম্পন্ন করেছে। আমার জানা মতে, গবেষকের উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভের সম্পূর্ণ কিংবা অংশ বিশেষ অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রী/ডিপ্লোমা লাভের জন্য কিংবা প্রকাশের জন্য উপস্থাপন করা হয়নি। সুতরাং এম.ফিল. ডিগ্রী প্রদানের নিমিত্ত অভিসন্দর্ভটি পরীক্ষকগণের নিকট প্রেরণের জন্য জমা নেয়ার সুপারিশ করছি।

২/১২/২৫/৫/০৯

(ড.আ.ন.ম. রইছ উদ্দিন)
অধ্যাপক
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

448487

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

অঙ্গীকারনামা

আমি এই মর্মে অঙ্গীকার করছি যে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হতে এম.ফিল ডিগ্রী অর্জনের নিমিত্ত উপস্থাপিত **ইসলাম ও নারী মুক্তি আন্দোলন ঃ প্রেক্ষাপট বাংলাদেশ (১৯০০-২০০০)** শীর্ষক গবেষণা অভিসন্দর্ভটি আমার পরম শ্রদ্ধেয় শিক্ষক ও তত্ত্বাবধায়ক **ড.আ.ন.ম. রইছ উদ্দিন,** অধ্যাপক, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়-এর প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় রচনা করেছি। এটা আমার মৌলিক গবেষণা কর্ম। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রী/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য অভিসন্দর্ভটির সম্পূর্ণ কিংবা অংশ বিশেষ উপস্থাপন করিনি।

শাহিদা খাতুন
১৬/২/০৭

(**মোছাঃ শাহিদা খাতুন**)
এম.ফিল. গবেষক
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

448487

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

পরম করুণাময় মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের অশেষ মেহেরবাণীতে **ইসলাম ও নারী মুক্তি আন্দোলন ঃ প্রেক্ষাপট বাংলাদেশ (১৯০০-২০০০)** শীর্ষক এম.ফিল. অভিসন্দর্ভটি উপস্থাপন করলাম। যথাসময়ে বিধি মোতাবেক অভিসন্দর্ভটি লক্ষ অর্জনের নিমিত্ত উপস্থাপন করতে পেরে আমি আল্লাহ রাব্বুল আল-আমিন এর নামে শুকরিয়া আদায় করছি। দরূদ ও সালাম পেশ করছি মানবতার মুক্তির দূত মহান নেতা শেষ নবী হযরত মুহাম্মাদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর উপর।

গবেষণা কর্মের আমার তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন আমার পরম শ্রদ্ধেয় শিক্ষক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের অধ্যাপক ড.আ.ন.ম. রইছ উদ্দিন। আমার পরম শ্রদ্ধেয় শিক্ষক অত্যন্ত কর্মব্যস্ত থাকা সত্ত্বেও তিনি আমার এই গবেষণা কাজ চালিয়ে যাওয়ার জন্য উৎসাহ ও উদ্দীপনা যুগিয়েছেন। তাঁর নিরন্তর, উৎসাহ, অনুপ্রেরণা ও সার্বক্ষণিক তত্ত্বাবধানের ফলেই আমার গবেষণা কর্ম সম্পন্ন করা সম্ভব হয়েছে। তাঁর মূল্যবান পরামর্শ ও দিক নির্দেশনার ফলে অভিসন্দর্ভটি মান সম্পন্ন হয়েছে। আমার গবেষণাপত্র প্রস্তুতির কাজ দেখা ও সময়োচিত উপদেশ প্রদানের জন্য তাঁর কাছে চিরকৃতজ্ঞতা ও শ্রদ্ধা জানাই এবং গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করি বিভাগীয় শিক্ষকদের প্রতি। সেই সাথে আমি তাঁদের সুস্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু কামনা করি।

আমার গবেষণার কাজে আমাকে অনেকেই নানাভাবে সহযোগিতা করেছেন, উৎসাহিতও করেছেন এবং অনেকের দ্বারাই আমি অনুপ্রাণিত হয়েছি। তাঁদের মধ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের শিক্ষক মাসুদ আলম অন্যতম। এছাড়া গবেষণা কাজের প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত যিনি আমাকে সর্বাত্তক সাহায্য সহযোগিতা ও অনুপ্রেরণা যুগিয়েছেন তিনি হলেন এশিয়ান ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ-এর শিক্ষক ড. মোঃ আবুল বাসার। উভয়েরই সক্রিয় সহযোগিতা, উৎসাহ ও আগ্রহ আমার গবেষণা কাজের গতি বৃদ্ধি করেছে। তাই আমি তাঁদের সবাইকে জানাই আমার আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা।

আমি গভীর চিত্তে কৃতজ্ঞতা জানাই আমার স্বামী মোঃ শফিউল্লাহ-কে এবং আদর ও ভালোবাসা আমার ছেলে ও মেয়েকে। আমার গবেষণা কর্মের সম্পূর্ণ অনুপ্রেরণা ও সাহায্য-সহযোগিতা করেছেন আমার স্বামী। আমি স্বকৃতজ্ঞ চিত্তে মহান আল্লাহর দরবারে তাঁর জীবনে সুখ-শান্তি উন্নয়ন ও অগ্রগতি কামনা করছি।

সর্বোপরি যিনি আমার এ গবেষণা কর্মে টাইপ কম্পোজ করে আমাকে কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করেছেন তিনি আমার স্বামী মোঃ শফিউল্লাহ। আমি তাঁর কাছে আবারও আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানাই।

(মোছাঃ শাহিদা খাতুন)
এম.ফিল.গবেষণা
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

Dhaka University Institutional Repository

শব্দ সংকেত

আঃ	ঃ	আলাইহিস সালাম/আদম/আরব/আরবী
সাঃ	ঃ	সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম
রাঃ	ঃ	রাযী আল্লাহু আনহু/আনহা
বাং	ঃ	বাংলা
সং	ঃ	সংস্করণ
লি.	ঃ	লিমিটেড
ব	ঃ	বঙ্গাব্দ
ইং	ঃ	ইংরেজী
হিঃ	ঃ	হিজরী
রহঃ	ঃ	রহমতুল্লাহহি আলাইহি
খ	ঃ	খন্ড
খ্রিঃ	ঃ	খ্রিষ্টাব্দ
অনুঃ	ঃ	অনুবাদ/অনুমোদন/অনুবাদক
অনূঃ	ঃ	অনুদিত
সম্পা	ঃ	সম্পাদক/সম্পাদনা/সম্পাদিত
খ্রি.পূঃ	ঃ	খ্রিষ্টপূর্ব
পৃঃ	ঃ	পৃষ্ঠা
ইফাবা	ঃ	ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ
ইবি	ঃ	ইসলামী বিশ্বকোষ
তাবি	ঃ	তারিখ বিহীন
P.	:	Page/Pages
op.cit	:	operae citio
Vol.	:	volume
Jasb	:	Journel of Asiatic Society of Bengal
Ed	:	Edition

Dhaka University Institutional Repository

সূচীপত্র

ভূমিকা ----------(১-৪)

প্রথম অধ্যায়

প্রাক ইসলাম বিভিন্ন সভ্যতা ও সংস্কৃতিতে নারীর অবস্থান ----------(৫- ৩২)

দ্বিতীয় অধ্যায়

ইসলামে নারীর অবস্থান ও মর্যাদা ----------(৩৩-৬০)

তৃতীয় অধ্যায়

ইসলামে নারী মুক্তি আন্দোলনের ইতিহাস ও প্রকৃতি ---------- (৬১-৯৮)

চতুর্থ অধ্যায়

নারী মুক্তি আন্দোলন ও আধুনিক মতামত ----------(৯৯-১৩৬)

পঞ্চম অধ্যায়

বাংলাদেশের সামাজিক প্রেক্ষাপটে নারীর অবস্থান ও ইসলাম ----------(১৩৭-১৭০)

ষষ্ঠ অধ্যায়

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে নারী মুক্তি আন্দোলনের গতিধারা ----------(১৭১-২২০)

গ্রন্থিপঞ্জি ----------(২২১-২২৮)

Dhaka University Institutional Repository

ভূমিকা

ইসলামের অভ্যুদয়ের যুগে প্রাচীন মানব সমাজগুলোতে এবং ইসলামের অভ্যুদয়ের পরে মধ্যযুগীয় ইউরোপে ও আধুনিক ইউরোপে নারীর আইনগত ও সামাজিক মর্যাদা পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, নারীর প্রতি সদয় অথবা নিষ্ঠুর আচরণে এক জাতির সাথে আরেক জাতির এবং এক আইনের সাথে আরেক আইনের যতই পার্থক্য ও বৈপরিত্য থাকুক না কেন, ইসলামের অভ্যুদয়ের পূর্বে নারী কখনো কোন সমাজে তার যথাযোগ্য সামাজিক ও আইনগত মর্যাদা লাভ করেনি। আবার কোন সময় এ সুযোগ প্রদান করা হলেও সাথে সাথে উচ্ছৃংখলতা ও চরিত্রহীনতায় নিমজ্জিত নারীকে পাশবিক প্রবৃত্তিতে পরিণত করা হয়েছে। রোমান সমাজে নারীর অবস্থা অত্যন্ত নিকৃষ্ট ছিল। তাদেরকে কৃতদাসীদের চেয়েও নিকৃষ্টরূপে গণ্য করা হতো। সে সময় তারা নারীর মানব সত্তাকে স্বীকার করত না। বরং তারা নারীকে মানুষ ও প্রাণীর মাঝা-মাঝি কোন বিশেষ শ্রেণী বা প্রজাতি মনে করত। রোমানদের কাছে নারীরা ছিল অপবিত্র বস্তু/জন্তু , তাদের আত্মার কোন অস্তিত্ব নেই। প্রাচীন গ্রীক সমাজে নারী ছিল অত্যন্ত ঘৃণিত, অবহেলিত ও অসামাজিক বস্তু। গ্রীক সভ্যতায় নারীর কোন অধিকার ছিল না। নারীরা ছিল সন্তান প্রসবের যোগ্য ক্রীতদাসী, গৃহের মধ্যে বিচিত্র, শিক্ষা হতে বঞ্চিত, স্বামীর অস্থাবর সম্পত্তি ছাড়া বেশী কিছু নয়। তারা মনে করতো বংশধারা সংরক্ষণ এবং সন্তান লালন-পালনের জন্যেই নারীদের সৃষ্টি করা হয়েছে। এর বাইরে নারীদের কোন ক্ষেত্র থাকতে পারে না। চীনদেশে নারীদের সামাজিক নিরাপত্তা ও মর্যাদা সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট ছিল। নারী কোন সম্পত্তির অধিকারী হতে পারত না। এমনকি তার সন্তানদিগের উপরও কোন অধিকার থাকত না। স্বামীর যখন ইচ্ছা তখনই স্ত্রীকে তালাক দিতে পারত এবং অপরের উপ-পত্নীরূপে তাকে বিক্রিও করতে পারত। বিধবা হলে তাকে স্বামীর পরিবারের সম্পত্তিরূপে জীবন যাপন করতে হত এবং পুনঃ বিবাহ তার জন্য প্রায় অসম্ভব ছিল।

ভারতীয় উপমহাদেশেও ইসলামের আবির্ভাবের পূর্বে নারী জাতির অবস্থা অতীব শোচনীয় ছিল। নারী পাপ এবং নৈতিক চরিত্র ও আধ্যাত্মিকতা ধ্বংসের মূল উৎস বলে বিবেচিত হত। সুতরাং তাকে সর্বদা শাসনাধীনে রাখাই ছিল আসল রীতি। মনু'র মতে তাকে দিবা-রাত্র অবশ্যই পুরুষের কড়া শাসনে রাখা আবশ্যক। কারণ, নারী জন্মগতভাবেই দুশ্চরিত্রা ও লম্পট। অতএব, তাকে কঠোর শাসনে না রাখলে সে অবশ্যই বিপথগামী হবে।

Dhaka University Institutional Repository

বর্তমান বিশ্বে ইউরোপে সবচেয়ে বড় দাবীদার হচ্ছে নারী ও পুরুষের সমঅধিকার। অথচ সে ইউরোপেই এক শতাব্দীর কিছুকাল পূর্বেও নারী পুরুষের অত্যাচার, জুলুম ও উৎপীড়নের শিকার ছিল। এমন কোন দৃঢ় আইনগত বিধান ছিল না যাতে নারীগণ পুরুষের নির্মম অত্যাচার হতে রেহাই পেতে পারত। নারী নির্যাতনের সমাধান হিসেবে পশ্চিমা বিশ্ব সমস্ত পৃথিবী ব্যাপী ফ্রিডম বা স্বাধীনতার ধ্যান-ধারণাকে জোরের সাথে প্রচার করলেও প্রকৃতপক্ষে স্বাধীনতার মিথ্যা শ্লোগানে জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপে পশ্চিমের নারী হয়েছে এক অভিনব দাসত্বের শিকার। তৎকালে নারীদের আদান-প্রদানের ক্ষেত্রে কোন ধরণের স্বাধীনতা ছিল না। তৎকালে নারীদের কাজ কর্মের ক্ষেত্রে কোন প্রকার স্বাধীনতা ছিল না। মেয়েদেরকে পিতা-মাতার সম্পদ মনে করত। পিতা-মাতা যার সাথে ইচ্ছা বিবাহ দিতে পারত।

পৃথিবীর অন্যান্য ধর্মের তুলনায় একমাত্র ইসলামে নারীর অবস্থা অধিকতর উন্নত, সম্মানজনক ও মর্যাদাপূর্ণ ছিল। কিন্তু ইসলাম পূর্ব সমাজে অর্থাৎ মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সঃ) এর আবির্ভাবের পূর্বে নারী ছিল অবহেলিত, অমর্যাদাকর, লাঞ্ছিত, অবাঞ্ছিত, অপমানিত, জঘন্য প্রাণীর চেয়েও নিকৃষ্ট। জাহেলিয়া যুগে নারী ছিল ঘৃণিত, মর্যাদা বহির্ভূত এবং অধিকারহীন ও মূল্যহীন। তারা মানবরূপে পরিগণিত ছিল না। পুরুষ ও জীবজন্তুর মধ্যস্থলে ছিল নারীদের অবস্থান। কন্যা সন্তান জন্ম হলে সে পরিবারের এক চরম অভিশাপ বলে গণ্য হত। ইসলামের আবির্ভাবের পূর্বে পুরুষের অধিকৃত বিষয় সম্পদের মধ্যে নারীর সাথে পশুর ন্যায় ব্যবহার করা হত। নারীর মর্যাদা এত নীচে ছিল যে, তাদের তুলনায় পশুদের প্রতি অধিকতর সুনজর দেয়া হত। আরবের নারীরা এমন নিদারুণ অবস্থায় নিপতিত ছিল যে, দুনিয়ার অপর কোন জাতিই আরবের ন্যায় নারীদেরকে এত অধিক অপমানিত ও নির্যাতিত করত না। কন্যা সন্তান জন্মকে আরবরা কুলক্ষণ ও অপমানজনক মনে করত। নবজাত কন্যা সন্তান হত্যার নীতি বহুলভাবে প্রচলিত ছিল। কন্যা সন্তানদের জীবন্ত কবর দেয়া হত। পণ্য দ্রব্যের মত বিক্রয় করা হত এবং পশুর বদলে বিনিময় করা হত। আরবরা এ ধরণের কার্য করার কারণ হিসেবে কন্যা সন্তানকে অপমানজনক ও অমর্যাদাকর ধারণা করত।

ইসলামপূর্বে কোন ধর্ম, সমাজ, জাতি ও সভ্যতায় নারীর কোন সম্মান, মর্যাদা, নিরাপত্তা ও উত্তরাধিকারিতা ছিল না। ইসলামই প্রথম উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত পিতা বা স্বামীর সম্পত্তিতে নারীর মৌলিক অধিকার প্রদান এবং প্রাক-ইসলাম যুগের নারী পুরুষের অবৈধ সম্পর্ককে নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। ইসলামী সভ্যতা এবং ধ্যান-ধারণা বিকাশের সাথে সাথে নারীর জীবন যাত্রার মান উন্নত হয়

Dhaka University Institutional Repository

এবং সমাজের প্রতিটি স্তরে তার প্রভাব বিস্তার লাভ করে। পরবর্তীকালে দেখা যায় যে, পুরুষের পাশাপাশি নারীরাও সম্মুখ সমরে অংশ গ্রহণ করেছে।

ঐতিহ্যগতভাবে বাংলাদেশ মুসলিম প্রধান একটি দেশ। এর শতকরা ৮৮.৩ ভাগ জনগণই ইসলাম ধর্মের অনুসারী মসুলমান। তথাপি দেখা যায় এ বিষয়ে ইসলামের নীতিমালাগুলো পূর্ণাঙ্গভাবে অনুসরণ করা হচ্ছে না। যা কিছু অনুসরণ করা হচ্ছে তা নিতান্তই ইসলামের একটি খন্ডিত কিংবা বিকৃত রূপ মাত্র। এক্ষেত্রে ইসলামের নীতিমালা অনুসরণ না করার অনিবার্য পরিণতি হিসেবেই অব্যাহত গতিতে আমাদের দেশে বেড়ে চলেছে নারী নির্যাতন, যৌতুক প্রথা, যৌতুকের জন্য দৈহিক ও মানসিকভাবে চাপ প্রয়োগ, অপহরণ, জোরপূর্বক পতিতা বৃত্তিতে নিয়োগ, ধর্ষণ, ইচ্ছার বিরুদ্ধে বিয়ে, এসিড নিক্ষেপ, বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ, বিদেশে পাচার, তালাক, ধর্ষণ করতে গিয়ে মৃত্যুর ঘটনা বা জখম করা ইত্যাদি অপরাধগুলো ব্যাপক আকার ধারণ করছে। বাংলাদেশের আর্থ সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটে ইসলামী মূল্যবোধের অনুপস্থিতি কিংবা অবমূল্যায়নই আমাদের দেশে নারী নির্যাতনকে আরো তরান্বিত করছে। এতে দেখা যায় পুরুষ শাসিত সমাজ ব্যবস্থায় বাংলাদেশে নারীদেরকে পুরুষদের অপেক্ষা হীন মনে করা হয়। এখানে নারীর সঠিক মূল্যায়ন হয় না বলেই তাদের দূর্বলতার সুযোগ নিয়ে পুরুষরা নির্যাতন চালায়। নারী নির্যাতনে নিরক্ষরতা ও অজ্ঞতা অনেকাংশে দায়ী। ইসলাম ধর্ম ও বাংলাদেশের সংবিধানে নারী-পুরুষের সমান অধিকার থাকলেও নিরক্ষর জনগোষ্ঠী এ সত্য কথাটি জানে না। আবার নারীরাও তাদের অধিকার সম্পর্কে তেমন একটা সচেতন নয়। তাই তারা অহরহ নির্যাতনের শিকার হচ্ছে।

মধ্যযুগে মুসলমানরা যখন বাংলার শাসন শুরু করেন তখন তারা সম্পূর্ণ আলাদা বৈশিষ্টসম্পন্ন ধর্ম, আচার-আচরণ ও জীবন ব্যবস্থা নিয়ে এলেন এবং বাংলার সংস্কৃতির সঙ্গে কোনভাবেই নিজেদের ঐতিহ্যকে বিলীন করে দিলেন না। ইসলাম নারীর জন্য যে সকল সামাজিক ধর্মীয় ও রাষ্ট্রীয় অধিকার দিয়েছে তা সেই সময়ের তুলনায় অনেক উদার এবং সমগ্র নারী সমাজের জন্য মঙ্গলজনক ছিল। ইসলামে নারী নির্যাতন রোধ করার কথা ঘোষণা করা হয়। যেসব ক্ষেত্রে ইসলাম নারীকে অধিকার প্রদান করেছে, সেটুকু অধিকার কিন্তু তৎকালীন বাংলার মুসলিম শাসকরা বাংলার নারীদের ভোগ করতে দিতেন না। ইসলামের বিধান অনুসারে পাঠান ও মোঘল শাসনামলে বাংলার নারী সমাজের মূল্য কোনভাবেই বৃদ্ধি পায়নি।

Dhaka University Institutional Repository

বাংলার জাতীয় জাগরণ, শিক্ষা আন্দোলন ও স্বদেশী আন্দোলন তথা ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের মাধ্যমেই পাক ভারত উপমহাদেশে ক্রমান্বয়ে নারী জাতি, সমাজ ও শিক্ষাঙ্গনে তাঁদের অবস্থান করে নিতে চেষ্টা করেছিল। ব্রিটিশ ও হিন্দুদের মুসলিম বিদ্বেষী পরিবেশ, সীমিত সুযোগ, পরিবেশের বাঁধা সামাজিক পশ্চাৎপদতা সত্ত্বেও এই জাগরণের মধ্য দিয়ে বেশ কিছু নারী ব্যক্তিত্বের নাম জানা যায়। সে সকল নারীরা, নারীর অধিকার, মানুষ হিসেবে নারীর মর্যাদা, অবরোধ প্রথা দূর করা, স্ত্রী শিক্ষাবিস্তার, এসব নিয়ে আন্দোলন করেছেন। তাদের মধ্যে জোবেদা খাতুন, শামসুন্নাহার মাহমুদ, বেগম লিয়াকত আলী খান, বেগম নূরুল আমিন, হামিদা বেগম, নাইয়ার বানু, মমতাজ বেগম, দৌলতননেসা, নূরজাহান মুরর্শিদ, বদরুন্নেসা আহমদ, আমেনা বেগম, সেলিনা বানু, রাজিয়া বানু, তফতুন্নেসা, মেহেরুন্নেসা খাতুন, বেগম রোকাইয়া আনোয়ার, বেগম মমিনুন্নেসা, বেগম জি.এ.খান, মালেকা বেগম, বেগম সুফিয়া কামাল, বেগম ফয়জুন্নেসা, বেগম রোকেয়া, তাহেরুন্নেসা, লুৎফুন্নেসা, খায়রুন্নেসা, সাহিফাবানু, রাজিয়া খাতুন চৌধুরানী, নূরুন্নেসা খাতুন, আকিকুন্নেসা আহমদ, মোতাহেরা বানু, ড.মালিহা খাতুন, মাহমুদা খাতুন, জেব-উন-নেসা আহমদ, মিসেস রাজিয়া মজিদ প্রমুখ ছিলেন অন্যতম। সুতরাং পর্যালোচিত বিষয়বস্তু অবয়বকে যথার্থভাবে ফুটিয়ে তোলার জন্য এটাকে মোট ৬টি অধ্যায়ে বিভক্ত করে বহু উপ-শিরোনামে সাজানো হয়েছে। যেমন- প্রথম অধ্যায়ে প্রাক ইসলাম বিভিন্ন সভ্যতা ও সংস্কৃতিতে নারীর অবস্থান, দ্বিতীয় অধ্যায়ে ইসলামে নারীর অবস্থান ও মর্যাদা; তৃতীয় অধ্যায়ে ইসলামে নারী মুক্তি আন্দোলনের ইতিহাস ও প্রকৃতি; চতুর্থ অধ্যায়ে নারী মুক্তি আন্দোলন ও আধুনিক মতামত; পঞ্চম অধ্যায়ে বাংলাদেশের সামাজিক প্রেক্ষাপটে নারীর অবস্থান ও ইসলাম; ষষ্ঠ অধ্যায়ে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে নারী মুক্তি আন্দোলনের গতিধারা (১৯০০-২০০০) ও মূল্যায়ন এবং পরিশেষে সহায়ক গ্রন্থাবলীর একটি তালিকা প্রণয়ন করে অভিসন্দর্ভের সমাপ্তি টানা হয়েছে।

(মোছাঃ শাহিদা খাতুন)
এম.ফিল. গবেষক
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অধ্যায়

প্রাক ইসলাম বিভিন্ন সভ্যতা ও সংস্কৃতিতে নারীর অবস্থান

Dhaka University Institutional Repository

প্রাক ইসলাম বিভিন্ন সভ্যতা ও সংস্কৃতিতে নারীর অবস্থান

ইসলামের অভ্যুদয়ের যুগে প্রাচীন মানব সমাজগুলোতে এবং ইসলামের অভ্যুদয়ের পরে মধ্যযুগীয় ইউরোপে ও আধুনিক ইউরোপে নারীর আইনগত ও সামাজিক মর্যাদা কীরূপ ছিল ও আছে, সর্বপ্রথম তার ঐতিহাসিক পর্যালোচনা করা জরুরী মনে করছি। নারীর এ আইনগত ও সামাজিক অবস্থা যিনিই ন্যায়নিষ্ঠাভাবে পর্যালোচনা করবেন, তার কাছে এ কথা দিবালোকের মত স্পষ্ট হয়ে উঠবে যে, নারীর প্রতি সদয় অথবা নিষ্ঠুর আচরণে এক জাতির সাথে আরেক জাতির এবং এক আইনের সাথে আরেক আইনের যতই পার্থক্য ও বৈপরিত্য থাকুক না কেন, ইসলামের অভ্যুদয়ের পূর্বে নারী কখনো কোন সমাজে তার যথাযোগ্য সামাজিক ও আইনগত মর্যাদা লাভ করেনি। আবার কোন সময় এ সুযোগ প্রদান করা হলেও সাথে সাথে উচ্ছৃংখলতা ও চরিত্রহীনতায় নিমজ্জিত নারীকে পাশবিক প্রবৃত্তিতে পরিণত করা হয়েছে। আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মাদ (সঃ) এর আবির্ভাবের পূর্বে বিভিন্ন সভ্যতা ও সংস্কৃতিতে নারীর অবস্থান, নিরাপত্তা ও মর্যাদা সম্পর্কে নিম্নে আলোকপাত করা হল ঃ-

রোমান সভ্যতায় নারী ঃ

প্রাচীন রোমান সমাজে এরূপ প্রথা প্রচলিত ছিল যে, সন্তান ছেলে হোক বা মেয়ে হোক- তাকে পরিবারের অন্তর্ভূক্ত করতে পিতা বাধ্য থাকতো না। প্রচলন ছিল যে, "শিশু ভূমিষ্ঠ হবার পর তাকে পিতার পায়ের কাছে রাখা হতো। পিতা যখন তাকে ধরে ওপরে তুলতো, তখন প্রমাণিত হতো যে, সে তাকে আপন পরিবারের অন্তর্ভূক্ত করে নিয়েছে, অন্যথায় ধরে নেয়া হতো যে, পিতা তাকে প্রত্যাখ্যান করেছে। সে ক্ষেত্রে শিশুকে কোন খোলা ময়দানে অথবা উপাসনালয়ের বেদীতে রাখা হতো। ছেলে হলে পরবর্তী সময়ে কেউ ইচ্ছা করলে তাকে গ্রহণ করতো, নচেত শিশুটি ক্ষুধা, পিপাসায়, গরমে কিংবা শীতে ধুকে ধুকে মরতো।" [১]

১। ড. মুস্‌তাফা আস্ সিবায়ী, ইসলাম ও পাশ্চাত্য সমাজে নারী, বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ঢাকা, ডিসেম্বর-২০০৪ , পৃষ্ঠা-১০।

Dhaka University Institutional Repository

রোমান সমাজে নারীর অবস্থা অত্যন্ত নিকৃষ্ট ছিল। তাদেরকে কৃতদাসীদের চেয়েও নিকৃষ্টরূপে গণ্য করা হতো। সে সময় তারা নারীর মানব সত্তাকে স্বীকার করত না। বরং তারা নারীকে মানুষ ও প্রাণীর মাঝা-মাঝি কোন বিশেষ শ্রেণী বা প্রজাতি মনে করত। রোমানদের কাছে নারীরা ছিল অপবিত্র বস্তু/জন্তু , তাদের আত্মার কোন অস্তিত্ব নেই। Dr. Jamal A. Badawi বলেছেন, "In the 7th century, the clergy in Rome decided that women had no soul and would therefore not enter paradise." [২] (সপ্তদশ শতাব্দীতে রোমের পাদরীগণ এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন যে, নারী জাতির আত্মা নেই। সুতরাং তারা স্বর্গে প্রবেশ করবে না।)

Encyclopedia Britanicac-তে রোমানীয় সভ্যতায় নারীর সামাজিক অধিকারের সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নরূপঃ- "In Roman law a woman ..... if married she and her property passed into the power of her husband ..... the wife was the purchased property of her husband and like a slave acquired only for his benefit.

A woman could not exercise any civil of public office ..... could not be a witness, surety, tutor or curator; she could not adopt or be adopted or make will or contract." [৩](রোমীয় আইনে একজন বিবাহিতা রমণীর অধিকার ছিল.....সে নিজে এবং তার ধন-সম্পত্তি তার স্বামীর কর্তৃত্বাধীনে চলে যেত, স্ত্রী ছিল তার স্বামীর কেনা-সম্পত্তি। ক্রীতদাসীর মতই তাকে স্বামীর লাভের জন্যে আনা হত। সিভিল অথবা সাধারণ কোন অফিস পরিচালনা করার কোন অধিকার কোন নারীর ছিল না। সে সাক্ষী হতে পারতো না, পারতো না কারো জামিনদার, অভিভাবক বা তত্ত্বাবধায়ক হতে পারত না। সে অর্পণকারিনী বা অর্পিতাও হতে পারত না অথবা কোন উইলকার বা চুক্তিপত্র করার অধিকারও তার ছিল না।)

২। Encyclopedia Britanicac, 11th ed. 1911, Vol-28, P-782.

৩। Quoted in Mace, Dovid and vera, Marriage: East and West, Dolphin Books, Double day and co. lne Ng.1960, P-82.

Dhaka University Institutional Repository

John Stuart Mill তার The subject of women এ লিখেছেন, "We are continuaslly told that civilization and Christianity have restored to the women her just rights. Meanwhile the wife is the actual bondservant of her husband; no less so, as far as the legal obligation goes, then slaves commonly so called." [৪] (আমাদেরকে বারবার বলা হচ্ছে যে, সভ্যতা ও খৃষ্টধর্ম নারী জাতির যথাযোগ্য অধিকার পুনঃস্থাপিত করেছে। স্ত্রী হচ্ছে তার স্বামীর প্রকৃত কৃতদাসী, এর চেয়ে সে কম নয়। বৈধ আইনে যতদূর বাধ্য-বাধকতা আছে তাতে নারীকে ক্রীতদাসীই বলা হতো।)

অর্থনৈতিক যোগ্যতার দিক দিয়ে কন্যা শিশুর আদৌ কোন মালিকানা অধিকার থাকতো না। সে কোন অর্থ উপার্জন করলেই সেটা পরিণত হতো পরিবার প্রধানের একটা বাড়তি সম্পত্তিতে। এমনকি মেয়ের বয়োপ্রাপ্তি কিংবা বিয়ে হয়ে গেলেও তার কোন মালিকানা থাকতো না। পরবর্তীকালে সম্রাট কনস্টানটাইনের শাসনামলে স্থির হয় যে, মেয়ে যে সম্পত্তি তার মায়ের উত্তরাধিকার হিসেবে পারে, তা তার পিতার সম্পত্তি হবে না, বরং মেয়ের সম্পত্তি হবে। তবে পিতা সে সম্পত্তি ব্যবহার করতে পারবে। মেয়ে যখন পিতার আনুগত্য থেকে মুক্ত হবে, তখন পিতা তার সম্পত্তির এক তৃতীয়াংশ নিজের মালিকানাধীন করে নিতে পারবে এবং বাকী দুই তৃতীয়াংশ মেয়ের থাকবে। পরিবারপ্রধান মারা গেলে বয়োপ্রাপ্ত পুত্রসন্তান স্বাধীন হয়ে যেত। কিন্তু যুবতী কন্যা স্বাধীন হতো না। কন্যা যতদিন বেঁচে থাকতো, ততদিন অন্য একজন অভিভাবক তার মনিব হতো। পরবর্তীকালে এ বিধি সংশোধিত হয়। আইনগত অভিভাবকের দাসত্ব থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য এরূপ কৌশল প্রবর্তন করা হয় যে, নারী নিজেকে নিজের মনোপুত কোন অভিভাবকের কাছে বিক্রি করে দেবে এবং উভয়ের মধ্যে এ মর্মে চুক্তি হবে যে, এ আত্মবিক্রির উদ্দেশ্য হলো পূর্ববর্তী মনিবের কাছ থেকে স্বাধীনতা লাভ করা। এ চুক্তির কারণে নতুন মনিব তাকে তার পছন্দমত যে কোন কাজে বাধা দিত না। আর যদি যুবতী কন্যা বিয়ে করে, তবে তাকে তার স্বামীর সাথে সার্বভৌমত্ব চুক্তি নামে একটা চুক্তি সম্পাদন করতে হতো। অর্থাৎ স্বামীকে স্ত্রীর উপর নিরংকুশ কর্তৃত্ব দিতে হতো। [৫]

৪। Encyclopedia Britanicac, Vol-19, 1974, P-909.

৫। ড. মুস্তাফা আস্ সিবায়ী, প্রাগুক্ত, পৃ-১১-১২।

Dhaka University Institutional Repository

বিশ্বকোষ ব্রিটানিকার পরবর্তী সংস্করণে উল্লেখ রয়েছে ঃ "in ancient Rome, a woman's legal position was on of complete subordination, first to the power of her father of brother and later to that of her husband, who held paternal power over his wife. In the eye of the law, women were regarded as imbeciles. This enabled them in certain circumstance to plead ignorance of the law as extenuationg one circumstance but it 7 rendered them unfit to sign a contract or will of to act as witness. Nor could they hold any public office." [৬] (প্রাচীন রোমদেশে নারী জাতির বৈধ অবস্থান ছিল, সে ছিল পরিপূর্ণ পরাধীন। সে প্রথমে তার বাপের অথবা তার ভাইয়ের অধীনে থাকতো, অতঃপর তার স্বামীর কর্তৃত্বাধীন চলে যেত। স্বামী তার স্ত্রীর উপর কর্তৃত্ব করার পৈত্রিক ক্ষমতা লাভ করত। আইনের দৃষ্টিতে নারী জাতিকে নির্বোধ বা দুর্বলচেতা গণ্য করা হতো। নারীর এ নির্বুদ্ধিতা তাকে নির্দিষ্ট কোন অবস্থায় আইন অমান্য করার ক্ষেত্রে দোষের অভিযোগ অস্বীকার করার সমর্থনে বাদানুবাদ করতে সক্ষম করতো এবং ইহা নারীর জন্যে দোষ লঘু করার অবস্থা বিবেচিত হতো। কিন্তু এতে তার কোন চুক্তিপত্রে সই করা বা উইল করা বা সাক্ষ্য দেয়ার কাজ করার অযোগ্য প্রমাণিত হতো। আর তারা জনসাধারণের কোন অফিস পরিচালনা করতেও পারতো না।)

গ্রীক সভ্যতায় নারী ঃ

প্রাচীন গ্রীক সমাজের নারীকেই প্রথম সভ্য নারী বলা চলে। তার সতীসাধ্বী ছিল এবং গৃহের বাইরে বের হতো না। কিন্তু গ্রীক সভ্যতায় নারী সম্পর্কে তাদের মূল্যায়ন অত্যন্ত ভয়াবহ ও শোচনীয়। প্রাচীন গ্রীক সমাজে নারী ছিল অত্যন্ত ঘৃণিত, অবহেলিত ও অসামাজিক বস্তু। তা সক্রেটিসের ভাষায় বেশ সুন্দররূপে পরিস্ফুট হয়ে উঠেছিল। তিনি বলেন, "Woman is the greatest source of choose and disruption in the world. She like the Daffodil tree which outwardly look very beautiful. but if sparrows eat it they die without fail." অর্থাৎ "নারী জগতে বিশৃঙ্খল ও ভাঙ্গনের সর্বশ্রেষ্ঠ উৎস। সে দাফালি বৃক্ষের ন্যায়, যা বাহ্যত খুব সুন্দর দেখায়। কিন্তু চড়ুই পাখি ইহা ভক্ষণ করলে এদের মৃত্যু অনিবার্য।" [৭]

৬। আব্দুল খালেক, নারী, সীনা পাবলিকেশন্স, ৯৩, মতিঝিল, ঢাকা, পৃ-৫।

৭। আব্দুল খালেক, নারী ও সমাজ, সীনা পাবলিকেশন্স, ফেব্রুয়ারী, ১৯৯৯, পৃ-৯২-৯৩

Dhaka University Institutional Repository

সে সময় বিয়েতে নারীর মতামত দেয়ার অধিকার ছিল না। এথেন্সে এ সম্পর্কে বলা হয়েছে,- "Athenian women were always minors, subject to some male, to their father, to their brother or to some of their male kind." [৮] (অর্থাৎ বিয়েতে নারীর মতামত দেয়ার অধিকার ছিল না। কাজেই বিয়েতে সাধারণতঃ তাদের সম্পত্তি নেয়ার প্রয়োজন আছে বলে মনে করা হতো না।) উক্ত বইতে আরো বলা হয়,- "She was obliged to submit to the wishes of her lord, even though he was stranger to her." [৯]

গ্রীক সভ্যতায় নারীর কোন অধিকার ছিল না। নারীরা ছিল সন্তান প্রসবের যোগ্য ক্রীতদাসী, গৃহের মধ্যে বিচিত্র, শিক্ষা হতে বঞ্চিত, স্বামীর অস্থাবর সম্পত্তি ছাড়া বেশী কিছু নয়। নারীর অধিকারের সংক্ষিপ্ত বিবরণ বর্তমান বিশ্বকোষে ব্রিট্যানিকায় উল্লেখ রয়েছে- "Woman's status had degenerated to that of childbearing slaves. Wives were secluded in their homes had no education and few rights and were considered by their husbands on better than cattle" [১০] (নারীর মর্যাদা অঃপতিত হয়ে এমন এক পর্যায়ে পৌছেছিল যে নারীদেরকে কেবলমাত্র সন্তান প্রসবের যোগ্যা ক্রীতাদাসী মনে করা হতো। তাদেরকে বিচ্ছিন্ন করে ঘরের মধ্যে রাখা হতো। জ্ঞান অর্জনের কোন অধিকার তাদের ছিল না। অন্য কোন অধিকার ছিল না বললেই চলে। স্বামীদের কর্তৃক স্ত্রীদের-কে অস্থাবর সম্পত্তি ছাড়া আর কিছু মনে করা হতো না।)

গ্রীক সমাজে নারীদের সামাজিক অবস্থা নিয়ে ফ্রান্সের প্রখ্যাত চিন্তাবিদ Geustavele Bond তাঁর Arad civilization বইতে লিখেছেন: "গ্রীকদের কাছে নারীরা ছিল সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ঠতম জীব। তারা মনে করতো বংশধারা সংরক্ষণ এবং সন্তান লালন-পালনের জন্যেই নারীদের সৃষ্টি করা হয়েছে। এর বাইরে নারীদের কোন ক্ষেত্র থাকতে পারে না। গ্রীক জনকরা প্রতিবন্ধী আপন সন্তানদের হত্যা করতেও কুষ্ঠাবোধ করত না। [১১]

৮। Attenc E.A. History of civilesation. Vol-3, P-344

৯। Dr. G lebon, Arab Civilization P-406, ইসলামের ছায়াতলে নারী, আসমাজাহান হেমা, আল-এছহাক প্রকাশনী, ২/৩ প্যারিদাস রোড, বাংলা বাজার, ঢাকা, অক্টো-২০০২, পৃ-৩১।

১০। Encyclopedia Britanicac in Propotion Encyclopedia Britanicac, Canada, Vol-19, 1974.

১১। Husain al-shaikh, Studies in the Greek and Romans Civilization. P-149.

Dhaka University Institutional Repository

অতপর গ্রীক সভ্যতা যখন উন্নতির উচ্চতর শিখরে আরোহন করলো, তখন নারীরা উচ্ছৃঙ্খল হয়ে উঠলো এবং পুরুষদের সাথে প্রকাশ্যে সভা সমিতিতে অবাধে মেলামেশা করতে লাগলো। ফলে নির্লজ্জতা এমনভাবে ছড়িয়ে পড়লো যে, ব্যভিচার আর দূষণীয় মনে হতো না। এমনকি এক পর্যায়ে বেশ্যালয়গুলো হয়ে উঠলো সাহিত্য ও রাজনীতির কেন্দ্রস্থল: "তারপর সাহিত্য ও শিল্পের নামে উলংগ মূর্তি স্থাপন করা হতে লাগলো। এরপর তাদের ধর্মও নারী ও পুরুষের অবৈধ সম্পর্ককে স্বীকৃতি দিয়ে বসলো। তাদের দেবী 'আফ্রোদাইতি' এক দেবতার স্ত্রী হয়েও তিনজন দেবতার সাথে যৌন সম্পর্ক স্থাপন করে। এমনকি একজন সাধারণ মানুষকেও সে নিজের উপপতি হিসেবে গ্রহণ করে এবং তার ঔরস থেকে সে 'কিওপিড' নামক যে সন্তান প্রসব করে, তা হয়ে দাঁড়ায় গ্রীক জাতির প্রেমের দেবতা। এতেও তাদের তৃপ্তি আসেনি। অবশেষে তারা পুরুষে পুরুষেও অস্বাভাবিক যৌন সম্পর্ক গড়ে তোলে এবং এর নিদর্শন স্বরূপ "হারমোডিস ও আরাসতোজেন" নামক অবৈধ সম্পর্ক স্থাপনকারী দুই পুরুষের মূর্তি স্থাপন করে। এ পর্যায়ে এসেই প্রাচীন গ্রীক সভ্যতার পতন ও বিলুপ্তি ঘটে।[১২]

ইউরোপীয় সভ্যতায় নারী ঃ

বর্তমান বিশ্বে ইউরোপে সবচেয়ে বড় দাবীদার হচ্ছে নারী ও পুরুষের সমঅধিকার। অথচ সে ইউরোপেই এক শতাব্দীর কিছুকাল পূর্বেও নারী পুরুষের অত্যাচার, জুলুম ও উৎপীড়নের শিকার ছিল। এমন কোন দৃঢ় আইনগত বিধান ছিল না যাতে নারীগণ পুরুষের নির্মম অত্যাচার হতে রেহাই পেতে পারত।[১৩] নারী নির্যাতনের সমাধান হিসেবে পশ্চিমা বিশ্ব সমস্ত পৃথিবী ব্যাপী ফ্রিডম বা স্বাধীনতার ধ্যান-ধারণাকে জোরের সাথে প্রচার করলেও প্রকৃতপক্ষে স্বাধীনতার মিথ্যা শ্লোগানে জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপে পশ্চিমের নারী হয়েছে এক অভিনব দাসত্বের শিকার।[১৪] তৎকালে নারীদের আদান-প্রদানের ক্ষেত্রে কোন ধরণের স্বাধীনতা ছিল না। তৎকালে নারীদের কাজ কর্মের ক্ষেত্রে কোন প্রকার স্বাধীনতা ছিল না। মেয়েদেরকে পিতা-মাতার সম্পদ মনে করত। পিতা-মাতা যার সাথে ইচ্ছা বিবাহ দিতে পারত।

১২। ড. মুস্তাফা আস্ সিবায়ী, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-১০।

১৩। সাইয়্যেদ জালাল উদ্দীন আনসার উমরী, ইসলামী রাষ্ট্রে নারীর অধিকার, সালাউদ্দিন বইঘর,বাংলা বাজার, ১৯৯৮, পৃ-১৮।

১৪। নারী নির্যাতন : ইসলামী সমাধান, খিলাফত প্রকাশনী, এইচ.এস. সিদ্দিক ম্যানশন, ঢাকা, ২০০৮, পৃ-৫।

Dhaka University Institutional Repository

তখন বিবাহ এমন একটি ব্যবসা ছিল যার মাধ্যমে পিতা-মাতা ছেলে মেয়েদের বিক্রি করত। নারী স্বাধীনতা বিশারদ নিশাদ বরদার মিইল (Mile) তাঁর "শাসিত নারী" বিষয়ক পুস্তকে লিখেছেন : ইউরোপীয় প্রাচীন ইতিহাসের পাতা উল্টালে জানতে পারা যায় যে, পিতা-মাতা তার মেয়ে সন্তানকে যে বিক্রি করে ফেলতো তা বেশী দিন আগের কথা নয়। তারা মেয়েদের ইচ্ছা ও মর্জির কোন তোয়াক্কাই করতো না। ইচ্ছে হলে বিক্রি করতো, ইচ্ছে হলেই অপাত্রে বিবাহ দিতো। যা খুশী তাই করতে পারতো। মেয়ে সন্তানের মতামত ও ইচ্ছার কোন মূল্যই দেয়া হতো না।[১৫]

চীনা সভ্যতায় নারী ঃ

প্রাচীন চীনা সভ্যতায় নারীদের মর্যাদা ও সামাজিক নিরাপত্তা ছিল অত্যন্ত জঘন্য ও নিকৃষ্টতম। চীনদেশেই নারীদের সামাজিক নিরাপত্তা ও মর্যাদা সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট ছিল। চীনের ধর্মগ্রন্থে নারীকে Waters of woe (দুঃখের প্রস্রবণ) হিসেবে বর্ণিত করে উল্লেখ রয়েছে- যা সকল সৌভাগ্য ভাসিয়ে নিয়ে যায়। নারী কোন সম্পত্তির অধিকারী হতে পারত না। এমনকি তার সন্তানদিগের উপরও কোন অধিকার থাকত না। স্বামীর যখন ইচ্ছা তখনই স্ত্রীকে তালাক দিতে পারত এবং অপরের উপ-পত্নীরূপে তাকে বিক্রিও করতে পারত। বিধবা হলে তাকে স্বামীর পরিবারের সম্পত্তিরূপে জীবন যাপন করতে হত এবং পুনঃ বিবাহ তার জন্য প্রায় অসম্ভব ছিল।[১৬]

চীন সমাজে নারীদের খুবই নগন্য মনে করা হতো। চীনা সমাজে নারীদের অবস্থা প্রাক-ইসলামীয় সমাজ থেকে মোটেও ভাল ছিল না। আবদুল খালেক তাঁর "নারী" বইতে লিখেছেন, "সে দেশে বালকেরা দরজার সম্মুখে এমনভাবে দাঁড়াত যেন তার স্বর্গ হতে আগত দেবতা, স্ত্রী, কন্যা সন্তান প্রসব করেছে এ সংবাদে কোন পিতাই আনন্দিত হত না। বালিকা বয়ঃপ্রাপ্ত হলে তার দৃষ্টি যেন কারও উপর পতিত না হয় তজ্জন্য বালিকাটি স্বীয় প্রকোষ্টে লুকায়িত থাকত। সে মৃত্যুবরণ করলে কেহই তার জন্য কান্না করত না।[১৭]

১৫। ড. ক্যাপ্টেন আব্দুল বাছেত, নারীর মর্যাদা; ইসলাম ও অন্যান্য ধর্মে, দৈনিক ইনকিলাব, ১১ এপ্রিল, ২০০৫, পৃ-১৩।

১৬। আবদুল খালেক, নারী, প্রাগুক্ত, পৃ-৬।

১৭। Romesh Chandra Mazumdar, "Ideal and Position of Indian Women in Domestic life." Great women of India (ed) Swamei and Mazumdar, P-19.

Dhaka University Institutional Repository

চীনা নারী সম্পর্কে Said Abdullah Seif Al-Hatimy লিখেছেন, "ব্যভিচারের ন্যায় অপরাধে স্বামী স্ত্রীকে তালাক দিতে পারত। তার মাতা-পিতা তাকে গ্রহণ করতে সম্মত হলে সে তাদের নিকট চলে যেত। অন্যথায় তাকে রাস্তায় বাহির করে দিত।"[১৮]

চীনদেশের নারীদের অবস্থা বর্ণনা করতে গিয়ে জনৈকা চীনদেশীয় নারী বলেন : "মানব সমাজে নারীদের স্থানই সর্বনিম্নে। ..... অদৃষ্টের কি নির্মম পরিহাস। নারী সর্বাপেক্ষা হতভাগ্য প্রাণী। জগতে নারী থেকে নিকৃষ্ট আর কিছুই নেই।" [১৯]

ভারতীয় সভ্যতায় নারী ঃ

ভারতীয় উপমহাদেশেও ইসলামের আবির্ভাবের পূর্বে নারী জাতির অবস্থা অতীব শোচনীয় ছিল। নারী পাপ এবং নৈতিক চরিত্র ও আধ্যাত্মিকতা ধ্বংসের মূল উৎস বলে বিবেচিত হত। সুতরাং তাকে সর্বদা শাসনাধীনে রাখাই ছিল আসল রীতি। মনু'র মতে তাকে দিবা-রাত্র অবশ্যই পুরুষের কড়া শাসনে রাখা আবশ্যক। কারণ, নারী জন্মগতভাবেই দুশ্চরিত্রা ও লম্পট। অতএব, তাকে কঠোর শাসনে না রাখলে সে অবশ্যই বিপথগামী হবে। [২০]

প্রাচীন ভারতে সাধারণভাবে প্রচলিত ছিল সতীদাহ প্রথা। সে সমাজে নারী ছিল অশুভ প্রাথী বিশেষ। সতীদাহ প্রথা অনুসারে বিধবা নারী স্বামীর চিতায় আত্মবিসর্জন করাকে অপমান ও লাঞ্ছনার জীবন যাপন অপেক্ষা শ্রেয় মনে করত। এ সম্পর্কে প্রফেসর ইন্দ্রিয়া বলেন, "There is no creature more sinful than woman. Woman is burning fire. She is the sharp edge of the razor. She is verily all these is a body." [২১] নারীর ন্যায় এত পাপ-পঙ্কিলতাময় প্রাণী আর নেই। নারী প্রজ্জ্বলিত অগ্নিস্বরূপ সে ক্ষুরের ধারালো দিক।এ সমস্তই তার দেহে সন্নিবিষ্ট। তৎকালীন হিন্দু সমাজে পুত্র সন্তান জন্মালে আনন্দের শেষ ছিল না। কিন্তু বিষাদের ছায়া নেমে আসত তখনই যখন কন্যা সন্তান জন্মাত।

১৮। Said Abdullah self Al-Hatimy. Women in Islam, Islamic Publication Ltd. Lahore, Pakistan, 1979, P-7.

১৯। আবদুল খালেক, প্রাগুক্ত, পৃ-৫।

২০। Ramesh Chandra Mazumdarv op.cit. p-19.

Dhaka University Institutional Repository

"The birth of a girl grant if else-where, here grant a fly." [২২] (হে দেবতা: নারী সন্তান অন্যত্র দান কর। আমাদের পুত্র সন্তান দাও।) মনুসংহিতায় নারীকে দাসী হিসেবেই গণ্য করা হয়েছে আর স্বামীকে দেবতার আসনে সমুন্নত করা হয়েছে। স্বামী যতই দুশ্চরিত্র, মদ্যপায়ী, আফিমখোর, ভাংখোর ও পরনারী আসক্ত হোক না কেন, স্ত্রী হিসেবে স্বামী দেবতার পদসেবা করাই নারীর ধর্ম এবং এতেই রয়েছে নারীর মুক্তি ও স্বর্গবাস। শুধু তাই-ই নয়, পতি দেবতার মৃত্যু হলে তার স্ত্রীকে এমনকি বাল্য বধুকেও স্বামীর একই চিতায় দগ্ধ হয়ে সহমরণে শরীক হয়ে স্বর্গবাসের সনদপত্র দিতে হবে-এটাই হল এ ধর্মের অনুমোদিত নিষ্ঠুর প্রথা যা সতীদাহ প্রথা নামে পরিচিত। এ ধর্মের যে আইনটি নারীদের নিরাপত্তার সবচেয়ে বেশী অভাব ঘটিয়েছে তা হচ্ছে পৈতৃক সম্পত্তির অধিকারী নয় বলেই বিবাহের সময় বিরাট অঙ্কের টাকা পাত্রকে যৌতুক দিয়ে মেয়েকে পাত্রস্থ করতে হয় অথচ সেই টাকায় কন্যার সেই টাকায় কন্যার তেমন কোন উপকার হয় না। কারণ পুরা টাকাটাই পাত্র পক্ষের ইচ্ছা অনুযায়ী খরচ হয়ে যায়। ভবিষ্যতে বিপদাপদে মেয়ের কোন উপকারেই আসে না। [২৩]

প্রাচীন ভারতীয় সমাজে নারীদের বিবাহ পিতা কর্তৃক কন্যা বিক্রয়স্বরূপ ছিল। নারীরা সম্পত্তির অধিকারী হতে পারত না। সে যুগে বালিকাকে দেবতার নামে উৎসর্গ করা হত। দেবতারা তাদের সঙ্গে বিবাহিতা স্ত্রীর ন্যায় ব্যবহার করত। অবশেষে বালিকাগণ মন্দিরের পুরোহিত ধর্মকর্তাদের অধীনে চলে যেত। বৈদিক যুগে নারী যুদ্ধে লব্ধ লুটের মালের ন্যায় ছিল। স্বামী স্ত্রীকে সেবাদাসী রূপে ব্যবহার করত। কন্যা সন্তান প্রসবকারী স্ত্রী সর্বদা লাঞ্ছিত ও অপমানিত হত। বিবাহে নারীদের মতামত দেয়ার অধিকার ছিল না। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে অমিল, রেষারেষি, শত্রুতা ও ঘৃণা বিরাজ করলে বিবাহ-বিচ্ছেদ ঘটানো যেত না। [২৪] বিধবা নারীর বিবাহ করা নিষিদ্ধ ছিল।

২১। Professor Indra; Statues of Women in Mahbharat, p-16.

২২। আবদুল খালেক, প্রাগুক্ত, পৃ-৪।

২৩। ড. ক্যাপ্টেন আবদুল বাসেত, প্রাগুক্ত, পৃ-১৩।

২৪। ইমাম আল জাসসাসশ (অনু. মাওলানা আবদুর রহীম), আহকামুল কুরআন, ২য় খন্ড, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা-১৯৯৫, পৃ-১৪৮।

Dhaka University Institutional Repository

ধর্মীয় দৃষ্টিকোণে নারী ঃ

গ্রীক, রোম, ইউরোপ, এশিয়াসহ সর্বত্রই নারী ছিল নির্যাতিতা। প্রাক-ইসলাম যুগে প্রত্যেক ধর্মের অনুসারী লোক ছিল। ইসলাম ব্যতিত অন্যান্য ধর্মে নারী স্বাধীনতা, মৌলিক অধিকার, নারীর জান, মাল ও ইজ্জতের নিরাপত্তা, মীরাস, সামাজিক অধিকার, মতামত ব্যক্ত করার অধিকার, রাজনৈতিক অধিকার সম্পর্কে কোন সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা দেয়া হয়নি। অন্যান্য ধর্মে নারী সম্পর্কে বিধি-বিধান ছিল অত্যন্ত শোচনীয়। তাই বিভিন্ন ধর্মে নারীকে কিভাবে মূল্যায়ন করা হয়েছে তা নিম্নে আলোচনা করা হচ্ছে ঃ

খৃষ্ট ধর্মে নারী ঃ

খৃষ্ট ধর্মের নামে নারী জাতির উপর নির্মম, নিষ্ঠুর এবং অমানসিক নৃশংস আচরণ করা হয়েছে। নারীদের পাপের উৎস হিসেবে খৃষ্ট ধর্ম বিবেচনা করা হতো। প্রথম নারী "ইভ" প্রথম পাপ করে এবং স্বর্গ হতে আদমের পতনের কারণ সে। ফলে জগতের সকল পাপের জন্য নারীকে দায়ী করা হয়েছে। পোপ শাসিত! 'পবিত্র' রোম-সাম্রাজ্যে তাদের (নারীদের) দেহে গরম তেল ঢেলে দেয়া হতো, দ্রুতগামী অশ্বের লেজের সাথে তাদেরকে বেঁধে হেঁচড়ানো হতো এবং মজবুত স্তম্ভে বেঁধে তাদেরকে আগুনে পুড়ে মারা হতো।[২৫] এতেও নারী জাতির নির্যাতনের পরিসমাপ্তি ঘটেনি। সপ্তদশ শতাব্দীতে "কাউন্সিল অব দ্যা ওয়াইজ" এর এক অধিবেশন রোম নগরীতে অনুষ্ঠিত হয়। এ অধিবেশনে সর্বসম্মতিক্রমে এ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় : "Woman has no soul" নারীর কোন আত্মা নেই।[২৬]

খৃষ্ট ধর্ম নারীকে যতদূর নীচে নিক্ষেপ করা সম্ভব ছিল তা করেছে। নারী সম্পর্কে এ ধর্মের অনুভূতি তারতুলীনের নিম্নোক্ত বর্ণনা থেকে অনুমান করা যায় ঃ

"হে নারীকুল, তোমরা জান না যে, তোমাদের প্রত্যেকেই এক একজন হাওয়া। তোমাদের জন্য আল্লাহ্‌র যে ফতোয়া ছিল তা যদি এখনও বর্তমান থাকে, তাহলে উক্ত অপরাধ প্রবণতাও তোমাদের মধ্যে বর্তমান আছে। তোমরা তো শয়তানের দরজা। তোমরাই খোদার প্রতিচ্ছবি পুরুষদের ধ্বংস করেছ।"

২৫। মাসিক মদীনা, জুন ২০০২ : সীরাতুন্নবী (সঃ) সংখ্যা ৫৫/বি, পুরানা পল্টন, ঢাকা-১০০০, পৃ-৪১।
২৬। মাসিক মদীনা, প্রাগুক্ত, পৃ-৪১।

Dhaka University Institutional Repository

সেন্ট পল তার একটি পত্রে লিখেন ঃ "নারী পূর্ণ বশ্যতা শিক্ষা করুক। আমি পুরুষদেরকে উপদেশ দিবার কিংবা পুরুষদের উপর কর্তৃত্ব করার অধিকার নারীকে দেই না। তাকে মৌনভাবে থাকতে বলি। কারণ প্রথমে আদমকে এবং পরে হাওয়াকে সৃষ্টি করা হয়েছিল। আদম প্রবঞ্চিত হলেন না। কিন্তু হাওয়া প্রবঞ্চিতা হয়ে অপরাধে পতিত হলেন।"

তিনি অপর একটি পত্রে লিখেন ঃ আমার ইচ্ছা এই, তোমরা যেন জান যে, প্রত্যেক পুরুষের মস্তকস্বরূপ খৃষ্ট, স্ত্রীর মস্তকস্বরূপ পুরুষ আর খৃস্টের মস্তকস্বরূপ ঈশ্বর। যে পুরুষ মস্তক আবৃত করে প্রার্থনা করে কিংবা ভাববাণী বলে, সে আপন মস্তকের আপমান করে। আর যে স্ত্রী অনাবৃত মস্তকে প্রার্থনা করে কিংবা ভাববাণী বলে, সে আপন মস্তকের অপমান করে। কারণ পুরুষ স্ত্রীলোক হতে নয় বরং স্ত্রীলোক পুরুষ হতে। আর স্ত্রীর নিমিত্ত পুরুষের সৃষ্টি হয় নি, কিন্তু পুরুষের নিমিত্ত স্ত্রীর সৃষ্টি হয়েছে।"[২৭]

জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে খৃষ্টধর্ম নারীকে চরম লাঞ্ছনা পঙ্কে নিমজ্জিত করে দিত। জনৈক পাদ্রী বলেন, "নারী সব অন্যায়ের মূল, তার থেকে দূরে থাকাই বাঞ্ছনীয়। নারী হচ্ছে পুরুষের মনে লালসা উদ্রেককারী, ঘরে ও সমাজের যত অশান্তির সৃষ্টি হয় সব তারই কারণে।"[২৮] ড. এসপ্রিঙ্গ (Dr. Aspring) তাঁর গ্রন্থে মধ্যযুগে নারীজাতির উপর জঘন্য নির্যাতনের বিশদ বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন : "১৫০০ খৃষ্টাব্দে ইংল্যান্ডে নারী জাতির বিচারের জন্য একটি পরিষদ গঠিত হয়। এটা নারীদের উপর নিষ্ঠুরতা ও নির্যাতন চালানোর নতুন নতুন উপায় উদ্ভাবন করে। এ আইনের বলে খৃষ্টানগণ নব্বই লক্ষ জীবন্ত নারীকে অগ্নিতে দগ্ধ করে হত্যা করে। খৃষ্টান সাম্রাজ্যে নারীদের প্রতি নিষ্ঠুরতা ও অবিচার বর্ণনাতীত।"[২৯] খৃষ্টজগতের বিশিষ্ট ধর্মযাজক টারটুলিয়ানের মতে "নারী হলো শয়তানের দোসর, নিষিদ্ধ বৃক্ষের প্রতি আহবানকারী খোদাই বিধানের পথ লঙ্ঘনকারী এবং পুরুষের সর্বনাশকারী নারীই পৃথিবীর সকল অশুভ কার্যের উৎস।"[৩০]

২৭। ড. মাহবুবা রহমান, কুরআন ও হাসীসের আলোকে নারী, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৫, পৃষ্ঠা-২০।

২৮। আবদুল খালেক, প্রাগুক্ত, পৃ-১০।

২৯। মাসিক মদীনা, প্রাগুক্ত, পৃ-৪১।

৩০। আবদুল খালেক, পূর্বোক্ত, পৃ-১০।

Dhaka University Institutional Repository

ইহুদী ও খ্রীষ্টান ধর্মমতে নারীই গোটা মানবতার দূর্দশার কারণ। অতীতের বহু বিখ্যাত পাদ্রী নারী জাতির উপর প্রকাশ্যে দোষারোপ করেছেন এবং নারীকে দরকারী আপদ (Necessary evil) বলে অভিহিত করেছেন।[৩১] আলেকজান্দ্রিয়ান ক্রিমেন্ট বলেন : "নারী বলেই তার লজ্জায় অভিভূত হয়ে থাকা উচিৎ।[৩২]

বিশ্ববরেণ্য ধর্মযাজক ও পুরোহিত সেন্ট বার্নাড, সেন্ট এ্যাটর্নী, সেন্ট পলও নারী জাতির উপর অভিসম্পাত বর্ষণ করেছেন। তাদের অভিমত হল নারী যখন আদি পাপের উৎস মানুষের জন্মগত পাপের কারণ, তখন সকল ভৎসনা অবজ্ঞা ঘৃণা নারীরই প্রাপ্য। উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন সাধু ক্রীসোষ্টম নারীর প্রতি পুরোহিতদের মতামত ব্যক্ত করে বলেন, "নারী হল একটি অপরিহার্য পাপ, একটি প্রাকৃতিক প্রলোভন, একটি অবশ্যম্ভাবী বিষয়, একটি পারিবারিক বিপদ, একটি মারাত্মক আকর্ষণ, একটি বিমূর্ত কলঙ্ক।"[৩৩]

খৃষ্টান ধর্মে বিবাহ ছিল স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে স্থায়ী পবিত্র বন্ধন, যা আমৃত্যু বলবৎ থাকবে।[৩৪] কিন্তু খৃষ্টান জগতের শ্রেষ্ঠ অবতার ও রচয়িতা সেন্টপল বিবাহকে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে পবিত্র ধর্মীয় বন্ধন বলে স্বীকার করেন না। আর এটাকে তিনি স্বাভাবিক এবং সামাজিক জীবনের সম্মানজনক ও আনন্দদায়ক কিছু বলেও বিশ্বাস করেন না। সেন্টপল বলেন : "He that giveth her not in marriage, doeth better."[৩৫] (যে ব্যক্তি তার কন্যাকে বিবাহ দেয় না; সে উত্তম কাজ করে।)

খৃষ্টান ধর্মে নিয়মানুসারে তালাকের অনুমতি নেই। তালাক প্রসঙ্গে বাইবেলে বলা হয়েছে- "---------- That the wife should not separate from her husband and that the husband should not divorce his wife."[৩৬]

৩১। Nazhat Afza and khurshid Ahmed, Ibid, P-4.

৩২। মাসিক মদীনা, প্রাগুক্ত, পৃ-৪১।

৩৩। Pospishil, Victor : Divorce and Marrige, London. P-49.

৩৪। Klansner, Joseph : From Jesus to Paul, London 1964,P-571-572.

৩৫। আবদুল খালেক, প্রাগুক্ত, পৃ-১২।

৩৬। আবদুল খালেক, প্রাগুক্ত, পৃ-১২।

Dhaka University Institutional Repository

(স্ত্রী তার স্বামী হতে বিচ্ছিন্ন হবে না; আর স্বামীও তার স্ত্রীকে তালাক দিবে না।) মার্ক (Mark) বলেন, যিশু তালাকের প্রতি ঘৃণা প্রকাশ করে বলেন: "Who ever divorce his wife and marries another. coummits adultery against her; and if she divorces her husband and marries another. she coummits adultery." [৩৭] (যে ব্যক্তি স্বীয় স্ত্রীকে তালাক দিয়ে অপর স্ত্রী গ্রহণ করে, সে তার বিরুদ্ধে ব্যভিচার করে। আর যে স্ত্রী নিজ স্বামীকে বর্জন করে অপর স্বামী গ্রহণ করে, সে ব্যভিচার করে।) কিন্তু মতান্তরে খ্রীষ্টান ধর্মে তালাক ও পুনঃ বিবাহ অবৈধ নয়।[৩৮]

সেন্টপলের শিক্ষা নারীদেরকে ধর্মানুষ্ঠান থেকে বহির্গত করেছে এবং এজন্যনই গির্জায় গমন তাদের উচিত নয়। তিনি নারীকে কলরবকারী ও মূর্খ বলে ধারণা করতেন। তাই তাদেরকে ধর্ম প্রচার ও ধর্ম বিষয়ে অভিমত প্রকাশে অনুমতি দেননি। তিনি বলেন, "নারীরা গির্জায় নিরব থাকবে। কারণ, তাদেরকে কথা বলার অনুমতি প্রদান করা হয়নি; তারা অধীন হয়ে থাকবে। এটাই আইনের নির্দেশ। তারা কোন কিছু জানতে চাইলে বাড়িতে তাদের স্বামীদেরকে জিজ্ঞেস করে নিবে। কারণ, গির্জায় কথা বলা নারীর পক্ষে লজ্জার বিষয়।" [৩৯] বিখ্যাত ইংরেজ সাহিত্যিক Bernard shaw (বার্নাড শ) বলেছেন ঃ " ইংলিশ আইনানুসারে বিবাহের সাথে সাথে একজন নারী সমস্ত ব্যক্তিগত অর্থ সম্পত্তি তার স্বামীর আওতাভূক্ত হয়ে যায়।"[৪০]

৩৭। Bible, Mark-10: 11-12.
৩৮। Pospishil, victor : op.cit. P-38.
৩৯। মাসিক মদীনা, প্রাগুক্ত, পৃ-৪১।
৪০। Dr. G. lebon, Arab Civilization, P. 406.

Dhaka University Institutional Repository

ইয়াহুদী ধর্মে নারী ঃ

পৃথিবীর যে সব ধর্ম শুধুমাত্র কিছু আকীদা এবং তত্ত্ব পেশ করেই ক্ষান্ত হয়নি, বরং পেশকৃত আকীদা ও তত্ত্বের ভিত্তিতে জীবনের বাস্তব সমস্যাদি সম্পর্কেও বিস্তারিত আলোচনা করেছে, ইয়াহুদী ধর্ম তারই একটি। এ ধরণের একটি ধর্ম নারী জাতি সম্পর্কে বাস্তববাদী ধ্যান-ধারণা পেশ করবে এরূপ আশা করাটাই স্বাভাবিক। কিন্তু এ ধর্ম আমাদের সামনে যে ধারণা পেশ করে তার সারমর্ম এই যে, পুরুষ সৎস্বভাব বিশিষ্ট ও সৎকর্মশীল আর নারী বদস্বভাব বিশিষ্ট এবং ভন্ড।

ইয়াহুদী ধর্ম মতে, মানব জাতির প্রথম সদস্য হযরত আদম (আ) জান্নাতে মহাসুখে জীবন যাপন করছিলেন। কারণ তিনি ছিলেন আল্লাহ্‌র অনুগত বান্দা। কিন্তু তাঁর স্ত্রী হাওয়া (আ) তাঁকে প্রথমে আল্লাহ্‌র অবাধ্য হতে প্ররোচিত করেন এবং তাঁকে এমন একটি ফল খাওয়ান যা খেতে আল্লাহ্ তাঁকে নিষেধ করেছিলেন। ফলে তিনি আল্লাহ্‌র সব নিয়ামত থেকে বঞ্চিত হলেন এবং তাঁর ভাগ্যলিপিতে কায়-ক্লেশের জীবন লিপিবদ্ধ হলো।

বাইবেলের ওল্ড টেস্টামেন্টে লিপিবদ্ধ আছে যে, মহান আল্লাহ্ হযরত আদম (আ) কে জিজ্ঞেস করলেন ঃ " যে বৃক্ষের ফল ভোজন করতে তোমাকে নিষেধ করেছিলাম, তুমি কি তার ফল ভোজন করেছ? আদম কহিলেন, তুমি আমার সঙ্গিনী করে যে স্ত্রী দিয়েছ, সে আমাকে ঐ বৃক্ষের ফল দিয়েছিল, তাই আমি উহা ভোজন করেছি।"

এরপর আল্লাহ্ হাওয়াকে বললেন, "আমি তোমার গর্ভবেদনা অতিশয় বৃদ্ধি করে দিব। তুমি বেদনাতে সন্তান প্রসব করবে। স্বামীর প্রতি তোমার বাসনা থাকবে। সে তোমার উপর কর্তৃত্ব করবে।"

অন্য কথায়, হাওয়া (আ) আদম (আ)-কে পথভ্রষ্ট করে যে অপরাধ করেছিলেন, আল্লাহ্'র তরফ থেকে তার সেই অপরাধের শাস্তি হলো সন্তান প্রসবকালে কষ্ঠ এবং তার উপর পুরুষের স্থায়ী কর্তৃত্ব। পুরুষ কিয়ামত পর্যন্ত নারীর উপর এ কর্তৃত্ব চালাতেই থাকবে।

Dhaka University Institutional Repository

এ দর্শনের ফলশ্রুতিতে ইয়াহুদী শরীয়তে পুরুষের আধিপত্য ও কর্তৃত্ব এত বেশি যে, কোন স্ত্রীলোক যদি যৌবনকালে আপন পিতৃগৃহে বাস করবার সময়ে সদা প্রভুর উদ্দেশ্যে কো মানত করে অথবা কোন ব্রতবন্ধনে আপনাকে আবদ্ধ করে এবং তার পিতা যদি তার সেই মানত বা ব্রতের কথা শুনে তাকে তা পালন করতে নিষেধাজ্ঞা করে, তবে তার সে মানত বা ব্রতবন্ধন স্থির থাকবে না তা ব্যর্থ হয়ে যাবে । ফলে তার পিতার নিষেধ কার্যকর হবে এবং সদ্যপ্রভু সেই যুবতীকে ক্ষমা করবেন না। কারণ পিতা তাকে অনুমতি প্রদান করেন নি। আর যদি সে কোন পুরুষের স্ত্রী হয়ে তার অধীনে হয় এবং এ অবস্থায় কোন মানত করে অথবা স্বামী যদি শুনতে পায় এবং শ্রমণের দিন স্বামী তাকে নিষেধ করে তবে ঐ মানত বা ব্রত স্থির থাকবে। আর যদি শ্রবণের দিন স্বামী তাকে নিষেধ করে তবে ঐ মানত বা ব্রতি স্থির থাকবে না। কারণ তার স্বামী তা ব্যর্থ করেছে। আর সদ্যপ্রভূ সেই স্ত্রীকে ক্ষমা করবেন না। স্ত্রীর প্রত্যেক মানত ও দিব্য তার স্বামী ইচ্ছা করলে স্থির রাখতেও পারে অথবা উহা ব্যর্থও করে দিতে পারে। পুরুষ ও স্ত্রীর বিষয়ে এবং যৌবনে পিতৃগৃহে অবস্থানকালে কন্যার বিষয়ে সদ্যপ্রভূ মোশিকে এ সকল আজ্ঞা করলেন। ইয়াহুদী আইন অনুসারে পুরুষ উত্তরাধিকারীর বর্তমানে নারী উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত। অনুরূপভাবে নারীর দ্বিতীয়বার বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার অধিকারও নেই।[৪১]

আদালতের রায়ে তালাক হলে গোঁড়া ও রক্ষণশীল ইয়াহুদী সমাজ এরূপ বিবাহ বিচ্ছেদ গ্রহণ করে না। স্ত্রীকে পূর্ব স্বামীর বিবাহিতা বলে গণ্য করে। স্বামী স্ত্রীকে 'গেট'বা বিবাহ বিচ্ছেদের সনদ না দিলে ধর্মীয় আইনে বিবাহ অটুট থাকে। সংশোধিত ইয়াহুদী আইন ও সিভিল আইনে তার পুনর্বিবাহ হলেও গোঁড়া ও রক্ষণশীলদের নিকট স্ত্রী ব্যভিচারিণী এবং সে বিবাহের সন্তানগণ বংশানুক্রমে বা অবৈধ সন্তান বলে গণ্য হবে। 'গেট' তাওরাতে লিপিবদ্ধ আইনেরই অংশ। ইয়াহুদীদের বিশ্বাস এ আইন সিনাই পর্বতে আল্লাহ্ হযরত মূসা (আ) কে দিয়েছিলেন।[৪২]

৪১। সাইয়েদ জালালুদ্দীন আনসারী উমরী, প্রাগুক্ত, পৃ-৩১-৩৩।

৪২। অধ্যক্ষ মুহাম্মদ শামসুল হুদা, নারীর অধিকার ও মর্যাদা, ঢাকা : আসা রাফিয়া বইঘর, ১৯৯৫, পৃ-১৯,

Dhaka University Institutional Repository

ওল্ড টেস্টামেন্টে হযরত আদম ও হাওয়ার জান্নাত হতে বহিস্কৃত হওয়ার ঘটনাটি এভাবে পেশ করা হয়েছে ঃ

" তখন সদাপ্রভু ঈশ্বর আদমকে ডাকিয়া কহিলেন, তুমি কোথায়? তিনি কহিলেন, আমি উদ্যানে। তোমার রব শুনিয়া ভীত হইলাম। কারণ আমি উলঙ্গ। তাই আপনাকে লুকাইয়াছি। ঈশ্বর কহিলেন, তুমি যে উলঙ্গ উহা তোমাকে কে বলিল? যে বৃক্ষের ফল খাইতে তোমাকে নিষেধ করিয়াছিলাম তুমি কি তাহার ফল ভোজন করিয়াছ? তাহাতে আদম কহিলেন, তুমি আমার সঙ্গিনী করিয়া যে স্ত্রী দিয়াছ, সে আমাকে ঐ বৃক্ষের ফল দিয়াছিল। তাই খাইয়াছি। তখন সদাপ্রভু ঈশ্বর নারীকে কহিলেন, তুমি এ কি করিলে? নারী কহিলেন, সর্প আমাকে ভুলাইয়াছিল, তাই খাইয়াছি।"

এর অর্থ এই যে, বেহেশত থেকে বহিস্কৃত হওয়া আদম তথা মানব জাতির পক্ষে অভিশাপ বিশেষ এবং এ অভিশাপের মূল কারণ হচ্ছে নারী- আদমের স্ত্রী। এ জন্যে ইয়াহুদী সমাজে স্ত্রীলোক চির লাঞ্ছিতা, জাতীয় অভিশাপ এবং ধ্বংস ও পতনের কারণ। এ জন্যে পুরুষ সব সময়ই নারীর উপর প্রভুত্ব করার স্বাভাবিক অধিকারী। এ অধিকার আদমকে হাওয়া বিধি কর্তৃক নিষিদ্ধ ফল খাওয়ানের শাস্তিবিশেষ। যতদিন নারী বেঁচে থাকবে, ততদিন এ শাস্তি তাকে ভোগ করতেই হবে।

ইয়াহুদী সমাজে নারীকে ক্রীতদাসী না হলেও চাকরাণীর পর্যায়ে নামিয়ে দেয়া হয়েছে। সেখানে বাপ নিজ কন্যাকে নগদ মূল্যে বিক্রি করতে পারত। মেয়ে কখনও পিতার সম্পত্তি থেকে মীরাস লাভ করত না। করত কেবল তখন, যখন পিতার কোন পুত্র সন্তানই থাকত না।

ইয়াহুদী ধর্মে নারীকে 'পুরুষের প্রতারক' বলে অভিহিত করা হয়েছে। ইয়াসরিবের (বর্তমান মদীনা শহর) ফিতুম নামক এক ইয়াহুদী বাদশাহ আইন জারী করেছিল ঃ যে মেয়েকে বিয়ে দেওয়া হবে, স্বামীর ঘরে যাওয়ার আগে তাকে বাধ্যতামূলকভার তার সাথে এক রাত্রিযাপন করতে হবে।[৪৩]

৪৩। মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম, পরিবার ও পারিবারিক জীবন, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, ১৯৮৩, পৃ-৬২। ড. আল্লামা জামাল আল বাদাভী, ইসলামিক টিচিং কোর্স, ৩য় খন্ড, অনুবাদঃ আবু খালদুন আল মাহমুদ, ইসলামের সামাজিক বিধান, ঢাকাঃ দি পাইও নিয়ার, ১৯৯৯, পৃ-৪৯-৫৫।

Dhaka University Institutional Repository

বাগদত্তা বা বিবাহিতা নারী পরপুরুষ দ্বারা বলপূর্বক ধর্ষিতা হইলে ধর্ষণের সময় সাহায্য চাহিয়া চীৎকার না দিলে সে জীবনের অধিকার হারাইয়া ফেলিত এবং প্রস্তারাঘাতে হত্যাই ছিল তাহার শাস্তি । ধর্ষিতা কুমারী হইলে ধর্ষণকারীর সহিত বিবাহই ছিল ইহার বিধান।[৪৪]

ইয়াহুদীরা নিজ ধর্মীয় শিক্ষার মাধ্যমে এ অধিকার লাভ করে থাকে যে, যখন তারা ইচ্ছা করবে, ক্ষুদ্রতম অপরাধের কারণেও স্ত্রীকে বিদায় করে দিতে পারবে। তার স্ত্রীদেরকে হায়েয ও নেফাসের সময় অপবিত্র বলে মনে করে। এ সময়ে তারা স্ত্রীদের সাথে উঠা-বসা, কথাবার্তা, আলাপ-আলোচনা করা, এমনকি তাদের হাতের তৈরী খাদ্য ও পানীয় গ্রহণ করাকেও নিজেদের জন্য জঘন্যতম অপমানজনক কাজ বলে মনে করে থাকে।[৪৫]

ইয়াহুদী সমাজে বিবাহ ছিল ব্যক্তিগত ব্যাপার। সুতরাং এজন্য রাষ্ট্র ও ধর্মের অনুমতির প্রয়োজন ছিল না। বাস্তবে ইহা ছিল না। বাস্তবে ইহা ছিল এক প্রকার ব্যবসা এবং যৌতুকের গুরুত্ব ইহাতে খুব বেশী ছিল।[৪৬]

সমাজিক প্রার্থনায় দশজন পুরুষের উপস্থিতি জরুরী ছিল। কিন্তু নয়জন পুরুষ এবং বহু নারী উপস্থিত থাকলেও প্রার্থনা অনুষ্ঠিত হত না। কারণ, নারী মানুষরূপে পরিগণিত ছিল ন।[৪৭]

৪৪। The Jewish Encyclopaedia, Vol. XII. p-556

৪৫। মাওলানা আমীরুল ইসলাম ফরদাবাদী, মহানবী (সঃ) এর পারিবারিক জীবন ও নারী স্বাধীনতা, ঢাকা ঃ ফরদাবাদী মহল, ১৯৯৫, পৃ-৬৫, আল্লামা আবদুল কাইউম নদভী, ইসলাম আওর আওরাত, লাহোরঃ ইদারায়ে ইলামিয়া, তা.বি.পৃ-২৩।

৪৬। আবদুল খলেক, প্রাগুক্ত, পৃ-৮।

৪৭। আবদুল খলেক, প্রাগুক্ত, পৃ-৮।

Dhaka University Institutional Repository

হিন্দু ধর্মে নারী ঃ

ভারতবর্ষকে একটি ধর্মভিত্তিক দেশ মনে করা হয়। কারণ এর অন্যান্য যে কোন দিকের চেয়ে ধর্মীয় দিকটি সব সময় বেশী প্রভাব বিস্তার করে আছে। তাই এ দেশে নারীর অধিকারকে চরমভাবে খর্ব করা হয়েছে। সতীদাহ প্রথা, গঙ্গা-সাগরে কন্যা নিক্ষেপ করার বিবরণ আজো ইতিহাসের পাতা হতে মুছে যায়নি। ধর্মের নামে দেবদাসী, সেবাদাসীরূপে নারীত্বের চরম অবমাননা ও নারী-নির্যাতন অব্যহত রয়েছে। অবিবাহিতা হিন্দুনারী পিতা, ভাই প্রতৃতির কাছে পণ্যদ্রব্য মাত্র। বেদবানীতে নারীর অবস্থা বর্ণিত হয়েছে-

"বৈদিক যুগে বহু যুবতীর বিবাহ হতো না। তারা কুমারী অবস্থাতেই পিতৃগৃহে থাকতো। বিকলাঙ্গ কন্যাদের বিবাহ হতো না। বিয়ে হয়ে গেলে কন্যার পৈতৃক সম্পত্তিতে তার অধিকার থাকতো না। এ জন্য কন্যার ভ্রাতারা ভগিনীর বিবাহ দিতে চেষ্টিত থাকতো। বিধবা প্রায়ই স্বামীর ভ্রাতাকে বিয়ে করতো। ..... কন্যা হরণ করে বীরগণ বিয়ে করতো। ..... বিধবা হলে পত্নী পতিত চিতায় শয়ন করে দেবরের আহবানে উঠে আসতো ও পতির শবদাহ করতো।[৪৮]

ভারতবর্ষের বিখ্যাত আইন রচয়িতা মুনজার নারী সম্পর্কে বলেছেন ঃ নারী অপ্রাপ্ত বয়স্কা, প্রাপ্ত বয়স্কা বা বৃদ্ধা যাই হোক না কেন স্বাধীন যেন না হয়। শৈশবে নারী তার পিতার অধীনে থাকবে, যৌবনে থাকবে স্বামীর অধীনে আর বিধবা হওয়ার পর থাকবে পুত্রের অধীনে। কোন সময়ই সে স্বাধীন থাকবে না।[৪৯]

কোন কোন হিন্দু ধর্মগ্রন্থে বলা আছে ঃ বিষ, সাপ, আগুন, মৃত্যু, নরক ও ঝড় বন্যা এসব কোন কিছুই নারীর চেয়ে খারাপ নয়।[৫০]

৪৮। সাইয়েদ জালালুদ্দিন আনসার উমরী, ইসলামী সমাজে নারী, প্রাগুক্ত, পৃ-৩৪।

৪৯। ড. মাহবুবা, প্রাগুক্ত, পৃ-২৩।

৫০। ড. মুস্তাফা আস্ সিবায়ী, প্রাগুক্ত, পৃ-১৩।

Dhaka University Institutional Repository

কুরবানী বা ব্রত পালন নারীর জন্য পাপ। তার উচিত শুধু স্বামীর সেবা করা। স্বামীর মৃত্যুর পর পুনরায় স্বামী গ্রহণের কথা মুখে আনাও নারীর উচিত নয়। বরং স্বল্পাহারী হয়ে জীবনের অবশিষ্ট দিনগুলো কাটিয়ে দেয়া উচিত।[৫১]

অত্যাচার নিপীড়ন সীমাহীন যন্ত্রণা, ব্যাঙ্গ, হেয়প্রতিপন্ন করার পাশাপারিশ বিভিন্ন কুপ্রথার প্রচলন করে হিন্দু সমাজের নারী জীবনকে করা হয়েছে দুর্বিসহ যাতনামত তমসাচ্ছন্ন। এমনকি নারীদের প্রতি ঘৃণাভবে উক্তি প্রকাশ করা হয়েছে, Men should not love their অর্থাৎ নারীদিগকে ভালবাসা পুরুষদের উচিৎ নয়।[৫২]

বিভিন্ন বর্ণনা হতে প্রমাণিত হয়েছে যে, হিন্দুদের মাঝে বিবাহ পিতা কর্তৃক কন্যা বিক্রি স্বরূপ। হিন্দু নারী কোন সম্পত্তির মালিক হতে পারত না। কন্যা সন্তান প্রসবকারিনী সর্বক্ষেত্রে লাঞ্চিতা ও অপমানিতা হত। এমনকি স্বামীর মৃত্যুতেও বিবাহ ভঙ্গ করা যেত না। ভগবত গীতায় বলা হয়েছে, শুধুমাত্র পাপপূর্ণ আত্মাই নারী, বৈশ্য ও শুদ্র হিসেবে জন্মগ্রহণ করে। নারীর মর্যাদা ক্ষুন্ন করে বিজয়নগরের তেলেগু রাজার ১২০০ জন স্ত্রী এবং রাজা মানসিংহের ১৫০০ জন স্ত্রী ছিল।[৫৩] বিরল ক্ষেত্রে একজন নারীর একাধিক স্বামী থাকতে পারত। তবে এটা সমাজে মোটেই গ্রহণযোগ্য নয় বরং ঘৃণিত কাজ।[৫৪] হিন্দু ধর্মের সামাজিক নিয়মনীতি, আইন-ব্যবস্থা বিধি-বিধান নারীর প্রকৃত মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় ব্যর্থ হয়েছে।

৫১। ড. মাহবুবা, প্রাগুক্ত, পৃ-২৩।

৫২। মাসিক মদীনা, প্রাগুক্ত, পৃ-৩৮।

৫৩। আসমা জাহান হেমা, প্রাগুক্ত, পৃ-২৯।

৫৪। আবদুল খালেক, প্রাগুক্ত, পৃ-৯।

Dhaka University Institutional Repository

বৌদ্ধ ধর্মে নারী ঃ

বৌদ্ধ ধর্মের প্রবর্তক গৌতম বুদ্ধ নারী জাতির জন্য কিছুই করে যাননি। কোন কিছু করার প্রয়োজনও তিনি বোধ করেন নি। একদিন বুদ্ধের এক শিষ্য তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, "নারী জাতির সাথে কেমন ব্যবহার করতে হবে?" বুদ্ধ উত্তর করলেন, "নারীর প্রতি দৃষ্টি দেওয়াও মানবীয় পবিত্রতার পরিপন্থী।" অন্য এক সময় তিনি আরও বলেছেন, "নারীদের সাথে কোনরূপ মেলামেশা করো না এবং তাদের প্রতি কোন অনুরাগ রেখো না। আর তাদের সাথে কথাবার্তাও বলো না। কেননা, পুরুষের পক্ষে নারী ভয়ঙ্কর বিপদস্বরূপ। নারী তার মনোহর কমনীয় ভঙ্গি দ্বারা পুরুষের বিশ্বাস-ধন লুট করে নেয়। নারী একটি সশরীরী ছলনা মাত্র। সুতরাং নারী থেকে বাঁচার চেষ্টা কর।"

বৌদ্ধ ধর্ম আরো বলে যে, "নারীর সঙ্গে বাস করা অপেক্ষা বাঘের মুখে চলে যাওয়া কিংবা, জল্লাদের ছুটির নীচে মাথা পেতে দেওয়া উত্তম।" সুতরাং যে ধর্ম এ কথা বলে সে দর্শন কখনো নারীকে শান্তি ও মর্যাদা দিতে পারে না।

গৌতম বুদ্ধের শিক্ষার সারমর্ম এই যে, নারীর সঙ্গে বসবাসকারী পুরুষ পরকালের মুক্তি হতে বঞ্চিত থাকবে। নারীরা পুরুষের মোক্ষ লাভের অন্তরায়। তাদের সাহচার্যে থেকে আত্মিক উন্নতি লাভ করা সম্ভব নয়। এ জন্যেই গৌতম বিয়ে প্রথার বিরোধী ছিলেন। তিনি লোকদেরকে সংসার ত্যাগ ও সন্ন্যাসব্রতের আহবান করে গিয়েছেন।[৫৫]

বৌদ্ধ ধর্মমতে নারী হলো সকল অসৎ প্রলোভনের ফাঁদ। এ সম্পর্কে বিখ্যাত ঐতিহাসিক ওয়েষ্টারমার্ক (Westermark) বলেন: "Women are of all the snares which the tempter has spread for men, the most dangerous; in women are embodied all the powers of infatuation which blind the mind of the world." (মানুষের জন্য প্রলোভন যতগুলি ফাঁদ বিস্তার করে রেখেছে, তন্মধ্যে নারীই সর্বাপেক্ষা বিপদজনক। নারীর মধ্যে সকল মোহিনী শক্তি অঙ্গীভূত হয়ে আছে-যা সমগ্র বিশ্বের মনকে অন্ধ করে দেয়।[৫৬]

৫৫। মাওলানা ইসহাক ওবায়দী, যুগে যুগে নারী, ঢাকা, শান্তিধারা প্রকাশনী, ১৯৯৬, পৃ-২১-২২।
মুফতী আব্দুল্লাহ ফারুক, ইসলাম রমনীর মাল, আলফারুক প্রকাশনী, ১৯৯৮, পৃ-১৯-২০।

৫৬। The Encyclopedia Britanicac, Vol-V, P-732.

Dhaka University Institutional Repository

বিখ্যাত বৌদ্ধ পন্ডিতের নারী সম্পর্কে ধারণা ব্যক্ত করে বেটনী (Bettany) তাঁর World's Religiouns গ্রন্থে বলেন, "Unfathomably deep, like a fish's course in the water is the character of women, robed withe many artifices, with whom truth is hard to find, to whom a lie is like the truth and the truth is like a lie." (পানিতে মাছের গতিপথের গভীরতা যেমন নির্ণয় করা সম্ভব নহে, নারীর চরিত্র হল তেমনি নিবিড়-যা বহুবিধ ছলনায় আচ্ছাদিত। তার মধ্যে সত্য পাওয়া দুষ্কর। তার নিকট মিথ্যা সত্যসদৃশ এবং সত্য মিথ্যা সম।[৫৭]

হযরত মুহাম্মাদ (সঃ) এর আবির্ভাবের পূর্বে আরব সমাজে নারী ঃ

ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, পৃথিবীর অন্যান্য ধর্মের তুলনায় একমাত্র ইসলামে নারীর অবস্থা অধিকতর উন্নত, সম্মানজনক ও মর্যাদাপূর্ণ ছিল। কিন্তু ইসলাম পূর্ব সমাজে অর্থাৎ মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সঃ) এর আবির্ভাবের পূর্বে নারী ছিল অবহেলিত, অমর্যাদাকর, লাঞ্ছিত, অবাঞ্ছিত, অপমানিত, জঘন্য প্রাণীর চেয়েও নিকৃষ্ট। ইসলাম পূর্ব সমাজে নারীর অবস্থা কেমন ছিল তা নিম্নে আলোকপাত করা হলো ঃ

জাহেলিয়া যুগে নারী ছিল ঘৃণিত, মর্যাদা বহির্ভূত এবং অধিকারহীন ও মূল্যহীন। তারা মানবরূপে পরিগণিত ছিল না। পুরুষ ও জীবজন্তুর মধ্যস্থলে ছিল নারীদের অবস্থান। কন্যা সন্তান জন্ম হলে সে পরিবারের এক চরম অভিশাপ বলে গণ্য হত। আল-ইসলাম রুহুল মাদানিয়্যাহ গ্রন্থে শায়খ মুস্তফা আল-গালায়ীনী বলেন ঃ "ইসলামের আবির্ভাবের পূর্বে পুরুষের অধিকৃত বিষয় সম্পদের মধ্যে নারীর সাথে পশুর ন্যায় ব্যবহার করা হত। নারীর মর্যাদা এত নীচে ছিল যে, তাদের তুলনায় পশুদের প্রতি অধিকতর সুনজর দেয়া হত। আরবের নারীরা এমন নিদারুণ অবস্থায় নিপতিত ছিল যে, দুনিয়ার অপর কোন জাতিই আরবের ন্যায় নারীদেরকে এত অধিক অপমানিত ও নির্যাতিত করত না। কন্যা সন্তান জন্মকে আরবরা কুলক্ষণ ও অপমানজনক মনে করত। নবজাত কন্যা সন্তান হত্যার নীতি বহুলভাবে প্রচলিত ছিল। কন্যা সন্তানদের জীবন্ত কবর দেয়া হত। পণ্য দ্রব্যের মত বিক্রয় করা হত এবং পশুর বদলে বিনিময় করা হত। আরবরা এ ধরণের কার্য করার কারণ হিসেবে কন্যা সন্তানকে অপমানজনক ও অমর্যাদাকর ধারণা করত।"[৫৮]

৫৭। চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়, দেববানী, পৃ-৩২৪-৩২৭ দ্রষ্টব্য।

৫৮। Philip Hitti, History of the Arabs, London, Sent Martin Press, 1951, P-28.

Dhaka University Institutional Repository

হযরত মুহাম্মাদ(সঃ) এর আবির্ভাবের পূর্বে আরব অধিবাসীরা নারীর অস্তিত্বকে লজ্জাজনক ও লাঞ্ছনাকর বলে মনে করত। কন্যা সন্তানের জন্মই ছিল তাদের জন্য গভীর দুঃখ এবং মনোকষ্টের কারণ। পুত্র সন্তান নিয়ে তারা গর্ব ও অহঙ্কার করত। আর কন্যা সন্তানের অস্তিত্ব তাদের মর্যাদাকে ভূলুণ্ঠিত করত। পবিত্র কুরআনে তাদের এই অনুভূতি ও মনোবৃত্তির বর্ণনা দিয়ে বলা হয়েছে ঃ

"উহাদের কাহাকেও যখন কন্যা সন্তানের সুসংবাদ দেওয়া হয় তখন তাহার মুখমন্ডল কালো হইয়া যায় এবং সে অসহনীয় মনস্তাপে ক্লিষ্ট হয়। উহাকে যে সংবাদ দেওয়া হয়, তাহার গ্লানি হেতু সে নিজ সম্প্রদায় হইতে আত্মগোপন করে। সে চিন্তা করে হীনতা সত্ত্বেও সে উহাকে রাখিয়া দিবে, না মাটিতে পুঁতিয়া দিবে। সাবধান! উহারা যাহা সিদ্ধান্ত করে তাহা কত নিকৃষ্ট।"[৫৯]

নারীর প্রতি ঘৃণা ও অবজ্ঞা এমন চরমে পৌঁছেছিল যে, কারো ঘরে কন্যা সন্তানের জন্ম হলে ঐ ঘরটিকে সে একটি অলক্ষুণে ঘর মনে করে তা পরিত্যাগ করত। এর চেয়েও বড় কথা ছিল যে, মেয়েদের জন্য তাদের হৃদয়ে দয়া-মায়া ও স্নেহ-মমতার বিন্দুমাত্র অনুভূতিও ছিল না। তা না হলে নিজের সন্তানকে জীবিত দাফন করা সম্ভব হত না। বড়ই পরিতাপের বিষয় যে, এ নিষ্ঠুরতা কোন কোন সময় এমন সব ব্যক্তিদের তরফ থেকেও প্রকাশ পেত যাদের হৃদয়কে স্নেহ ও ভালবাসার উৎস বলে মনে করা হত। এ প্রসঙ্গে এমন কিছু হৃদয়বিদারক ঘটনাও বর্ণিত আছে, যা শোনা মাত্রই হৃদয় কেঁপে উঠে।[৬০]

এক ব্যক্তি রসূলে করীম (সঃ) কে তার জাহিলী যুগের কাহিনী শুনিয়ে বললঃ "আমার একটি মেয়ে ছিল। সে আমার সাথে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ ছিল। আমি যখনই তাকে ডাক দিতাম, সে বড়ই খুশি মনে আমার কাছে দৌড়ে আসত। এমনি করে একদিন আমি তাকে ডাকলাম। সে দৌড়ে আমার কাছে এল। আমি তাকে সাথে নিয়ে নিকটবর্তী একটি কুপের পাশে গেলাম। তখন হঠাৎ করে ধাক্কা দিয়ে তাকে ঐ কুপের মধ্যে ফেলে দিলাম। তখনো সে আব্বা, আব্বা বলে চিৎকার করছিল।" ঘটনাটি শুনে নবী করীম(সঃ) এর চোখ অশ্রুসিক্ত হয়ে উঠল। এমনকি তার পবিত্র দাড়ি পর্যন্ত ভিজে গেল। এর চেয়ে বড় পাপ আর কি হতে পারে যে, বাপের স্নেহসিক্ত হাত দু'টি আপন সন্তানের জন্য হিংস্র নেকড়ের থাবায় পরিণত হলো।[৬১]

৫৯। আল কুর আনুল করীম, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ঢাকা, ১৬ঃ ৫৮-৫৯।

৬০। সাইয়েদ জালালুদ্দিন আনসার উমরী, প্রাগুক্ত, পৃ-২৬।

৬১। আবু মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ ইবন আব্দুর রহমান আল দারেমণ, সুনানুদ দারেশী, ১ম খন্ড, করাচী ঃ কাদীমী কুতুবখানা, তা.বি. পৃ-১৪/ ড.মাহবুবা, প্রাগুক্ত, পৃ-২৭।

Dhaka University Institutional Repository

জাহেলী যুগে আরবরা কন্যা সন্তান লাভ করাকে ক্ষতি ও অপমানের কারণ মনে করত। আর পুত্র সন্তান লাভ করাকে তারা মনে করত লাভ ও গৌরবের বিষয়। তাই কন্যা সন্তানের পরিবর্তে সর্বদা তারা পুত্র সন্তান কামনা করত। পবিত্র কুরআনে তাদের এ হীন মানসিকতার প্রতি ইঙ্গিত করে বলা হয়েছে ঃ

"উহারা নির্ধারণ করে আল্লাহর জন্য কন্যা সন্তান- তিনি পবিত্র, মহিমান্বিত এবং উহাদের জন্য তাহাই, যাহা উহারা কামনা করে।"[৬২]

প্রাক ইসলাম যুগে নারী বিয়ের আগে পিতার এবং বিবাহোত্তর সময়ে স্বামীর অধীনস্থ ছিল। সমাজে বহু বিবাহ প্রথা চালু ছিল এবং পরিবারে পুরুষের ভূমিকাই ছিল মুখ্য।[৬৩]

জোসেফের মতে, হযরত মুহাম্মাদ (সঃ)-এর সময়ের পূর্ব পর্যন্ত বেদুঈন ও অন্যান্য শ্রম বিমুখ আরব সমাজে সুসংগঠিত রাষ্ট্রীয় কর্মকান্ড সম্পূর্ণভাবে অনুপস্থিত ছিল। সুসংগঠিত কোন বিচার ব্যবস্থাও ছিল না।[৬৪] নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠিত করার জন্য প্রাতিষ্ঠানিক অস্তিত্ব বলতে কিছু ছিল না। ব্যতিক্রম একমাত্র পবিত্র কুরআনেই নারীর মর্যাদার কথা সুস্পষ্ট বর্ণনা করা হয়েছে।[৬৫]

প্রাক-ইসলাম যুগে কোন কন্যা সন্তান জন্মালেই তাকে হত্যা করার নিয়ম চালু ছিল। এ জন্য ধারণা পোষণ করা হত যে, কন্যা সন্তান জন্মালেই পরিবারে অসন্তোষের মাত্রা বৃদ্ধি পাবে অথবা যুদ্ধকালীন অবস্থায় মেয়েরা শত্রুদের হাতে বন্দী হলে সংশ্লিষ্ট পরিবারকে সমাজের বিচারে হেয় প্রতিপন্ন হবে হবে। এ সম্পর্কে আল কুরআনে বলা হয়েছে-

" তোমাদের সন্তানদিগকে দারিদ্র ভয়ে হত্যা করিও না। উহাদিগকেও আমিই রিযক দেই এবং তোমাদিগকেও। নিশ্চয়ই উহাদিগকে হত্যা করা মহাপাপ।"[৬৬]

৬২। আল কুর আন, ১৬ ঃ ৫৭।

৬৩। Robartson Smith : Kinship and Marriage in Early Arabia (Cambrize University Press, 1903, p-92-94.

৬৪। সমাজ বিজ্ঞান ও ইসলাম, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, গবেষণা বিভাগ, জুন, ২০০১, পৃ-৩২৬-৩২৭।

৬৫। Rewben Lady, The Social strueture of Islam , London, Cambrize University Press, 1971,p-91-92.

৬৬। আল কুর আন, ১৭ ঃ ৩১।

Dhaka University Institutional Repository

ইসলাম পূর্ব আরব সমাজে নবজাতক কন্যা সন্তানকে বিভিন্ন উপায়ে হত্যা করত। কেউ গর্ত খনন করে পুতে ফেলত, কেউ উচুস্থান হতে নিক্ষেপ করত, কেউ পানিতে ডুবিয়ে মারত, কেউ কেটে ফেলত। এ সকল নির্যাতনের কারণে নারী মৃত্যুর কাছে আত্মসমর্পন করত যেন তার জন্ম মৃত্যুবরণের জন্য। আরবরা তাদের স্ত্রী কন্যা সন্তান জন্ম দিলে তা গোপন রাখত, যেন এটা ভীষণ পাপ এবং স্থায়ী অমর্যাদার কারণ। কন্যা সন্তান আল্লাহর সন্তান বর্ণনা করা হয়েছে।

"যারা নির্বুদ্ধিতার দরুণ ও অজ্ঞানতাবশত নিজেদের সন্তানদেরকে হত্যা করে এবং আল্লাহ সম্পর্কে মিথ্যা রচনা করার উদ্দেশ্যে নিষিদ্ধ গণ্য করে, তারা তো ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, তারা অবশ্যই বিপথগামী হয়েছে এবং তার সৎপথ প্রাপ্ত ছিল না।"[৬৭]

প্রাচীনকালে আরবদের সুশৃঙ্খল সমাজ-জীবন সম্পর্কে কোন জ্ঞান ছিল না। তারা বিভিন্ন বংশ ও গোত্রে বিভক্ত হয়ে যাযাবররূপে বসবাস করত। তাদের গোত্রে গোত্রে যুদ্ধ বিগ্রহ লেগে থাকত। যুদ্ধে বিজয় হলে পরাজিত গোত্রের নারীদের নিয়ে বিবাহ করত জোর করে। এ জন্যই আবরগণ কন্যা সন্তান জন্মকে ভয় ও ঘৃণা করত এবং পুত্র সন্তান জন্মকে পছন্দ করত। কারণ পুত্র সন্তান অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ও যুদ্ধের ময়দানে সাহায্যকারী হত। এ কারণে আরবরা কন্যাদের জীবিত কবর দিয়ে হত্যা করত।[৬৮]

প্রাক-ইসলামী যুগে আরব সমাজে প্রচলিত বিবাহ নীতি ইতিবৃত্ত পর্যবেক্ষণ করলে প্রতীয়মান হয় যে, বিবাহের ক্ষেত্রে পুরুষেরা যে কাউকে বিবাহ করতে পারত। রক্ত সম্পর্কে বা বংশগতসূত্রে কোন অন্তরায় ছিল না। এ সম্পর্কে Said Abdullah Seif Al-Hatimy বলেন "অজ্ঞতার যুগে পিতার মৃত্যুর পর তাহার পুত্র মাতার উত্তরাধিকারী হইত। সে নিজেই তাহাকে বিবাহ করিতে পারিত। অথবা নিজ ইচ্ছানুসারে যে কোন লোকের নিকট বিবাহ দিতে পারিত আর সে তাহার বিবাহ বন্ধ করিতে পারিত। মাতা অন্য স্বামী গ্রহণ করিতে চাহিলে পুত্রকে মুক্তিপন দিতে হইত।[৬৯]

৬৭। আল কুর আন, ৬ ঃ ১৪০।

৬৮। Rustum and Zurayk : History of the Arab's and Arabic Culture, Beirut, 1940, p-36.

৬৯। Said Abdullah Seif Al-Hatimy, Ibid, p-15

Dhaka University Institutional Repository

তৎকালীন সভ্যতায় বহু বিবাহ প্রথা প্রচলন ছিল তেমন আরবেও বহু বিবাহ প্রথা ছিল। একজন স্বামী কয়েকজন স্ত্রী গ্রহণ করতে পারত, সরকারী আইন, সামাজিক রীতিনীতি ও ধর্মের বিধানে এর কোন সীমা নির্ধারিত ছিল না; সামর্থ্য থাকলে যে যতখুশি বিবাহ করতে পারত।[৭০]

আবু দাউদ ও তিরমিযীর ভাষ্য মতে, হযরত ওহাব আসাদী (রাঃ) যখন ইসলাম গ্রহণ করে তখন তার স্ত্রী ছিল দশজন। আর হযরত গায়না ছাকাফী মুসলমান হবার সময় তার দশজন স্ত্রী ছিল।[৭১]

অন্য সূত্রে জানা যায় যে, আরব রমনীদের স্বামী নির্বাচনের কোন অধিকার ছিল না। পিতা বা তার কোন পুরুষ আত্মীয় তার স্বামী নির্বাচনের পূর্ণ ক্ষমতার অধিকারী। মুতআ বিবাহ (নারী পুরুষের মধ্যে চুক্তিতে নির্ধারিত সময়ের জন্য বিবাহ) এবং বহুপতি গ্রহণের প্রথাও আরবে প্রচলিত ছিল। আরববাসী তার বৈমাত্রেয় বোন, বিমাতা এমনকি তার বিধবা পুত্রবধুকেও বিবাহ করত। ভ্রাতার মৃত্যুর পর ভ্রাতৃবধুকে স্ত্রীরূপে ব্যবহার করতে পারত।[৭২]

আরবদের মধ্যে তালাকের ব্যাপারেও কোন প্রতিবন্ধকতা ছিল না। পুরুষের যখনই ইচ্ছা বিবাহ করত এবং যতবার খুশী স্ত্রীকে তালাক দিত। আবার ইদ্দত পূর্ণ হওয়ার আগেই খেয়াল-খুশি মত তাকে ফিরিয়ে আনত অথবা প্রত্যাহার করত। এক ব্যক্তি তার স্ত্রীকে নাজেহাল করার উদ্দেশ্য বললঃ " আমি তোমাকে সাথেও রাখব না আবার পরিত্যাগও করব না। তার স্ত্রী জানতে চাইল, তা সে কিভাবে করবে? সে বললঃ আমি তোমাকে তালাক দিব এবং ইদ্দত শেষ হওয়ার আগেই আবার রুজু করব। এরপর আবার তালাক দিব এবং ইদ্দত শেষ না হতেই পুনরায় রুজু করব।"[৭৩]

৭০। সাইয়্যেদ জালাল উদ্দিন আনসার উমরী, প্রাগুক্ত, পৃ-১৬।

৭১। সাইয়্যেদ জালাল উদ্দিন আনসার উমরী, প্রাগুক্ত, পৃ-১৬।

৭২। O' Leary D Lacy : Arabia Before Muhammad, London, 1927, P-191, Jhomas, Berfram, The Arabs, London, 1937, p-16

৭৩। আবু দাউদ, সুলায়মান ইবনুল আশআস, সুনান, ১ম খন্ড, কিতাবুত তালাক, দিল্লী, মাকতাবা রাশীদিয়া, প্রা. বি. পৃ-৩০৪।

Dhaka University Institutional Repository

জালিম স্বামীদের কবল থেকে স্ত্রীদের মুক্তি পাওয়ার কোন পথ ছিল না। এভাবে নারীদের বিবাহিত জীবনে সুখ-শান্তির পরিবর্তে নেমে আসত অশান্তি ও গ্লানি। ঘরে একাধিক স্ত্রী বর্তমান থাকা সত্ত্বেও স্বামী অন্যান্য নারীদের সাথে অবৈধ দৈহিক সম্পর্ক স্থাপন করত। কিন্তু স্ত্রীদের এর প্রতিবাদ করার কোন অধিকার ছিল না। স্বামীরা মন না চাইলে স্ত্রীদের সাথে দৈহিক সম্পর্ক করত না আবার তালাকও দিত না। নারীরা বন্দীজীবন যাপন করত এবং এভাবেই তাদের মৃত্যু হত। স্বামীরা স্ত্রীদের উপর সীমাহীন অত্যাচার ও নির্যাতন চালাত। কখনো কখনো জোরপূর্বক স্ত্রীদেরকে অন্য পুরুষের সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত হতে বাধ্য করত এবং এর মাধ্যমে স্বামীরা প্রচুর অর্থ উপার্জন করত।[৭৪]

স্বামীর জীবদ্দশায় স্ত্রী তার অধীনে থাকত। স্বামীর মৃত্যু হলে তার উত্তরাধিকারীরা তার বিধবা স্ত্রীর উপর পূর্ণ কর্তৃত্ব লাভ করত। তারা নিজেরা কেউ চাইলে তাকে বিয়ে করত অথবা অন্য কারো সাথে বিয়ে দিত। আবার তাকে আদৌ বিয়ে না দেয়ার ব্যাপারেও তাদের এখতিয়ার ছিল।[৭৫]

আরও একটি বিষয় উল্লেখ যে, একজন নারীর উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত সম্পত্তির কোন অধিকার তো ছিলই না, বরং বিয়ে বাবদ ধার্য্য দেনমোহরেও তার কোন হক ছিল না। এভাবেই একজন নারী সম্পূর্ণভাবে পুরুষের ইচ্ছার কাছে বাঁধা পড়ে যেত।[৭৬] ইসলাম পূর্ব আরবে নারীরা এত অবহেলিত ছিল যে নামী-দামী খাবার তারা কখনই খেতে পারত না। পুরুষেরা ছিল এসব খাবারের যোগ্য। আল্লাহ বলেন,

"তাহারা আরো বলে, 'এইসব গবাদি পশুর গর্ভে যাহা আছে তাহা আমাদের পুরুষদের জন্য নির্দিষ্ট এবং ইহা আমাদের স্ত্রীদের জন্য অবৈধ; আর উহা যদি মৃত হয় তবে সকলেই ইহাতে অংশীদার।' তিনি তাহাদের এইরূপ বলিবার প্রতিফল অচিরেই তাহাদিগকে দিবেন; নিশ্চই তিনি প্রজ্ঞাময়, সর্বজ্ঞ।"[৭৭]

৭৪। মাওলানা মোঃ ফজলুর রহমান আশরাফী, ইসলামী উত্তরাধিকার আইনে নারীর অধিকার ও ফারায়েজ, ঢাকাঃ আর আই এস পাবলিকেশন্স, ১৯৯৫, পৃ-১১।

৭৫। সাইয়্যেদ জালালুদ্দিন আনসার উমরী, ইসলামী সমাজে নারী, প্রাগুক্ত, পৃ-১৮।

৭৬। Ruth in Ansion (SM): Family : Its Runction and Desting, Newyourk, Harpar and Brather's 1989, p-58-79.

৭৭। আল কুর আন, ৬ঃ ১৩৯।

Dhaka University Institutional Repository

জাহেলীয়া যুগের নারীদের মর্যাদা বর্ণনা করে হযরত ওমর ফারুক (রাঃ) বলেছেন, "আল্লাহর নামে শপথ করে বলছি, আমরা জাহেলী যুগে নারীদের কোন মর্যাদাই দিতাম না। শেষ পর্যন্ত আল্লাহ তা'আলা তাদের সম্পর্কে বিভিন্ন হেদায়েত নাযিল করেন এবং তাদের জন্য মিরাসী স্বত্বে একটি অংশ নির্ধারণ করেন।[৭৮]

তৎকালীন আরব সমাজে মদ, জুয়া ও যুদ্ধ ছাড়া নারীকে ভোগের সামগ্রী হিসেবে ব্যবহার করেছে। এ সম্পর্কে ইঙ্গিত করে ঐতিহাসিক খোদা বক্স বলেন, War, woman and wine were the there absorbing possessins of the Arab."[৭৯]

সুশৃংঙ্খল জীবন সম্পর্কে আরববাসীদের কোন জ্ঞান ছিল না। অরাজকতায় ভরে গিয়েছিল দেশ। তাই জনৈক ঐতিহাসিক বলেন, "This revolting custom prevalied extensively until it was supressed by Muhammad peace be on him." অর্থাৎ হযরত মুহাম্মাদ (সঃ) দমন না করা পর্যন্ত এ নিদারুণ ঘৃণ্য প্রথা ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিল।[৮০]

ইতিহাস ও অন্যান্য ধর্মসহ প্রতীয়মান হয় যে, ইসলামপূর্বে কোন ধর্ম, সমাজ, জাতি ও সভ্যতায় নারীর কোন সম্মান, মর্যাদা, নিরাপত্তা ও উত্তরাধিকারিতা ছিল না। এ বাস্তব ও চিরন্তন সত্য উপলব্ধি করে জনৈক ঐতিহাসিক বলেন, "ইসলামের আবির্ভাবের পূর্বে দুনিয়ার কোন দেশেই নারী স্বীয় মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত ছিল না। কোথাও নারী সম্পত্তির মালিক ও উত্তরাধিকারী হতে পারত না।"[৮১]

ইসলামই প্রথম উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত পিতা বা স্বামীর সম্পত্তিতে নারীর মৌলিক অধিকার প্রদান এবং প্রাক-ইসলাম যুগের নারী পুরুষের অবৈধ সম্পর্ককে নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। ইসলামী সভ্যতা এবং ধ্যান-ধারণা বিকাশের সাথে সাথে নারীর জীবন যাত্রার মান উন্নত হয় এবং সমাজের প্রতিটি স্তরে তার প্রভাব বিস্তার লাভ করে। পরবর্তীকালে দেখা যায় যে, পুরুষের পাশাপাশি নারীরাও সম্মুখ সমরে অংশ গ্রহণ করেছে।[৮২]

৭৮। মাসিক মদীনা, প্রাগুক্ত, পৃ-৪৩।
৭৯। মাসিক মদীনা, প্রাগুক্ত, পৃ-৪৩।
৮০। O' Leary De Lacy : Arabia Before Muhammad, London, 1927, P-282.
৮১। মাসিক মদীনা, পৃ-৪৩।
৮২। Thamas Arnald : The Prencher of Islam, London, Constable, co-1993, p-8.

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় অধ্যায়

ইসলামে নারীর অবস্থান ও মর্যাদা

ইসলামে নারীর অবস্থান ও মর্যাদা

বহুবিধ কারণে ইসলামে নারীর মর্যাদা সম্পর্কে ভ্রান্তি বিরাজ করছে। ধরা হয় যে, কোন ব্যক্তিগত মুসলিমের আচরণ বা কোন দেশের মুসলিম সমাজের সংস্কারই ইসলামী আইন এবং বিধি। এটা একটি ভ্রান্ত ধারণা।

তাছাড়া মুসলিম সমাজে নারীর অধিকার সম্পর্কে অমূলক এবং অদ্ভুত অদ্ভুত কিছু ধারণা অমুসলিম সমাজে বিরাজ করছে। মুসলিম সমাজ শিক্ষা-দিক্ষার ক্ষেত্রে পশ্চাতপদ। নারীদের মর্যাদা এবং অধিকার সম্বন্ধে মুসলিম নারী এবং পুরুষ উভয়ই বহু সমাজে অনাবহিত।

অজ্ঞতার কারণে শারীরিক দূর্বলতা এবং শিক্ষাগত পশ্চাৎপদতার জন্য নারী তার ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়। আর এই বিষয়টি ইসলামে নারীর অধিকারহীনতা বলে চালিয়ে যাওয়া হয়। অনগ্রসর তৃতীয় বিশ্বের বহুদেশে নারী তার ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত। এরূপ দেশ মুসলিম অধ্যুষিত হলে ইসলাম বিরোধীদের কারণে অনগ্রসরতা কে দায়ী না করে ইসলামকেই দায়ী করা হয়।

অপরপক্ষে কিছু কিছু পাশ্চাত্য প্রভাবিত আধুনিক মুসলিম হীনমন্যতার শিকার হয়ে আছে । তারা ইসলামকে পাশ্চাত্যের সমমানের আধুনিক প্রমাণের প্রচেষ্টায় নিয়োজিত। এ হীনমন্যতার কারণেই প্রায় সবগুলো মুসলিম দেশের অধিকাংশ পাশ্চাত্য শিক্ষিত মানুষ ইসলামী বেশভূষা পরিহার করে পাশ্চাত্য বেশভূষা অবলম্বন করেছে। তারা যে বিষয়গুলো পাশ্চাত্য মূল্যবোধের সংগে সংগতিপূর্ণ সেগুলোই ইসলামী বলে উপস্থাপন করতে চায়। তার ফলে ইসলামী আদর্শের একটি সামগ্রিক এবং স্বীকৃত রূপ পাওয়া কষ্টকর।

Dhaka University Institutional Repository

ইসলামই সর্বপ্রথম নারীকে মনুষত্বের মর্যাদা দিয়েছে, তাদেরকে দিয়েছে নাগরিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক মর্যাদা যা ছিল অন্যান্য সমাজে অচিন্তনীয়।

মুসলিম নারীর রয়েছে একটি স্বাধীন এবং স্বতন্ত্র সত্তা। ধর্মীয় আচার-আচরণ, শিক্ষার অধিকার, স্বীয় কর্মফলের পুরস্কার এবং নিজস্ব বিশ্বাস প্রতিরক্ষায় নারী-পুরুষের সংগে সমঅধিকার প্রাপ্য। ইসলাম নারীকে যে অধিকার রয়েছে কোন পুরুষ, সমাজ বা রাষ্ট্রের তা হতে বঞ্চিত করার কোন বৈধ ক্ষমতা নেই।[১]

নারী মানব প্রকৃতির ভিত্তি ঃ

আমাদের দেশে নারীর অধিকার নিয়ে অনেক লেখালেখি হয়েছে, এ নিয়ে অনেক ঘটনাও ঘটেছে যা আমাদের সবারই কমবেশী জানা। যাক এগুলো এখানে আলোচনার বিষয় নয়। নারীর অধিকার (মনে রাখতে হবে তারা দুনিয়ার জনসংখ্যার অর্ধেক নিয়ে গভীর কোন আলোচনা করতে গেলে আগে বিবেচনা করতে হবে যে প্রকৃতিগতভাবে ও ধর্মীয়ভাবে তাকে আল্লাহ কি কি সুযোগ সুবিধা দান করেছেন।[২]

আল্লাহর পক্ষ হতে সর্বশেষে আসমানী কিতাব যা মানুষের দুনিয়া ও আখেরাতের মুক্তি এবং সমৃদ্ধির একমাত্র পথ, আমাদেরকে বলছে যে যাবতীয় সামাজিক, নিয়মনীতি এবং আইন-কানুন অবশ্যই মানব প্রকৃতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে।[৩]

"তুমি একনিষ্ঠ হইয়া নিজেকে দ্বীনে প্রতিষ্ঠিত কর। আল্লাহর প্রকৃতির অনুসরণ কর, যে প্রকৃতি অনুযায়ী তিনি মানুষ সৃষ্টি করেছেন, আল্লাহর সৃষ্টির কোন পরিবর্তন নেই। ইহাই সরল দ্বীন, কিন্তু অধিকাংশ মানুষ জানে না।"[৪]

১। Abdel Rahim Umran, Family planing in the legacy of Islam, New Yourk and London, ১৯৯২. P.৬০-৬২.

২। হুজ্জাতুল ইসলাম মোহাম্মাদ তাকী মেসবাহ; নারী মানব সমাজের অর্ধেক, ইসলামে নারীর মর্যাদা, ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, ধানমন্ডি, ঢাকা-১৯৮৭ পৃ-৮।

৩। হুজ্জাতুল ইসলাম মোহাম্মাদ তাকী মেসবাহ, প্রাগুপ্ত, পৃ-৯।

৪। আল কুরআন, সূরা রুম -৩০ঃ৩০।

Dhaka University Institutional Repository

একটা প্রাণীর আভ্যন্তরীন সম্ভাবনাকে সর্বোত্তম ব্যবহারের জন্য তার প্রাকৃতিক গঠন, শক্তি, সীমাবদ্ধতা এবং কর্মপ্রণালী জেনে নেয়া উচিত। সুতরাং মানুষের কর্তব্য বা অধিকারকে নির্ধারণ করতে হলে সবচেয়ে উত্তম পন্থাই হচ্ছে তার প্রাকৃতিক সম্ভাবনা এবং গুনাবলীকে মূল্যায়ন করা। মানব প্রকৃতি ছাড়া অন্য পরিমাপই এ ক্ষেত্রে উত্তম হতে পারে না।[৫]

নারীর প্রাকৃতিক গঠন ঃ

আধ্যাতিক, গুনগত ও বুদ্ধিবৃত্তিক জীব হিসেবে মানুষের ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য ছাড়াও তার সামাজিক সম্পর্কটা অবশ্যই বিবেচনা করা দরকার। সুতরাং নারীর অধিকার সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনার মধ্যে শরীরতত্ত্ব মনঃতত্ত্ব, সমাজবিজ্ঞান ও আনুসংগিক অন্যান্য বিষয়াবলী নিয়েও চিন্তা করা প্রয়োজন। এর প্রতিটি বিষয়ের ব্যাখ্যা প্রদান খুবই সময় সাপেক্ষ হবে। কিন্তু আমাদের আলোচনার সঠিক ধারণার জন্য অন্ততঃ সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা একান্তই প্রয়োজন।

নিঃসন্দেহে নারী ও পুরুষ উভয়েই মানুষ। তেমনিভাবে তাদের উভয়েরই একই ধরণের কিছু গুনাবলী ও নৈতিক মান রয়েছে। কিন্তু তাদের অধিকার ও কর্তব্যের পার্থক্য পরিমাপের জন্য উপরোক্ত গুণাবলী ও নৈতিক মানের সাধারণ অবস্থানকে গজকাঠি হিসেবে মেনে নেয়া যায় না। এ পার্থক্যগুলো তাদের মধ্যকার বিশেষ বিশেষ বৈশিষ্ট্যেরই ফলশ্রুতি যার দ্বারা তাদেরকে পৃথক করা যায়।

শুরুতেই আমাদেরকে নারী-পুরুষের শারীরিক গঠনগত পার্থক্যগুলো বিবেচনা করতে হবে। অন্য কথায় নারীত্বের ধারনাটা কি এবং তার ভিত্তি কোথায় তা বের করতে হবে।[৬]

৫। হুজ্জাতুল ইসলাম মোহাম্মাদ তাকী মেসবাহ, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-১০।
৬। হুজ্জাতুল ইসলাম মোহাম্মাদ তাকী মেসবাহ, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-১০।

Dhaka University Institutional Repository

নারী পুরুষের মধ্যে সবচেয়ে বড় পার্থক্যই হচ্ছে তাদের যৌনাঙ্গ। তাদের স্নায়ুতন্ত্র ও অন্যান্য দিকেও পার্থক্য রয়েছে। কিন্তু এসব পার্থক্যগুলোর গবেষণা শুধুমাত্র তার শরীরতত্ত্বের ভিতরই সীমাবদ্ধ। মনঃস্তাত্ত্বিক বিবেচনায় নারী-পুরুষের মধ্যে প্রচুর ক্ষেত্রে বুদ্ধি-বিবেচনা আবেগের উপর প্রাধান্য বিস্তার করে। সমাজতাত্ত্বিক দিক দিয়ে পরিবার আবির্ভাবের একটি শক্তিশালী উপাদান হিসেবে এবং বিবাহিত দম্পতিকে একটি নিবিড় বন্ধনে আবদ্ধ রাখায় এর ভূমিকাও বিবেচনায় রাখতে হবে। নারী ও পুরুষের অধিকার ও কর্তব্য নির্ণয়ে যৌন জীবনের পার্থক্য অত্যন্ত নগন্য বা দুর্বল মনে হলেও বস্তুতঃ সতর্কতার সাথে বিবেচনা করলে দেখা যাবে যে, এ সামান্য পার্থক্যই তাদের সামাজিক মর্যাদা অধিকার ও কর্তব্যের বেলায় অনেক বিরাট হতে পারে। নারী ও পুরুষের মধ্যে রয়েছে পরস্পর পরস্পরের জন্য ভালবাসা ও সম্প্রীতি। একটা শক্তিশালী ও পারস্পারিক যৌন আকর্ষণ ও আনন্দই ভালবাসা আর সম্প্রীতিরই ফল। এর ভিত্তিতেই তারা মিলিত হয় প্রকৃতিকে তার লক্ষ্যে পৌঁছাতে সাহায্য করে এবং তা হচ্ছে মানব বংশের টিকে থাকা।[৭]

মানব সৃষ্টি সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা কুরআনে উল্লেখ করেছেন-- হে মানুষ ! উত্থান সম্বন্ধে হও তবে অবধান কর আমি তোমাদিগকে সৃষ্টি করেছি মৃত্তিকা হইতে, তার পর শুক্র হবে, তার পর পূর্ণাকৃতি অথবা অপূর্ণাকৃতি গোশত পিন্ড হতে তোমাদের নিকট ব্যক্ত করার জন্য আমি যাহা ইচ্ছ করি তাহা এক নির্দিষ্টকালের জন্য মাতৃগর্ভে স্থিত রাখি। তার পর আমি তোমাদিগকে শিশুরূপে বাহির করি, পরে যাহাতে তোমরা পরিণত বয়সে উপনীত হও। তোমাদের মধ্যে কারও কারও মৃত্যু ঘটান হয় এবং তোমাদের মধ্যে কাকেও কাকেও প্রত্যাবৃত্ত করা হয় জীনতম বয়সে, যার ফলে উহারা যাহা কিছু জানিত সে সম্বন্ধে উহা সজ্ঞান থাকে না। তুমি ভূমিকে দেখে শুষ্ক, অতঃপর উহাতে আমি বারি বর্ষণ করলে উহা শস্য-শ্যামলা হয়ে আন্দোলিত ও স্ফীত হয় এবং উদ্গত করে সর্ব প্রকার নয়নাভিরাম উদ্ভিদ।[৮]

৭। হুজ্জাতুল ইসলাম মোহাম্মাদ তাকী মেসবাহ, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-১০-১১।

৮। হুজ্জাতুল ইসলাম মোহাম্মাদ তাকী মেসবাহ, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-১১-১২।

Dhaka University Institutional Repository

জন্মদানে পুরুষের ভূমিকা তাৎক্ষণিক অপরদিকে নারীকে কয়েকমাস গর্ভধারণ করতে হয়। এ সময়ের সাথে আমরা যদি শিশুকে দুগ্ধদান লালন-পালন ইত্যাদি সময় যোগ করি তাহলে দেখা যাবে নারীর ভূমিকা পুরুষের চেয়ে অনেক বেশী। কোরআন সামাজিক ক্ষেত্রে নারীর ভূমিকা এজন্য সীমাবদ্ধ করেনি যে সে শুধু মানুষ উৎপাদনেরই একটা যন্ত্র। এর বিপরীতে আমরা কিছু বলতে চাই না। আমরা বরং এর চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ কিছু দিকের উপর জোর দিব, আমরা বলতে চাচ্ছি সন্তান উৎপাদনে পুরুষের ভূমিকা নারীর সাথে তুলনা করা যায়না। যাতে রয়েছে সময় ব্যয়, প্রসব বেদনা ও কষ্ট। এভাবেই আমাদেরকে স্বীকৃতি দিতে হবে সমাজে নারীর প্রাকৃতিক ও সহজাত ভূমিকা ও কর্তব্যকে।

পুরুষকে যদি মাতৃত্বের দায়িত্ব দেয়া হতো তবে তা নিঃসন্দেহে অসম্ভব হয়ে দাঁড়াত। যেহেতু সন্তান উৎপাদনের বোঝা শুধুমাত্র তাকেই বহন করতে হয় সেহেতু পরম দয়াবান আল্লাহ, নারীকে এমন কিছু শক্তিদান করেছেন যার দ্বারা সে এই গুরুত্বপূর্ণ প্রাকৃতিক দায়িত্ব আঞ্জাম দিতে পারে। সেই সাথে একাজ সম্পাদনের মাধ্যমে সে আনন্দ লাভ করতে পারে। এ আল্লাহর দানই হচ্ছে মাতৃত্বের স্নেহ মমতা শক্তি।[৯]

নারীর সৃষ্টিগত কাঠামো ও অধিকারের মধ্যে পারস্পারিক সম্পর্ক

এখানে আমরা প্রধান বিষয় বস্তু ইসলামে নারীর অধিকার সম্পর্কে আলোচনা করছি। এক্ষেত্রে সকল প্রকার প্রান্তিক ধ্যান-ধারণা পরিশেষের চাপ ও পাশ্চাত্য সভ্যতার অন্ধ সমর্থকদেরও তর্জন গর্জন এড়িয়ে চলতে চেষ্টা করব। প্রথমেই চিন্তা-ভাবনা করে দেখবো যে, শারীরিক গঠন প্রক্রিয়া জীব বিজ্ঞান ও মনোবিজ্ঞানের দৃষ্টিতে উভয়ের মধ্যে কোন প্রাকার পার্থক্য আছে কিনা আদতেই যদি কোন পার্থক্য থেকে থাকে তবে সেগুলোর সীমাবদ্ধতা বা দাবী কতটুকু। তাছাড়া উভয়ের মাঝে বিরাজমান এসব পার্থক্যসমূহ মানুষের ব্যক্তিত্ব ও সামাজিক মর্যাদা কতটা সামঞ্জস্যপূর্ণ ও অসামঞ্জস্যশীল? নানা আকৃতির অসংখ্য জিনিসের সমন্বয়ে পৃথিবী ভরপুর। এগুলোর প্রত্যেকেরই রয়েছে একটা স্বাতন্ত্র্য। প্রত্যেকেরই রয়েছে নিজস্ব সীমাবদ্ধতা ও বৈশিষ্ট যা তাকে সৌন্দর্য মাধুর্যে বিভূষিত করে তোলে। পশু, প্রাণী, উদ্ভিদ ইত্যাদিও মাঝে রয়েছে প্রজাতিগত পার্থক্য আবার একই প্রজাতির সকলের মাঝে একটা মিল দেখতে পাওয়া যায়।

৯। হুজ্জাতুল ইসলাম, মোহাম্মদ তাকী মেসবাহ, প্রাগুক্ত, পৃ-১১-১২।

Dhaka University Institutional Repository

অনুরূপভাবে মানব বংশের মাঝে পার্থক্য বিদ্যমান এবং দেখতে পাওয়া যায় কতিপয় স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য। প্রজাতিগত পার্থক্য খুব বড় ধরণের হলেও সেই ব্যক্তির পার্থক্য ততো মারাতত্মক নয়। যা হোক, পরস্পর দুই ব্যক্তির মাঝে বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রচুর পার্থক্য ওয়েছে। আর পার্থক্য প্রমাণ করার জন্যে সব যুক্তি দু'জনের হাতের ছাপ পরীক্ষা করাই যথেষ্ট। লোকদের মধ্যকার পার্থক্যের ব্যাপাওে এক পর্যবেক্ষণ হতে জানা যায় যে, তাদের মধ্যে চিন্তা, যোগ্যতা, মানষিকতা, মানসিক ও শারীরিক অবস্থান সহজাত প্রবৃত্তির প্রাবল্য, বাহ্যিক চেহারা, উচ্চতা ও ওজন, বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ বহুবিধ পার্থক্য বিদ্যমান। লোকদের সামাজিক মর্যাদা ও অবস্থান হতে এসব বাহ্যিক প্রতিক্রিয়া প্রত্যক্ষ করা যায়। প্রত্যেকে নিজ যোগ্যতা ও পারিপার্শ্বিকতার উপর ভিত্তি করে সামাজিক দায় দায়িত্ব গ্রহণ করে। এ ধরণের বহুমুখী পার্থক্য সমাজের সামগ্রিক প্রয়োজন পূরণ করে তাকে স্থায়িত্ব ও জীবনী শক্তি দান করে থাকে।[১০]

নারী ও পুরুষের মাঝে আরো কতিপয় স্পষ্ট পার্থক্য রয়েছে যেগুলো পরস্পরের মাঝে পার্থক্য সৃষ্টি করেছে এবং উভয়ের জন্যে স্বতন্ত্র দায়িত্ব ও মর্যাদা নির্ধারণ করেছে। শারীরিক গঠনের ক্ষেত্রে পুরুষ মাঝারি ধরণের কর্মশক্তি, শারীরিক গঠন, অধিক ওজন, অপেক্ষাকৃত লম্বা এবং প্রচুর মানসিক শক্তি সম্পদ দ্বারা সমৃদ্ধ। তাই তার শারীরিক অবস্থান স্বাভাবিকভাবে প্রমাণ করে অপেক্ষাকৃত কঠোর ও জটিল কাজের জন্যেই তার সৃষ্টি। মস্তিকের যে অবস্থা আবেক তাড়িত তার অধিকাংশ লাভ করেছে নারী, আর যে অংশ চিন্তা চেতনার সাথে বিজড়িত তার অধিকাংশ রয়েছে পুরুষের। এয়াড়া নারী দেহ সন্তান ধারণ ঔষধ পান করানোর উপযোগী সকল উপায়-উপাদান দ্বারা সুসজ্জিত। সন্তান ধারণ, প্রতিপালন ও শিক্ষাদান তার অন্যতম আল্লাহ প্রদত্ত দায়িত্ব। সন্তান প্রতিপালনের জন্যে প্রচুর আবেগ-অনুভূতির প্রয়োজন-যাতে শিশুর বর্ধিত অবস্থা ও মানসিক পরিবর্তনের প্রেক্ষিতে তার যত্ন নেয়া যায়। সন্দেহাতীতভাবে, মহিলা তাদের বিশেষ শারীরিক গঠনের প্রেক্ষিতে সন্তান ধারণের যোগ্যতা এবং সন্তান প্রতিপালনের উপযোগী আবেগ-অনুভূতি ও স্নেহ-মমতা দ্বারা সমৃদ্ধ। এভাবেই মানব জীবনে নিয়ম-শৃংখলা প্রতিষ্ঠা লাভ করে।

১০। শহীদ মুহাম্মদ জাভেদ বাহোনার, ইসলাম ও নারীর অধিকার, ইসলামে নারীর মর্যাদা, ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের সাংস্কৃতিক কেন্দ্র ধানমন্ডি, ঢাকা-১৯৮৭, পৃ-৩৭-৩৮।

Dhaka University Institutional Repository

যুক্তির মাত্রা না বাড়িয়ে দৃঢ়তার সাথে বলা যায় পুরুষের তুলনায় নারী মানব সমাজের জন্যে প্রয়োজনীয় স্নেহ-ভালোবাসা, মায়া-মমতা গুণে অধিকহারে সমৃদ্ধ।[১১]

চিন্তা, চেতনা ও মানসিকতার ভূমিকা ঃ

স্নেহ, ভালবাসা এক ধরণের গভীর অনুরাগ যা মানুষের মাঝে সহনশীলতা, হিম্মত ও ধৈর্য-সহিষ্ণুতার জন্ম দেয়। যা হঠাৎ আবেগ-উত্তেজনার সৃষ্টির মাধ্যমে তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে থাকে। এটা এমন এক অনুভূতি যার জন্য কোন প্রকার সতর্কতা বা পূর্ব প্রস্তুতির প্রয়োজন পড়ে না। সহজেই এর উদ্দেশ্য অর্জিত হয় এবং সুচিন্তিত পরিকল্পনা এ জন্য নিষ্প্রয়োজন। অন্য কথায় স্নেহ-মমতা হচ্ছে এক ধরণের গভীর আকাংখা ও প্রচন্ড আবেগ **যা** দৃঢ় মূল নয় বরং ভাসাভাসা আবার একই সাথে সৌন্দর্য মন্ডিতও। একটি শিশুর হাসি বা কান্না মায়ের মায়া মমতায় ভরপুর আকর্ষণ। মায়ের এ ধরণের প্রজ্জলিত মায়া-মমতা প্রতিনিয়তই শিশুর বহুমুখী প্রয়োজন পূরণ করে থাকে।

জীবিকা সংগ্রহের প্রচেষ্টায় নিয়োজিত অক্লান্ত পরিশ্রমী ব্যক্তির ঘর্মাক্ত কপাল, ক্লান্ত হস্ত ও শ্রান্ত নাড়ি দেখে শুধুমাত্র মায়াবিনী নারী হৃদয়ে আবেগ সৃষ্টি হতে পারে। আর এ অনুভূতি থেকেই নারী ঘর-দোর সুসজ্জিত ও আরাম আয়েশপূর্ণ করে রাখে, যাতে জীবন-জীবিকার সংগ্রামে ক্লান্তশ্রান্ত স্বামী ঘরে ফিরে মায়া-মমতার পরিবেশে সব ভূলে যায়। স্বামী ও ছেলে-মেয়ের পোষাক-পরিচ্ছদ যা দান করে আনন্দ, ঘরকে করে বাসোপযোগী এবং সৃষ্টি করে জীবন প্রবাহ। তাছাড়া জীবন-জীবিকা অর্জনের জন্যে প্রয়োজন পারদর্শিতা ও অধ্যবসায়ের। আর এ দু'টোর জন্যে প্রয়োজন সুস্থ চিন্তার। সমাজ কাঠামোর স্বাভাবিক পরিচালনার স্বার্থেই সৃষ্টিগতভাবেই নারী পুরুষের মাঝে স্বতন্ত্র উপাদান বিদ্যমান। প্রত্যেকেই নিজ অবস্থায় মর্যাদার দাবী রাখে এবং নিজস্ব সত্তা প্রকাশের ক্ষেত্রে প্রত্যেকের গুরুত্ব অপরিসীম।[১২]

১১। শহীদ মুহাম্মদ জাভেদ বাহোনার, প্রাগুক্ত, পৃ-৩৮-৩৯।
১২। শহীদ মুহাম্মদ জাভেদ বাহোনার, প্রাগুক্ত, পৃ-৩৯-৪০।

Dhaka University Institutional Repository

আল কুরআনে নারী ঃ

নিম্নবর্ণিত মহীয়সী মহিলারা তাঁদের জীবনে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন। আল কুরআনে যাঁদের কথা উল্লেখ রয়েছে তাদের কয়েক জন সম্বন্ধে এখানে আলোচনা করা হলো।

হযরত আদম (আঃ) এবং বিবি হাওয়া (আঃ)ঃ

মানব বংশ বৃদ্ধিতে হযরত আদম অপেক্ষা বিবি হাওয়ার অবদান কম নয়। আল্লাহ সৃষ্টির যে প্রক্রিয়া নির্ধারণ করে দিয়েছেন তাতে নারীর অবদান ছাড়া বংশ বিস্তার সম্ভব নয়। সন্তান ধারণ এবং প্রসবে পুরুষের চেয়ে নারীর ব্যথা-বেদনা, যাতনা এবং ত্যাগ অনেক বেশী।

মুসলিমগণ বিশ্বাস করে না যে, নিষিদ্ধ ফল খেতে বিবি হাওয়া হযরত আদমকে প্ররোচিত করেছিল। যদিও কোন কোন ধর্মমতে হযরত আদমকে বেহেশত থেকে বিতারণের জন্য বিবি হাওয়াকে দায়ী করা হয়। শয়তান হযরত আদমকেই নিষিদ্ধ ফল খেতে কুমন্ত্রণা দিয়েছিল।[১৩]

আল কুরআনে এরশাদ হয়েছে-

"অতঃপর শয়তান তাহাকে কুমন্ত্রণা দিল, সে বলিল, হে আদম! আমি কি তোমাকে বলিয়া দিব অনন্ত জীবনপ্রদ বৃক্ষের কথা ও অক্ষয় রাজ্যের কথা? অতঃপর তারা উভয়ে উহা হতে ভক্ষণ করল, তখন তাদের লজ্জাস্থান তাদের নিকট প্রকাশ হয়ে পড়িল এবং তারা জান্নাতের বৃক্ষপত্র দ্বারা নিজদিগকে আবৃত করতে লাগল। আদম তার প্রতিপালকের হুকুম অমান্য করল, ফলে সে ভ্রমে পতিত হল। ইহার পর তার প্রতিপালক তাকে মনোনীত করল, তার তওবা কবুল করলেন ও তাকে পথ নির্দেশ করলেন।"[১৪]

১৩। Abdel Rahim Umranc op-cit, p-62.

১৪। আল-কুরআন, ২০ঃ১২০-১২২।

Dhaka University Institutional Repository

উপরোক্ত আয়াতগুলোতে দেখা যায়, শয়তান আদম (আঃ) কেই কুমন্ত্রণা দিয়েছিল এবং হযরত আদম (আঃ)ই আল্লাহর আদেশ অমান্য করেছিলেন এবং পরবর্তীতে আদম (আঃ)-এর অনুতাপ এবং তওবা কবুল করে তাকে ক্ষমা করেন এবং পথ প্রদর্শণ করেন। আল কুরআনের ভাষায় মনে হয় এজন্য হযরত আদম (আঃ) এর দায়িত্বই বেশী ছিল এবং তা-ই স্বাভাবিক। অবশ্য অন্য আয়াতে দেখা যায় যে, শয়তান হযরত আদম (আঃ) এবং বিবি হাওয়া দ'জনকেই কুমন্ত্রণা দিয়েছিল।[১৫] যেমন আল কুরআনে উল্লেখ রয়েছে-

"অতঃপর তাহাদের লজ্জাস্থান যাহা তাহাদের নিষ্ট গোপন রাখা হইয়াছিল। তাহা তাহাদের কাছে প্রকাশ করিবার জন্য শয়তান তাহাদিগকে কুমন্ত্রণা দিল এবং বলিল, পাছে তোমরা উভয়ে ফিরিশতা হইয়া যাও কিংবা তোমরা স্থায়ী হও। এইজন্যই তোমাদের প্রতিপালক এই বৃক্ষ সম্বন্ধে তোমাদিগকে নিষেধ করিয়াছেন।"[১৬]

আল কুরআনের বাণীতে মনে হয় না যে, বিবি হাওয়ার প্ররচনায় হযরত আদম (আঃ) নিষিদ্ধ ফল ভোগ করেছিলেন। অবশ্য দু'জনেই সমভাবে দায়ী এবং দু'জনেই জান্নাত হতে বিতাড়িত হয়েছেন।

সূরা ত্ব-হা-র ১২২নং আয়াতে দেখা যায় আল্লাহ দু'জনকে বেহেশত হতে বিতাড়িত করার পূর্বে তাদেরকে ক্ষমা করে দিয়েছিলেন এবং হযরত আদম (আঃ)-কে আল্লাহর বাণী বহনের জন্য নবী হিসেবে মনোনীত করেছিলেন। হযরত আদম এবং বিধি হাওয়া নিস্পাপ হয়ে পৃথিবীতে এসেছিলেন। আদি পাপের কোন ধারণা ইসলামে নেই এবং আদি পাপ আদম সন্তানের মধ্যে সম্প্রসারিত হয়েছে এরূপ ধারণা ইসলামে নেই। সকল আদম সন্তান নিস্পাপ অবস্থায় জন্ম গ্রহণ করে।[১৭]

১৫। Abdel Rahim Umranc op-cit, p-63.
১৬। আল-কুরআন, ৭ঃ২০।
১৭। Abdel Rahim Umranc op-cit, p-63.

Dhaka University Institutional Repository

হযরত মূসা (আঃ)ঃ

হযরত মূসা (আঃ) এর জীবনে ৪ জন নারীর উল্লেখ বিশেষভাবে দেখা যায়। তাঁরা হলেন হযরত মূসা (আঃ) এর মা, তার ভগ্নী, ফেরাউনের স্ত্রী আছিয়া এবং সোয়াইব (আঃ) এর বিবাহযোগ্য কন্যা। যার সাথে হযরত মূসা (আঃ) এর বিবাহ হয়েছিল।[১৮] আল কুরআনে বর্ণিত আছেঃ

"মুসা জননীর অন্তরে আমি ইংগিতে নির্দেশ করিলাম, শিশুটিকে স্তন্যদান করিতে থাক। যখন তুমি তাহার সম্পর্কে কোন আশংকা করিবে তখন ইহাকে দরিয়ায় নিক্ষেপ করিও এবং ভয় করিও না, দুঃখও করিও না। আমি অবশ্যই ইহাকে তোমার নিকট ফিরাইয়া দিব এবং ইহাকে রাসূলদের একজন করিব।"[১৯]

বিবি মরিয়ম (আঃ) এবং হযরত ঈসা (আঃ) ঃ

বিবি মরিয়ম (আঃ) এর কাহিনী অত্যন্ত সুন্দর এবং তাদের সংগে বর্ণিত হয়েছে আল-কুরআনে। যদিও তার গর্ভধারণ ছিল সম্পূর্ণ নিষ্পাপ, তবুও তাঁর মনে যে ভীতি ও শঙ্কা ছিল, তাও প্রতিফলিত হয়েছে। যদিও তিনি জানতেন যে, তিনি নিষ্পাপ, তথাপিও মানুষের ভূল বুঝাবুঝির ভয়ে তিনি ছিলেন শংকিত। আল্লাহ তার শংকা দূর করেছেন, তাঁর শিশু সন্তানকে নবুওয়াত দানের সুসংবাদের মাধ্যমে।[২০]

আল-কুরআনে বর্ণিত হয়েছে ঃ

"অতঃপর সে সন্তানকে লইয়া তাহার সম্প্রদায়ের নিকট উপস্থিত হইল, উহারা বলিল, হে মারইয়াস! তুমি তো এক অদ্ভুত কান্ড করিয়া বসিয়াছ। হে হারুন ভগ্নি! তোমার পিতা অসৎ ব্যক্তি ছিল না এবং তোমার মাতাও ছিল না ব্যভিচারিণী। অতঃপর মারইয়াম সন্তানের প্রতি ইঙ্গিত করিল। উহারা বলিল, দিয়ে কোলের শিশু তাহার সহিত আমরা কেমন করিয়া কথা বলিব? সে বলিল, আমি তো আল্লাহর বান্দা। তিনি আমাকে কিতাব দিয়াছেন; আমাকে নবী করিয়াছেন।"[২১]

১৮। Abdel Rahim Umranc op-cit, p-63.
১৯। আল কুরআন, ২৮ঃ৭।
২০। Abdel Rahim Umranc op-cit, p-63-64.
21| Avj KziAvb, 19t27-30|

Dhaka University Institutional Repository

হযরত ঈসা (আঃ)-এর উল্লেখ কুরআনে বহুবার আছে। তাঁকে মরিয়ামের পুত্র হিসেবে পরিচয় করে দেয়া হয়েছে। তাঁকে আল্লাহর পুত্র হিসেবে কোথাও পরিচয় দেয়া হয়নি।[২২]

হযরত মুহাম্মাদ (সঃ) ঃ

নবী মুহাম্মাদ(সঃ) এর জীবনে দু'জন মহিলার অবদান ছিল অতীব গুরুত্বপূর্ণ। তারা হলেন সাইয়েদা খাদিজা (রাঃ) এবং সাইয়েদান আয়েশা (রাঃ)।

সাইয়েদা খাদিজা ছিলেন রাসূল (সঃ) এর প্রথম স্ত্রী এবং বয়সে ছিলেন ১৫ বছর বেশী বয়স্কা।

নবুওয়াতী জিন্দেগীর মধ্যে তাঁর ন্যায় একজন অনুগত এবং পরিনত বুদ্ধি সম্পন্ন মহিলার অবদান ছিল অত্যধিক।

আল্লাহ্ও রাসূল (সঃ) যখন প্রথম নবুওয়াত লাভ করলেন, তিনি ভীত শংকিত হয়ে পড়েছিলেন। হযরত জিব্রাইল (আঃ) চারিদিক আবৃত করে এসেছিলেন এবং বার বারই বলছিলেন পড়ুন। তিনি জবাবে বলেছিলেন, আমি পড়তে জানি না। এ অবস্থায় রাসূল (সঃ) হতবুদ্ধি হয়েছিলেন এবং কি যে হয়েছিলেন এবং কি যে হয়েছে সঠিকভাবে অনুধাবন করতে পারছিলেন না।
নবুওয়াতের প্রথম আলোর ঝলকানির পর তিনি কম্পিত পায়ে সাইয়েদা খাদিজার কাছে হাজির হন। তিনি, (খাদীজা) তাকে সান্ত্বনা দেন এবং আশ্বস্থ করেন তাঁর কোন ক্ষতি হতে পারে না। অতঃপর তিনি তাঁকে তাঁর বংশীয় ভ্রাতা ওয়ারাকা ইবনে নাওফেল-এর নিকট নিয়ে যান।

ওয়ারাকা ছিলেন একজন ঈসাই আলেম। তিনি রাসূল (সাঃ)-কে বললেন, তিনি যা দেখেছেন তা হতে পাওে একজন ফিরিশতা, যিনি এসেছিলেন হযরত মূসা (আঃ) এবং অন্যান্য নবীদেরও নিকট।

নবুওয়াতের ১০ বছর পরেই সাইয়েদা খাদিজা (রাঃ) মৃত্যু বরণ করেন।

নবী(সঃ) এর অহী নাযিল সংক্রান্ত ঘটনা সহ আরো অন্যান্য সমাধান ও সহযোগিতা করেছেন হযরত খাদিজা (রাঃ)।

২২। Abdel Rahim Umranc op-cit, p-64.

Dhaka University Institutional Repository

নবীপত্নী সাইয়েদা আয়েশা(রাঃ) ছিলেন বহু গুণসম্পন্না। তাঁর ছিল হযরত মুহাম্মাদ (সঃ) এর আরেক পত্নী সাইয়েদা আয়শা (রাঃ) ছিলেন বহুগুণ সম্পন্না। তাঁর ছিল অসাধারণ স্মৃতিশক্তি, বৈজ্ঞানিক এবং যুক্তিযুক্ত বিশ্লেষণ করার ক্ষমতা সম্পন্ন মন। দ্বীনের প্রচারের শেষ পর্যায়ে তিনি মহানবী (সঃ)-কে বিভিন্নভাবে সহায়তা করেছিলেন। স্ত্রী হিসেবে সর্বগুনে গুনান্বিত হওয়া ছাড়াও তিনি দ্বীন প্রচারের ব্যাপারেও খুবই সহায়ক ছিলেন। ধর্ম, সামাজিক সম্পর্ক, ইতিহাস, ভাষা, কুরআন হাদীসের ব্যাখ্যায় তিনি বহু অবদান রেখেছেন।

হযরত আয়েশা (রাঃ) নবী জীবনের খুঁটি নাটি/অনেক বিষয় প্রত্যক্ষ করেছেন। আল্লাহর রাসূল (সঃ) বলেছেন, তোমাদের দ্বীনের অর্ধেক এই মহিলা ইতে গ্রহণ করো। রাসূল (সঃ) এর মৃত্যুর পর ধর্মীয় ব্যাপারে তিনি ছিলেন একজন অসামান্য ব্যক্তিত্ব। সম্মানিত সাহাবীগণ অত্যন্ত জটিল বিষয় নিয়ে তাঁর সাথে পরামর্শ করতেন।[২৩]

রাসূল (সঃ)-মর বিয়ের ব্যাপারে একটি বিষয় এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে তাঁর জীবনকালে ৬৩ বছর বয়সের মধ্যে ৫০ বছর ছিলেন এককভাবে অথবা এক স্ত্রী নিয়ে। তিনি ২৫ বছর বয়সে ৪০ বছর বয়স্কা এক বিশিষ্ট মহিলাকে বিয়ে করেন এবং তাঁর সংগে কাটিয়েছেন ২৫ বছর। পরবর্তী ১২ বছরের মধ্যে ৬ বছর ধর্মীয় ও অন্যান্য কারণে তিনি বহু সংখ্যক বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন।

নারী পুরুষের সম অধিকার ও ইসলামী দৃস্টিভঙ্গি ঃ

ইসলাম নারীকে কি দিয়েছে, তা অনুধাবন করার জন্য প্রাগ-ইসলামী যুগে কিংবা আজকের আধুনিক যুগে নারীর দুরাবস্থা নিয়ে বিলাপ করার কোন প্রয়োজন নেই। ইসলাম নারীকে যেসব অধিকার ও সুযোগ-সুবিধা দিয়েছে, তা অন্যান্য ধর্মীয় ও সাংবিধানিক ব্যবস্থায় সে কখনো ভোগ করেনি। বিষয়টিকে আংশিকভাবে না নিয়ে যদি সামগ্রিকভাবেও তুলনামূলক ধারায় পর্যালোচনা করা হয়, তবে একে উপলব্দি করা খুব সহজ হয়। ইসলামের দৃষ্টিতে নারীর অধিকার ও দায়-দায়িত্ব পুরুষের মতই সমান, তবে তা অনিবার্যরূপে পুরুষের মত অভিন্ন রূপ নয়।

২৩। Abdel Rahim Umranc op-cit, p-64-65.

Dhaka University Institutional Repository

সমতা ও অভিন্নতা সম্পূর্ণ ভিন্ন দু'টি জিনিস। এই পার্থক্যটা সহজেই বোধগম্য; পুরুষ ও নারী অভিন্ন সত্তা নয়, তবে তাদের সৃষ্টি করা হয়েছে সমানভাবে। এই পার্থক্যটা মনে রাখলে আর কোন সমস্যা থাকে না। দু'টি অভিন্ন পুরুষ ও নারীকে খুঁজে বার করা প্রায় অসম্ভব ব্যাপার।

সমতা ও অভিন্নতার মধ্যবর্তী এই পার্থক্যটা খুবই গুরুত্ববহ। সমতা আকাংক্ষিত, যথার্থ, ন্যায়সঙ্গত; কিন্তু অভিন্নতা নয়। লোকদেরকে অভিন্ন রূপে সৃষ্টি করা হয়নি। তাদেরও সৃষ্টি করা হয়েছে সমানভাবে। এই পার্থক্যটা মনে রাখলে নারীকে পুরুষের তুলনায় তুচ্ছ ভাবার কোনই অবকাশ থাকে না। নারীর অধিকার ও কর্তব্য পুরুষের মত অভিন্ন নয়, শুধুমাত্র এই অজুহাতেই তার ভূমিকাকে গুরুত্বহীন মনে করার কোন ভিত্তি নেই। নারীর পদমর্যাদা যদি পুরুষের মত অভিন্ন রূপ হত, তাহলে সে হত অবিকল পুরুষের একটি প্রতিরূপ। যা সে আদতেই নয়। ইসলাম যে তাকে অভিন্ন রূপ নয়, বরং সমান অধিকার দিয়েছে, এ সত্য এটাই প্রমাণ করে যে, সে তার প্রতি যথোচিত সু-বিবেচনার পরিচয় দিয়েছে, তার অবস্থানকে স্বতন্ত্রভাবে চিহ্নিত করেছে এবং তার স্বাধীন ব্যক্তিত্বকে স্বীকৃতি দিয়েছে।

যে নীচ মনেবৃত্তি নারীকে শয়তানের সৃষ্টি বা সংস্কৃতির উৎস রূপে আখ্যায়িত করেছে, তা ইসলামের নয়। অথবা পবিত্র কুরআন নারীর স্বেচ্ছাচারী প্রভু হিসেবেও পুরুষকে-যেখানে তার স্বেচ্ছাচারিতার সামনে আত'মসমর্পন করা ছাড়া নারীর আর কোন স্বাধীনতা নেই-কোন মর্যাদা দেয়নি; কিংবা নারীর মধ্যে কোন আত'মা আছে কিনা এ প্রশে'নও অবতারণা ইসলাম করেনি। ইসলামের ইতিহাস কখনো কোন মুসলিম নারীর মানবীয় পদমর্যাদা তার মধ্যে আত'মার উপস্থিতি এবং তার অন্যান্য সূক্ষ্ম আধ্যাতিক গুণাবলী সম্পর্কে কোনরূপ সংশয় প্রকাশ করেনি। অন্যান্য সুক্ষ্ম আধ্যাত্মিক গুণাবলী সম্পর্কে কোনরূপ সংশয় প্রকাশ করেনি। অন্যান্য প্রচলিত ধর্ম-বিশ্বাসের মত ইসলাম 'আদিপাপের' (First sin)জন্যে শুধুমাত্র হাওয়াকেই দোষারোপ করে না। পবিত্র কুরআন এর পরিষ্কারভাবে বলেছে যে, আদম ও হাওয়া উভয়েই সমানভাবে প্রলুব্ধ হয়েছিলেন। তাঁরা উভয়ে সমানভাবে পাপ করেছিল, তাঁরা অনুতপ্ত হওয়ার পর উভয়ের প্রতি আল্লাহর অনুকম্পা মঞ্জুর হয়েছিল[২৪] এবং তাঁদেরও উভয়কে সম্বোধন করে আল্লাহ বলেছিলেন--

---

২৪। Hummudah Abdalati, Islam in Fucus, Al-Madina Printing and pablication, Jeddah-1973, p-301-302.

Dhaka University Institutional Repository

"এবং আমি বলিলাম, হে আদম, তুমি ও তোমার স্ত্রী জান্নাতে বসবাস কর এবং যেথা ইচ্ছা স্বচ্ছন্দে আহার কর, কিন্তু এই বৃক্ষের নিকটবর্তী হইও না; হইলে তোমরা অন্যায়কারীদের অন্তর্ভূক্ত হইবে।"

"কিন্তু শয়তান উহা হইতে তাহাদের পদস্খলন ঘটাইল এবং তাহারা যেখানে ছিল সেখান হইতে তাহাদিগকে বহিস্কৃত করিল। আমি বলিলাম, তোমরা একে অন্যেও শত্রুরূপে নামিয়া যাও, পৃথিবীতে কিছু কালের জন্য তোমাদের বসবাস ও জীবিকা রহিল।"[২৫]

"হে আদম! তুমি ও তোমার স্ত্রী জান্নাতে বসবাস কর এবং যেথা ইচ্ছা আহার কর, কিন্তু এই বৃক্ষের নিকটবর্তী হইও না, হইলে তোমরা জালিমছের অন্তর্ভূক্ত হইবে।"

"অতঃপর তাহাদের লজ্জাস্থান যাহা তাহাদের নিকটে গোপন রাখা হইয়াছিল তাহা তাহাদের কাছে প্রকাশ করিবার জন্য শয়তান তাহাদিগকে কুমন্ত্রণা দিল এবং বলিল, পাছে তোমরা উভয়ে ফিরিশতা হইয়া যাও কিংবা তোমরা স্থায়ী হও এই জন্যই তোমাদের প্রতিপালক এই বৃক্ষ সম্বন্ধে তোমাদিগকে নিষেধ করিয়াছেন।"

"সে তাহাদের উভয়ের নিকট শপথ করিয়া বলিল, আমি তো তোমাদের হিতাকাংক্ষীদের একজন।"

এইভাবে সে তাহাদিগকে প্রবঞ্চনার দ্বারা অধঃপতিত করিল। তৎপর যখন তাহারা সেই বৃক্ষ-ফলের আস্বাদ গ্রহণ করিল, তখন তাহাদের লজ্জাস্থান তাহাদের নিকট প্রকাশ হইয়া পড়িল এবং তাহারা জান্নাতের পাতা দ্বারা নিজদিগকে আবৃত করিতে লাগিল। তখন তাহাদে প্রতিপালক তাহাদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, আমি কি তোমাদিগকে এই বৃক্ষের নিকটবর্তী হইতে বারণ করি নাই এবং আমি কি তোমাদিগকে বলি নাই যে, শয়তান তো তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু?

তাহারা বলিল, "হে আমাদের প্রতিপালক, আমরা নিজেদের প্রতি অন্যায় করিয়াছি, যদি তুমি আমাদিগকে ক্ষমা না কর এবং দয়া না কর তবে তো আমরা ক্ষতিগ্রস্থদের অন্তর্ভূক্ত হইব।"

তিনি বলিলেন, "তোমরা নামিয়া যাও, তোমরা একে অন্যেও শত্রু এবং পৃথিবীতে কিছু কালের জন্য তোমাদের বসবাস ও জীবিকা রহিল।"

২৫। আল-কুরআন, ২ঃ৩৫-৩৬।

Dhaka University Institutional Repository

তিনি বলিলেন, "সেখানেই তোমরা জীবন-যাপন করিবে, সেখানেই তোমাদের মৃত্যু হইবে এবং তথা হইতেই তোমাদিগকে বাহির করিয়া আনা হইবে।"

হে বনি আদম! তোমাদেরও লজ্জাস্থান ঢাকিবার ও বেশ-ভূষার জন্য আমি তোমাদিগকে পরিচ্ছদ দিয়াছি এবং তাকওয়ার পরিচ্ছদ, ইহাই সর্বোৎকৃষ্ট। ইহা আল্লাহর নিদর্শন সমূহের অন্যতম, যাহাতে তাহারা উপদেশ গ্রহণ কওে। হে বনী আদম, শয়তান যেন কিছুতেই তোমাদিগকে প্রলুব্ধ না করে- যেভাবে তোমাদের পিতা-মাতাকে সে জান্নাত হইতে বহিস্কৃত করিয়াছিল, তাহাদিগকে তাহাদের লজ্জাস্থান দেখাইবার জন্য বিবস্ত্র করিয়াছিল। সে নিজে এবং তাহার দিল তোমাদিগকে এমনভাবে দেখে যে, তোমরা তাহাদিগকে দেখিতে পাও না। যাহারা ঈমান আনে না, শয়তানকে আমি তাহাদের অভিভাবক করিয়াছি।[২৬]

অতঃপর আমি বলিলাম, হে আদম, নিশ্চয়ই এ তোমার ও তোমার স্ত্রীর শত্রু, সুতরাং সে যেন কিছুতেই তোমাদিগকে জান্নাত হতে বাহির করিয়া না দিয়ে দিলে তোমরা দুঃখ কষ্ট পাইবে।

"তোমার জন্য ইহাই রহিল যে, তুমি জান্নাতে ক্ষুধার্তও হইবে না ও লগ্নও হইবে না;
এবং সেথায় পিপাসার্ত হইবে না এবং রৌদ্র ক্লিষ্টও হইবে না;"

অতঃপর শয়তান তাকে কুমন্ত্রণা দিল; সে বলিল, হে আদম! আমি কি তোমাকে বলিয়া দিব অনন্ত জীবন প্রদবৃক্ষের কথা ও অক্ষয় রাজ্যেও কথা?

অতঃপর তাহার উভয়েই উহা হইতে ভক্ষণ করিল; তখন তাহাদের লজ্জাস্থান তাহাদের নিকট প্রকাশ হইয়া পড়িল এবং তাহারা জান্নাতের বৃক্ষ পত্র দ্বারা নিজদিগকে আবৃত করিতে লাগিল। আদম তাহার প্রতিপালকের হুকুম অমান্য করিল, ফলে সে ভ্রমে পতিত হইল।

ইহার পর তাহার প্রতিপালক তাহাকে মনোনীত করিলেন, তাহার তওবা কবুল করিলেন ও তাহাকে পথ নির্দেশ করিলেন।

তিনি বলিলেন, তোমরা উভয়েই একই সংগে জান্নাত হইতে নামিয়া যাও, তোমরা পরস্পর পরস্পরের শত্রু। পওে আমার পক্ষ হইতে তোমাদের নিকট সৎপথেও নির্দেশ আসিলে যে আমার পথ অনুসরণ করিবে সে বিপথগামী হইবে না ও দুঃখ-কষ্ট পাইবে না।[২৭]

২৬। আল-কুরআন, ৭ঃ১৯-২৭।
২৭। আল-কুরআন, ২০ঃ১১৭-১২৩

Dhaka University Institutional Repository

প্রকৃতপক্ষে কুরআন এই ধারণাই দিচ্ছে যে, আদিপাপ থেকে নারীর প্রতি বিদ্বেষ এবং তার কাজকর্ম সম্পর্কে সন্দেহের অনুভব হয়েছে, তার জন্য আদমই অধিকতর দোষারোপের উপযোগী। কিন্তু ইসলাম এ ধরণের দোষারোপ ও সন্দেহ পোষণকে যুক্তিসংগত বলে মনে কওে না। কেননা, আদম ও হাওয়া উভয়ই সমানভাবে ভুল-ভ্রান্তিতে লিপ্ত হয়েছিলেন এবং আমাদের যদি হাওয়াকে দোষারোপ করতে হয়, তাহলে আদমকেও তদানুরূপ, এমনকি তদঅপেক্ষা বেশী দোষারোপ করা উচিত।

ইসলামে নারীর পদ-মর্যাদা কিছুটা অনুপম, কিছুটা অভিনব ও কিছুটা অনন্য ঃ অন্য কোন সমাজ ব্যবস্থায় এর সমতুল্য কিছু নেই। আমরা প্রাচ্যেও কম্যুনিষ্ট জগত কিংবা গণতান্ত্রিক সমাজগুলোর দিকে তাকালে দেখতে পাই যে, নারী বাস্তবিকই কোথাও সুখকর অবস্থায় নেই। তার সামাজিক পদ-মর্যাদা বাঞ্চনীয় নয়। তাকে বেঁচে থাকার জন্যে অনেক কঠোর পরিশ্রম করতে হয়; কখনও কখনও সে পুরুষের ন্যায় একই কাজ সম্পাদন করে, কিন্তু তাকে পারিশ্রমিক দেয়া হয় পুরুষের চেয়ে কম। সে এক ধরণের স্বাধীনতা ভোগ করে বটে, কিন্তু কোন কোন ক্ষেত্রে বেলেল্লাপনারই নামান্তর। আজকে নারী যেখানে অবস্থান করছে সেখানে পৌঁছার জন্যে সে যুগ যুগ ধরে, শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে সংগ্রাম করেছে। জ্ঞানার্জনের অধিকার এবং কাজ ও উপার্জনের স্বাধীনতা লাভের জন্যে তাকে অনেক কিছু কোরবানী দিতে এবং তার অনেক স্বাভাবিক অধিকার বর্জন করতে হয়েছে। একটি আত্মা বিশিষ্ট মানবসত্ত্বা রূপে স্বীয় মর্যাদা প্রতিষ্ঠার জন্যে সে অনেক মূল্য দিয়েছে। এই সব ব্যয়সাধ্য কোরবানী ও কষ্টকর সংগ্রাম সত্যেও নারী সেই অধিকার লাভ করেনি। যা ইসলাম তার জন্যে একটি মাত্র ঐশী ঘোষণা দ্বারা প্রতিষ্ঠিত করে দিয়েছে।[২৮]

আধুনিক যুগে নারীর অধিকার স্বেচ্ছা প্রণোদিতভাবে কিংবা তার প্রতি স্বহৃদয়তার নিদর্শণ হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেনি। আধুনিক নারী তার বর্তমান অবস্থানে পৌঁছেছে শক্তি প্রয়োগ করে স্বাভাবিক প্রক্রিয়া বা পারস্পারিক সম্মতিক্রমে কিংবা ঐশী শিক্ষা বলে নয়। তাকে লক্ষ্যে পৌঁছাতে বল প্রয়োগ করতে হয় এবং নানারূপ পরিস্থিতি তার সাহায্যে এগিয়ে আছে। যুদ্ধকালে জনশক্তির অভাব, অর্থনৈতিক প্রয়োজনের চাপ এবং শিল্পায়নের চাহিদা নারীকে ঘরের বাইওে আসতে, কাজ করতে, শিক্ষা গ্রহণ করতে, জীবিকার জন্যে সংগ্রাম করতে, পুরুষের তুল্য রূপে আত্ম প্রকাশ করতে এবং তার পাশাপাশি জীবন পথে ছুটিতে বাধ্য কওে। পরিস্থিতি তাকে বলপূর্বক চালিত করে এবং বিনিময়ে সে নিজেকে বাধ্য করে সামনে এগিয়ে যেতে এবং নতুন পদ-মর্যাদা লাভ করতে।

২৮। Hummudah Abdalati, op-cit, p-302-303.

Dhaka University Institutional Repository

পরিস্থিতির এই আনুকুল্যে সকল নারী সন্তুষ্ট ছিল না এবং কর্মধারার ফলশ্রুতিতে তার সুখী ও তৃপ্ত কিনা তা একটি সতন্ত্র বিষয়। কিন্তু প্রকৃত ব্যাপার এই যে, আধুনিক নারী যে অধিকারই ভোগ করছে তা তার মুসলিম প্রতিপক্ষের অধিকারের তুলনায় নিতান্তই কম। ইসলাম নারীকে যা দিয়েছে, তা তার প্রকৃতির সাথে সংগতি রক্ষা করছে, তাকে পরোপুরি নিরাপত্তা দিচ্ছে এবং অপ্রীতিকর পরিস্থিতি ও অনিশ্চিত জীবন ধারার মোকাবেলায় তার সংরক্ষণের ব্যবস্থা করছে। আধুনিক নারীকে তার মর্যাদা লাভ, তার জীবন গঠন ও আত্ম প্রতিষ্ঠার জন্য যে বিরাট ঝুকি গ্রহণ করতে হচ্ছে, এখানে তার বিশুদ্ধ আলোচনার প্রয়োজন নেই। নারী তথাকথিত অধিকারের পরিণামে যেসব দুঃখ কষ্ট ও বাধা বিঘ্নে সে জড়িয়ে পড়েছে। আমরা কারও সন্ধান নেবার প্রয়োজন বোধ করি না। অথবা আধুনিক নারী যে অধিকার ও স্বাধীনতা জন্য গর্বিত, তার দরুন বহু বিধ্বস্ত অসুখী পরিবারের দুঃসহ পরিস্থিতিকে কাজে লাগানোর কোন অভিপ্রায় আমাদের নেই। আজকে পাশ্চাত্যের অধিকাংশ নারী অবাধে বাইরে ঘুরতে, কাজ ও উপার্জন করতেও পুরুষের সমকক্ষ হওয়ার ভান করতে স্বাধীনতার অধিকার প্রয়োগ করছে। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের সাথেই বলতে হয়, এদের তারা করছে তাদের পারিবারিক স্বার্থের বিনিময়ে। এটা সুস্পষ্ট এবং সর্বজনবিদিত। যেটা সুবিদিত নয়, তাহলো ইসলামে নারীর সামাজিক মর্যাদা। তাই নিম্নোক্ত অনুচ্ছেদ সমূহে নারী সংক্রান্ত ইসলামের দৃষ্টিভংগি সংক্ষেপে বিবৃত করার চেষ্টা করা হবে।

(১) ইসলামের দৃষ্টিতে মানব জাতির প্রজনন ক্রিয়ায় নারী পুরুষের তুল্যরূপ সঙ্গীনী হিসেবে স্বীকৃত। পুরুষ হলো জনক, নারী হলো জননী আর জীবনের জন্য উভয়েই হলো অপরিহার্য। এই ক্ষেত্রে নারীর ভূমিকা পুরুষের তুলনায় কিছুমাত্র কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। এই অংশীদারিত্বের কারণ প্রতিটি ক্ষেত্রেই নারীর রয়েছে সমান অংশ, প্রতিটি ব্যাপারেই সে সমান অধিকার লাভের যোগ্য; কেননা পুরুষ সঙ্গীর মতই সে সমান দায়-দায়িত্ব পালন করছে। তার মধ্যে ঠিক ততগুলো গুণাবলী ও ততখানি মনুষ্যত্ব রয়েছে, যতটা রয়েছে তার পুরুষ সঙ্গীর মধ্যে।[২৯] মানব জাতির প্রজনন ক্রিয়ায় তার এই সমান অংশী দারিত্ব প্রসংগে মহান আল্লাহ বলেছেন ঃ

২৯। Hummudah Abdalati, op-cit, p-303-304.

Dhaka University Institutional Repository

কুরআন পাকের ভাষায় ঃ

"হে মানুষ! আমি তোমাদিগকে সৃষ্টি করেছি এক পুরুষ ও এক নারী হতে, পরে তোমাদিগকে বিভক্ত করেছি বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে। যাতে তোমরা একে অপরের সহিত পরিচিত হতে পার। তোমাদের মধ্যে আল্লাহর নিকট সেই ব্যক্তিই অধিক মর্যাদা সম্পন্ন যে তোমাদের মধ্যে অধিক মুত্তাকী। নিশ্চয়ই আল্লাহ সকল কিছু জানেন, সমস্ত খবর রাখেন।[৩০]

হে মানব তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে ভয় কর যিনি তোমাদিগকে এক ব্যক্তি হইতেই সৃষ্টি করিয়াছেন ও যিনি তাহা হইতে তাহার স্ত্রী সৃষ্টি করেন যিনি তাহাদের দুই জন হইতে বহু নর-নারী ছড়াইয়া দেন; এবং আল্লাহকে ভয় কর যাহার নামে তোমরা একে অপরের নিকট যাঞ্চা কর এবং সতর্ক থাক জাতি বন্ধন সম্পর্কে নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের উপর তীক্ষ্ণদৃষ্টি রাখেন।[৩১]

সে ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত দায়িত্ব বহনে এবং নিজের কর্মকান্ডের পুরস্কার গ্রহণের ব্যাপারে পুরুষের সমকক্ষ। সে মানবের গুণাবলী ও আধ্যাতিক উচ্ছাকাঙ্খার যোগ্যতার বিচারে একটি স্বাধীন ব্যক্তিত্বরূপে স্বীকৃত। তার মানবীয় প্রকৃতি পুরুষের চেয়ে তুচ্ছ নয় কিংবা ভিন্নও নয়। তারা উভয়ই একে অপরের পরিপূরক।[৩২] আল্লাহ বলেছেন ঃ

"অতঃপর তাহাদের প্রতিপালক তাহাদের ডাকে সাড়া দিয়া বলেন, আমি তোমাদের মধ্যে কর্মে নিষ্ট কোন নর অথবা কোন নারীর কর্ম বিফল করি না; তোমরা একে অপরের অংশ। সুতরাং যাহারা হিযরত করিয়াছে, নিজ গৃহ হইতে উৎখাত হইয়াছে, আমার পথে নির্যাতিত হইয়াছে এবং যুদ্ধ করিয়াছে ও নিহত হয়েছে আমি তাহাদের পাপ কার্যগুলি অবশ্যই দূরীভূত করিব এবং অবশ্যই তাহাদিগকে দাখিল করিব জান্নাতে, যাহার পাশে নদী প্রবাহিত ইহা আল্লাহর নিকট হইতে পুরস্কার; উত্তম পুরস্কার আল্লাহরই নিকট।" [৩৩]

মুমিন নর ও মুমিন নারী একে অপরের বন্ধু, ইহারা সৎকার্যের নির্দেশ দেয় এবং অসৎ কার্যের নিষেধ করে। সালাত কায়েম করে, যাকাত দেয় এবং আল্লাহ ও তার রাসূলের আনুগত্য করে, ইহাদিগকে আল্লাহ কৃপা করবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ পরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময়।[৩৪]

৩০। আল-কুরআন, ৪৯ঃ১৩।
৩১। আল-কুরআন, ৪ঃ১।
৩২। Hummudah Abdalati, op-cit, p-305.
৩৩। আল-কুরআন, ৩ঃ১৯৫।
৩৪। আল-কুরআন, ৯ঃ৭১।

Dhaka University Institutional Repository

অবশ্য আত্ম সমর্পনকারী পুরুষ ও আত্ম সমর্পনকারী নারী মু'মিন নারী, অনুগত পুরুষ ও অনুগত নারী, সত্যবাদী পুরুষ ও সত্যবাদী নারী, ধৈর্যশীল পুরুষ ও ধৈর্যশীল নারী, বিনীত পুরুষ ও বিনীত নারী, দানশীল পুরুষ ও দানশীল নারী, সওম পালনকারী পুরুষ ও সওম পালনকারী নারী, যৌন অংশ হিফাযতকারী পুরুষ ও সওম হিফাযতকারী নারী, আল্লাহকে অধিক স্মরণকারী পুরুষ ও আল্লাহকে অধিক স্মরণকারী নারী-ইহাদের জন্য আল্লাহ রাখিয়াছেন ক্ষমা ও মহাপ্রতিদান।

আল্লাহ ও তাঁহার রাসূল কোন বিষয়ে নির্দেশ দিলে কোন মুমিন পুরুষ কিংবা মুমিন নারীর সে বিষয়ে ভিন্ন সিদ্ধান্তের অধিকার থাকিবে না। কেহ আল্লাহ এবং তাহার রাসূলকে অমান্য করিলে সে-তো স্পষ্টই পথভ্রষ্ট হইবে।[৩৫]

শিক্ষার ক্ষেত্রে ঃ

নারী শিক্ষা ও জ্ঞানার্জনে পুরুষের সমকক্ষ। ইসলাম যখন জ্ঞানার্জনের ব্যাপারে মুসলমানদের প্রতি নির্দেশ দেয় তখন পুরুষ ও নারীর মধ্যে সে কোন পার্থক্য রচনা করেনি। প্রায় চৌদ্দশত বছর পূর্বে মহানবী ঘোষণা করেন যে, জ্ঞান অর্জন করা প্রতিটি মুসলিম নর ও নারীর প্রতি ফরজ। এ ঘোষণাটি অত্যন্ত পরিস্কার এবং মুসলমানরা গোটা ইতিহাসের ধারায় তা কার্যকর করে এসেছে।

সে পুরুষের মতই মত প্রকাশের স্বাধীনতা লাভের অধিকারী। তার নির্ভুল ও বলিষ্ঠ অভিমতের সর্বত্রই বিবেচনা করা হয়েছে এবং সে নারী জারীর অন্তর্ভূক্ত বলেই তাকে অশ্রোদ্ধা করা হয় নাই। পবিত্র কুরআন ও ইসলামের ইতিহাসে বিবৃত হয়েছে যে, নারী শুধু অবাধে তার মতামতই প্রকাশ করেনি বরং সে মহানবী ও অন্যান্য নেত্রীবৃন্দের সাথে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনায়ও অংশ গ্রহণ করেছে এবং যুক্তিতর্ক উপস্থাপন করেছে।

ঐতিহাসিক নথিপত্রে দেখা যায় যে, নারী সমাজ সোনালী যুগের মুসলমানদের সাথে, বিশষতঃ আপৎকালীন সময়ে জনস্বার্থে-সংশ্লিষ্ট কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ করেছে। তারা আহত সৈনিকদের শুশ্রূষা, রসদপত্র তৈরী, যোদ্ধাদের সেবা ইত্যাদি ব্যাপার মুসলিম সৈন্যদের সাথে যুদ্ধক্ষেত্রে যেত। তারা কখনো লৌহ যবনিকার আড়ালে বন্দী থাকতনা, অকেজো ও নিষ্কর্মা প্রাণীরূপে বিবেচিত হতনা এবং তাদের মধ্যে আত্মিক মর্যাদাকে অস্বীকার করা হতনা।

৩৫। আল-কুরআন, ৩৩ঃ৩৫-৩৬।

Dhaka University Institutional Repository

ইসলাম নির্বাধে চুক্তি সম্পাদন, ব্যবসায়ে আত্মনিয়োগ, অর্থোপার্জন ও সম্পদের স্বত্বলাভের ব্যাপারে নারীর সমান অধিকার মঞ্জুর করেছে। তার জীবন, তার সম্মান পুরুষের মতই সম্মানার্থ। সে যদি কোন অপরাধ করে, তাহলে তার শাস্তি একইরূপ অপরাধে পুরুষের প্রাপ্য শাস্তির চেয়ে কমও নয়, বেশীও নয়, তার যদি কোন অনিষ্ট বা ক্ষতি সাধণ করা হয় তাহলে সে তারই সমকক্ষ পুরুষের সমান ক্ষতিপূরণ পাবে।[৩৬] মহান আল্লাহ্ বলেন ঃ

"হে মুমিনগণ, নিহতদের ব্যাপার তোমাদের জন্য কিসাসের বিধান দেয়া হইয়াছে। স্বাধীন ব্যক্তির বলে স্বাধীন ব্যক্তি, কৃতদাসের বদলে কৃতদাস ও নারীর বদলে নারী,---------- তাহার জন্য মর্মন্তুক শাস্তি রহিয়াছে।" [৩৭]

আল্লাহ তোমাদের শত্রুদিগকে ভালভাবে জানেন। অভিভাবকত্বে আল্লাহই যথেষ্ঠ এবং সাহায্যে আল্লাহই যথেষ্ঠ।

কোন মুমিনকে হত্যা করা কোন মুমিনের কাজ নহে, তবে ভুলবশতঃ করিলে উহা স্বতন্ত্র এবং কেহ কোন মুমিনকে ---------- তাহাকে লানত করিবেন এবং তাহার জন্য মহাশাস্তি প্রস্তুত রাখিবেন।

উত্তরাধিকার ঃ

নারীকে মানব জাতির ধারাক্রম রক্ষায় সমানভাবে অপরিহার্য এক স্বাধীন ও স্বতন্ত্র মানবসত্তারূপে স্বীকৃতিদান ছাড়াও ইসলাম তাকে উত্তরাধিকারের এক চতুর্থাংশ দিয়েছে। ইসলামের পূর্বে তাকে শুধু ঐ অংশ থেকেই বঞ্চিত করা হয়নি, বরং তাতেই উত্তরাধিকাররূপে প্রাপ্য পুরুষের সম্পত্তিরূপে গণ্য করা হত। নারীর সহজাত মানবীয় গুণাবলীকে স্বীকৃতি দিয়ে ইসলাম তাকে ঐ হস্তান্তর যোগ্য সম্পত্তির পর্যায় থেকে এক স্থায়ী উত্তরাধিকারে পরিণত করেছে। সে স্ত্রী হোক কিংবা জননী, ভগ্নী হোক কিংবা কন্যা যেকোন অবস্থায় সে পরলোকগত নিকটাত্মীয়ের সম্পত্তির সন্তুষ্টি অংশ লাভ করে, যার পরিণাম নির্ভর করে পরলোকগত ব্যক্তির সঙ্গে তার সম্পর্কের ধরণ এবং উত্তরাধিকারীদের মোট সংখ্যার উপর। এই অংশ একান্তভাবেই তার কোন ব্যক্তি একে ছিনিয়ে নিতে কিংবা তাকে উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত করতে পারে না।

৩৬। Hummudah Abdalati, op-cit, p-305-306
৩৭। আল-কুরআন, ২ঃ১৭৮

Dhaka University Institutional Repository

এমনকি, পরলোকগত ব্যক্তি যদি অপর কোন আত্মীয়ের কাছে অথবা অন্য বিষয়ের অনুকূলে অসিয়ত করে তাকে বঞ্চিত করতে চায়, তাহলে আইন তাকে তা করতে অনুমতি দেবেনা। যেকোন মালিক বা স্বত্ত্বাধিকারী তার সম্পত্তির শুধুমাত্র এক তৃতীয়াংশের সীমার মধ্যে থেকে অসিয়ত করতে পারে, যেন সে তার উত্তরাধিকারী নর-নারীর অধিকার ক্ষুন্ন করতে না পারে। উত্তরাধিকারের ক্ষেত্রে সমতা ও তুল্যতা পুরোপুরি প্রযোজ্য। নীতিগতভাবে পরলোকগত আত্মীয়-স্বজনের সম্পত্তির উত্তরাধিকার লাভের ব্যাপারে পুরুষ ও নারী সমানভাবে যোগ্য, কিন্তু তাদের প্রাপ্য অংশ বিভিন্নরূপে হতে পারে। কোন কোন বিশেষ ক্ষেত্রে পুরুষ পায় দুই অংশ, কিন্তু নারী পায় মাত্র এক অংশ। তা নারীর উপর পুরুষকে অগ্রাধিকার দেয়ার কিংবা তার শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের কোন নিদর্শন নয়।[৩৮] উত্তরাধিকার লাভের অধিকারের ঘোষণা দিয়ে আল্লাহ বলেন ঃ

"পিতা-মাতা এবং আত্মীয়-স্বজনের পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে পুরুষের অংশ আছে এবং পিতা-মাতা ও আত্মীয়-স্বজনের পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে নারীর অংশ আছে, উহা অল্পই হউক অথবা বেশীই হউক, এক নির্ধারিত অংশ।" [৩৯]

আল্লাহ তোমাদের সন্তান সম্বন্ধে নির্দেশ দিয়েছেন ঃ এক পুত্রের অংশ দুই কন্যার সমান, কিন্তু কেবল কন্যা দুই এর অধিক থাকলে তাদের জন্য পরিত্যক্ত সম্পত্তির দুই-তৃতীয়াংশ, আর মাত্র এক কন্যা থাকলে তার জন্য অর্ধাংশ। তার সন্তান থাকলে তার পিতা-মাতা প্রত্যেকের জন্য পরিত্যক্ত সম্পত্তির এক-ষষ্ঠাংশ, সে নিঃসন্তান হলে এবং পিতা-মাতাই উত্তরাধিকারী হলে মাতার জন্য এক তৃতীয়াংশ তার ভাই-বোন থাকলে মাতার জন্য এক-ষষ্ঠাংশ, এ সবই সে যাহা অসিয়াত করে তা দেওয়ার এবং তা পরিশোধের পর। তোমাদের পিতা ও সন্তানের মধ্যে উপকারে কে তোমাদের নিকটতর তা তোমরা অবগত নহে। নিশ্চয়ই ইহা আল্লাহর বিধান আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।

৩৮। আল-কুরআন, ৪ঃ৪৫, ৯২-৯৩।

৩৯। Hummudah Abdalati, op-cit, p-307.

Dhaka University Institutional Repository

তোমাদের স্ত্রীদের পরিত্যাক্ত সম্পত্তির অর্ধাংশ তোমাদের জন্য, যদি তাহাদের কোন সন্তান না থাকে এবং তাহাদের সন্তান থাকিলে তোমাদের জন্য তাহাদের পরিত্যাক্ত সম্পত্তির ১/৪ অংশ অসিয়াত পালন এবং ঋণ পরিশোধের পর। তোমাদের সন্তান না থাকিলে তাহাদের জন্য তোমাদের পরিত্যাক্ত সম্পত্তির ১/৪ অংশ, আর তোমাদের সন্তান থাকিলে তাহাদের জন্য তোমাদের পরিত্যাক্ত সম্পত্তির ১/৮অংশ; তোমরা যাহা অসিয়াত করিবে তাহা দেওয়ার পর এবং ঋণ পরিশোধের পর। যদি পিতা-মাতা ও সন্তানহীন কোন পুরুষ অথবা নারীর উত্তরাধিকারী থাকে তাহার এক বৈপিত্রেয় ভাই অথবা ভগ্নি, তবে প্রত্যেকের জন্য ১/৬ অংশ। তাহারা ইহার অধিক হইলে সকলে সম অংশীদার হইবে ১/৩ অংশে; ইহা যাহা অসিয়াত করা হয় তাহা দেওয়ার এবং ঋণ পরিশোধের পর যদি কাহারো জন্য ক্ষতিকর না হয়। ইহা আল্লাহর নির্দেশ, আল্লাহ সর্বজ্ঞ, সহনশীল।

এইসব আল্লাহর নির্ধারিত সীমা। কেহ আল্লাহ্ ও তাহার রাসূলের আনুগত্য করিলে আল্লাহ তাহাকে দাখিল করিবেন জান্নাতে, যাহার পাদদেশে স্ত্রী প্রবাহিত; সেখানে তাহারা স্থায়ী হইবে এবং ইহা মহা-সাফল্য।

আর কেহ আল্লাহ ও তাহার রাসূলের অবাধ্য হইলে এবং তাহার নির্ধারিত সীমা লঙ্ঘন করিলে তিনি তাহাকে দোযখে নিক্ষেপ করিবেন; সেখানে সে স্থায়ী হইবে এবং তাহার জন্য লাঞ্ছনা দায়ক স্থায়ী রহিয়াছে।[৪০]

অর্থনৈতিক সমতা ঃ

ইসলামী শরীয়তের সীমার মধ্যে থেকে অর্থনৈতিক ব্যাপারে শ্রম-সাধনা করার অনুমতি রয়েছে। নারী-পুরুষ উভয়ের জন্যই। প্রত্যেকেই আপন শ্রমের মজুরী লাভ করার অধিকারী। কারো মালিকানা কেউ হস্তগত করতে পারেনা। সে মালিক নারী হোক বা পুরুষ হোক। স্বামীও পারে না নিজ স্ত্রীর মালিকানাধীন ধন-সম্পত্তি হস্তগত করতে, স্ত্রীও পারেনা স্বামীর বিত্ত-সম্পত্তি নিজ ইচ্ছামত ব্যয় ব্যবহার করতে বা উড়াইতে।[৪১]

৪১। আল-কুরআন, ৪ঃ৭, ১১-১৪।
৪২। মাওঃ আব্দুর রহীম, প্রাগুক্ত, পৃ-৩৩।

Dhaka University Institutional Repository

আল্লাহ তায়ালা এ প্রসংগে বলেন ঃ যাহার দ্বারা আল্লাহ্ তোমাদের কাহাকেও কাহারও উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করিয়াছেন তোমরা তাহার লালসা করিও না। পুরুষ যাহা অর্জন করে তাহা তাহার প্রাপ্য অংশ এবং নারী যাহা অর্জন করে তাহা তাহার প্রাপ্য অংশ। আল্লাহর নিকট তাঁহার অনুগ্রহ প্রার্থনা কর, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে সর্বজ্ঞ।[৪২]

উত্তরাধিকার সম্পত্তি লাভের অধিকার ঃ

পুরুষরা যেমন উত্তরাধিকার লাভ করতে পারে, তেমনি নারীর জন্যেও উত্তরাধিকারের অংশ নির্দিষ্ট রয়েছে। উত্তরাধিকার লাভের অধিকারের ঘোষণা দিয়ে আল্লাহ বলেন ঃ

"পিতা-মাতা এবং আত্মীয়-স্বজনের পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে পুরুষের অংশ আছে এবং পিতা-মাতা ও আত্মীয়-স্বজনের পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে নারীরও অংশ আছে, উহা অল্পই হউক অথবা বেশীই হউক, এক নির্ধারিত অংশ।

আল্লাহ তোমাদের সন্তান সম্বন্ধে নির্দেশ দিয়েছেন ঃ এক পুত্রের অংশ দুই কন্যার সমান, কিন্তু কেবল কন্যা দুই এর অধিক থাকিলে তাহাদের জন্য পরিত্যক্ত সম্পত্তির দুই-তৃতীয়াংশ, আর মাত্র এক কন্যা থাকিলে তাহার জন্য অর্ধাংশ। তাহার সন্তান থাকিলে তাহার পিতা-মাতা প্রত্যেকের জন্য পরিত্যক্ত সম্পত্তির এক-ষষ্ঠাংশ, সে নিঃসন্তান হইলে এবং পিতা-মাতাই উত্তরাধিকারী হইলে মাতার জন্য এক তৃতীয়াংশ তাহার ভাই-বোন থাকিলে মাতার জন্য এক-ষষ্ঠাংশ, এ সবই সে যাহা অসিয়াত করে তাহা দেওয়ার এবং তা পরিশোধের পর। তোমাদের পিতা ও সন্তানের মধ্যে উপকারে কে তোমাদের নিকটতর তাহা তোমরা অবগত নহে। নিশ্চয়ই ইহা আল্লাহর বিধান আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।"[৪৩]

৪২। আল-কুরআন, ৪ঃ৩২।
৪৩। আল-কুরআন, ৪ঃ৭ ও ১১।

Dhaka University Institutional Repository

সাক্ষ্য ঃ

কোন কোন দেওয়ানী চুক্তিপত্রে সাক্ষ্য প্রদানের ক্ষেত্রে দুজন পুরুষ কিংবা একজন পুরুষ ও দু'জন নারীর প্রয়োজন হয়। তা পুরুষের তুলনায় নারীর নিম্নতর মর্যাদার কোন নিদর্শন নয়। বরং এ হলো চুক্তিসম্পাদনকারী পক্ষগুলোর অধিকার সংক্ষরণের একটি ব্যবস্থা, কেননা নারী সাধারণতঃ বাস্তব জীবনে পুরুষের ন্যায় ততটা অভিজ্ঞ নয়। অভিজ্ঞতার এই দৈন্য সম্পাদিত চুক্তির যেকোন পক্ষের জন্যে ক্ষতির ধারণ হতে পারে। তাই আইন দায়ী করে যে, একজন পুরুষের সাথে অন্ততঃ দুজন নারীর সাক্ষ্য প্রদান করা উচিত। এতে করে সাক্ষ্যদানকারী একজন নারী যদি কিছু ভুলে যায়, তাহলে তা অপরজন তাকে স্মরণ করিয়ে দেবে। অথবা অভিজ্ঞতার দৈন্যের কারণে সে যদি কোন ভুল করে বসে, তাহলে অপরজন তা শুধরে নিতে সাহায্য করবে। এ হলো লোকদের মধ্যে ন্যায়ানুগ লেনদেন ও যথোচিত কাজ-কারবারকে নিশ্চিত করার একটি সতর্কতামূলক ব্যবস্থা। প্রকৃতপক্ষে তার নারীকে জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিয়য়াদিতে অংশ গ্রহণের একটি সুযোগ দিচ্ছে এবং ন্যায়-বিচার প্রতিষ্ঠার সাহায্য করছে। যাই হোক, জনস্বার্থ-সংশ্লিষ্ট বিষয়াদিতে অভিজ্ঞতার দৈন্য তারা বুঝায় না যে, নারী তার সামাজিক মর্যাদয় পুরুষ অপেক্ষা নিম্নতর। প্রতিটি মানুষেরই কোন না কোন বিষয়ে দৈন্য রয়েছে; কিন্তু তা সত্ত্বেও তাদের মানবীয় মর্যাদা সম্পর্কে কেউ প্রশ্ন তুলছে না।[৪৪] কুরআনে আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

"হে মুমিনগণ তোমরা যখন একে অন্যের সহিত নির্ধারিত সময়ের জন্য ঋণের কারবার কর তখন উহা লিখিয়া রাখিও; তোমাদের মধ্যে কোন লেখক যেন ন্যায্যভাবে লিখিয়া দিয়ে; লেখক লিখিতে অস্বীকার করিবে না। যেমন আল্লাহ তাহাকে শিক্ষা দিয়াছেন, সুতরাং সে যেন লেখে; এবং ঋণ গ্রহীতা যেন লেখার বিষয়বস্তু বলিয়া দিয়ে এবং তাহার প্রতিপালক আল্লাহকে ভয় করে, আর উহার কিছু যেন না কমায়; কিন্তু ঋণ গ্রহীতা ---------- আল্লাহ সর্ববিষয়ে সবিশেষ অবহিত।"

নারী এমন কতিপয় সুযোগ-সুবিধা ভোগ করে, যা থেকে পুরুষ বঞ্চিত। সে কতিপয় ধর্মীয় কর্তব্য-যেমন মাসিক হারে ও আতুড় ঘরে থাকাকালে নামাজ ও রোজা পালন করে মুক্ত। সে শুক্রবারের ফরজ জামায়াতে অংশ গ্রহণের দায়কে মুক্ত। মা হিসেবে সে আল্লাহর দৃষ্টিতে অধিকতর সম্মানের পাত্রী।[৪৫] আল কুরআনে আল্লাহ বলেন ঃ

৪৪। Hummudah Abdalati, op-cit, p-309-310j

৪৫। আল-কুরআন, ২ঃ২৮২

Dhaka University Institutional Repository

"আমি তো মানুষকে তার পিতা-মাতার প্রতি সদাচরণের নির্দেশ দিয়াছি। জননী সন্তানকে কষ্টের পর কষ্ট বরণ করিয়া গর্ভে ধারণ করে এবং তাহার দুধ ছাড়ানো হয় দুই বৎসরে। সুতরাং আমার প্রতি ও তোমার পিতা-মাতার প্রতি কৃতজ্ঞ হও। প্রত্যাবর্তন তো আমারই নিকট।[৪৬]

তোমার পিতা-মাতা যদি তোমাকে পিড়াপিড়ি করে আমার সমকক্ষদাঁড় করাইতে যে বিষয়ে তোমার কোন জ্ঞান নাই, তুমি তাহাদের কথা মানিও না, তবে পৃথিবীতে তাহাদের সহিত বসবাস করিবে সদভাবে এবং যে বিশুদ্ধ চিত্তে আমার অভিমুখী হইয়াছে তাহার পথ অবলম্বন কর অতঃপর তোমাদের প্রত্যাবর্তন আমারই নিকট এবং তোমরা যা করিতে সে বিষয়ে আমি তোমাদিগকে অবহিত করিব।[৪৭]

আমি মানুষকে তাহার পিতা-মাতার প্রতি সদয় ব্যবহারের নির্দেশ দিয়াছি। তাহার জননী তাহাকে গর্ভে ধারণ করে কষ্টের সহিত এবং প্রসব করে কষ্টের সহিত, তাহাকে গর্ভে ধারণ করিতে ও তাহার স্তন্য ছাড়াইতে লাগে ত্রিশ মাস, ক্রমে সে যখন পূর্ণ ---------- আমি অবশ্যই আত্মসমর্পণকারীদের অন্তর্ভূক্ত।[৪৮]

মহানবী এই সম্মানের স্বীকৃতি দিয়ে বলেছেন মায়ের পায়ের নীচে সন্তানের বেহেশ্‌ত। পুত্রের ভালবাসা ও সহৃদয়তার তিন-চতুথাংশ মায়ের প্রাপ্য, বাকী এক-চতুর্থাংশ পিতার। স্ত্রী হিসেবে সে তার ভাবী স্বামীর কাছে উপযুক্ত যৌতুক (মাহরানা) দাবীর অধিকারী, যা হবে একান্তভাবেই তার নিজের। স্বামীর কাছ থেকে সে পূর্ণাঙ্গ ভবণ পোষণ ও সর্বিক তত্ত্বাবধান লাভের অধিকারী। সে কোন অর্থকরী কাজ করতে অথবা পারিবারিক ব্যয় নির্বাহে স্বামীর সাথে অংশ গ্রহণ করতে বাধ্য নয়। বিবাহের পূর্বে সে যা কিছুই অর্জন করেছে, পরের সে তা নিজের দখলে রাখতে পারবে এবং তার কোন জিনিসেই স্বামীর ভাগ বসানোর অধিকার নেই। কন্যা ও ভগ্নী হিসেবে সে পিতা ও ভ্রাতার কাছ থেকে নিরাপত্তা ও ভরণ-পোষণ পাওয়ার অধিকারী। এই হলো তার সুযোগ-সুবিধা। এখন সে যদি কাজ করতে বা আত্মনির্ভরশীল হতে কিংবা পারিবারিক দায়-দায়িত্ব পালনে অংশ নিতে চায়, তবে সে তা নির্বাধে করতে পারে। তবে সে জন্যে শর্ত এই যে তার সম্মান ও শুচিতা যেন নিরাপদ থাকে।

৪৬। Hummudah Abdalati, op-cit, p-310
৪৭। আল-কুরআন, ৩১ঃ১৪-১৫।
৪৮। আল-কুরআন, ৪৬ঃ১৫।

Dhaka University Institutional Repository

নামাজের জামায়াতে পুরুষের পিছনে নারীর দাঁড়ানো কোন ক্রমেই এর ইংগিত বহন করে না যে, পুরুষের চেয়ে সে নিম্নতর, নারীর জুমায়ার নামাজে অংশ গ্রহণের দায় থেকে মুক্ত, যা পুরুষের প্রতি বাধ্যতামূলক। কিন্তু সে যদি অংশ গ্রহণ করেই তবে সে দাঁড়াবে মেয়েদের নিয়ে তৈরী পৃথক সাড়িতে, অপ্রাপ্ত বয়স্ক ছেলে-মেয়েরা যেমন দাঁড়ায় প্রাপ্ত বয়ক লোকদের পিছনে তৈরী স্বতন্ত্র সাড়িতে। এ হলো নামাজের একটি শৃংখলা বিধি, গুরুত্ব বা মর্যাদার কোন শ্রেণী বিন্যাস নয়।

মুসলিম নারী চিরকালই পর্দা নামক একটি প্রাচীন রীতি-প্রথা ও ঐতিহ্যের সাথে সম্পৃক্ত। ইসলামের বক্তব্য হলো নারীর রূপচর্চা করা উচিত সম্মান, মর্যাদা, সতিত্ব, পবিত্রতা ও শুচিতার পর্দা সহকারে। এ কারণে বৈধ স্বামী ছাড়া অন্য লোকদের মাঝে লালসা উস্কে দিতে পারে অথবা তার নৈতিক শুচিতা সম্পর্কে খারাপ সন্দেহ জাগাতে পারে, এমন সকল ক্রিয়াকর্ম ও অঙ্গভঙ্গি থেকে তার বিরত থাকা উচিত। তাকে বেগানা বা অনাত্মীয় লোকদের সামনে তার সৌন্দর্য্য প্রদর্শন বা দৈহিক আকর্ষণ অনাবৃত না করার জন্যে সতর্ক করে দেয়া হয়েছে। পর্দা-যা তার অবশ্য পরিধেয়- এমন একটি জিনিস, যা তার আত্মাকে দুর্বলতা থেকে, তার চক্ষুকে কামান্ধ দৃষ্টি থেকে এবং তার ব্যক্তিত্বকে চরিত্রহীনতা থেকে রক্ষা করতে পারে। ইসলাম নারীর নৈতিকতা ও মনোবল রক্ষা এবং তার ব্যক্তিত্ব ও চরিত্র সংরক্ষণের ব্যবস্থা তার শুচিতা ও পবিত্রতার ব্যাপারে অত্যন্ত উদ্বিগ্ন।[৪৯]

মুমিনদিগকে বল, তাহারা যেন তাহাদের দৃষ্টিকে সংযত করে এবং তাহাদের লজ্জাস্থানের হিফাযত করে; ইহাই তাহাদের জন্য উত্তম। উহারা যাহা করে নিশ্চয় আল্লাহ্ সে বিষয়ে সম্যক অবহিত।

আর মুমিন নারীদিগকে বল, তাহারা যেন তাহাদের দৃষ্টিকে সংযত করে ও তাহাদের লজ্জাস্থানের হিফাযত করে; তাহারা যেন যাহা সাধারণতঃ প্রকাশ থাকে তাহা ব্যতীত তাহাদের আবরণ প্রদর্শণ না করে, তাহাদের গৃবা ও বক্ষদেশ যেন মাথার কাপড় দ্বারা আবৃত করে, তাহারা যেন তাহাদের স্বামী, পিতা,শ্বশুর, পুত্র, ভ্রাতা, ভ্রাতুস্পুত্র, ভগ্নিপুত্র, আপন নারীগণ, তাহাদের মালিকাধীন দাষী, পুরুষের মধ্যে যৌন কামনা-রহিত পুরুষ এবং নারীদের গোপন অংগ সম্বন্ধে অঙ্গ বালক ব্যতীত কাহারো নিকট তাহাদের আবরণ প্রকাশ না করে, তাহারা যেন তাহাদের গোপন আবরণ প্রকাশের উদ্দেশ্যে সজোরে পদক্ষেপ না করে। হে মুমিনগণ তোমরা সকলে আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তন কর, যাহাতে তোমরা সফল কাম হইতে পার।[৫০]

৪৯। Hummudah Abdalati, op-cit, p-310-313

৫০। আল-কুরআন, ২৪ঃ৩০-৩১।

Dhaka University Institutional Repository

ইসলামে নারীর পদমর্যাদা নজীরহীনভাবে সুউচ্চ এবং তার প্রকৃতির জন্যে বাস্তবভাবে সুউপযোগী তার অধিকার ও দায়-দায়িত্ব পুরুষের অধিকার ও দায়-দায়িত্বের সমতুল্য, তবে তা অপিহার্যরূপে বা নিরকুসভাবে অভিন্নরূপ নয়। সে যদি কোন কোন দিক থেকে একটা জিনিসে বঞ্চিত হয়ে থাকে। তাহলে অন্যান্য বহুদিক দিয়ে অনেক জিনিস দিয়ে তার পুরোপুরি ক্ষতিপূরণ করা হয়েছে। সে যে স্ত্রী জাতির অন্তর্ভূক্ত, এ সত্য তার মানবীয় পদমর্যাদা বা স্বাধীন ব্যক্তিত্বকে কিছুমাত্র ক্ষুন্ন করেনি এবং তার তার প্রতি বিদ্বেষ পোষণ কিংবা তার প্রতি অবিচার করার কোন যুক্তি বা ভিত্তি হতে পারে না। ইসলাম ততটাই তাকে দিয়েছে, যতটা তার প্রয়োজন। তার অধিকন্তু তার কর্তব্যের মধ্যে পূর্ণ ভারসাম্য রক্ষা করা হয়েছে এবং কোন পক্ষকে অপর পক্ষকে দারী করা হয়নি।[৫১] নারীর সমগ্র পদমর্যাদা পরিস্কারভাবে বিবৃত হয়েছে কুরআনের একটি আয়াতে ঃ

"তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রী তিন রজঃস্রাব কাল প্রতীক্ষায় থাকিবে। তাহারা আল্লাহ্ এবং আখিরাতে বিশ্বাসী হইলে তাহাদের গর্ভাশয়ে আল্লাহ্ যাহা সৃষ্টি করিয়াছেন তাহা গোপন রাখা তাহাদের পক্ষে বৈধ নহে। যদি তাহারা আপোস-নিষ্পত্তি করিতে চায় তবে উহাতে তাহাদের পুনঃ গ্রহণে তাহাদের স্বামীগণ অধিক হকদার। নারীদের তেমনি ন্যায়সংগত অধিকার আছে যেমন আছে তাহাদের উপর পুরুষদের কিন্তু নারীদের উপর পুরুষদের মর্যাদা আছে। আল্লাহ্ মহাপরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।" [৫২]

এই হলো সেই বাড়তি কর্তব্য-কর্ম, যা কতিপয় অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে পুরুষকে নারীর উপর একধাপ বেশী মর্যাদা দিয়েছে। তারা মনুষ্যত্ব এবং চারিত্রিক ক্ষেত্রে কোন উচ্চতর পদমর্যাদা নয়। অথবা তারা একের উপর অন্যেও স্বেচ্চাচার চালান কিংবা একের দ্বারা অন্যকে দমন করার কোন লাইসেন্সও নয়। তারা হলো প্রকৃতি ও প্রয়োজন অনুপাতে আল্লাহর দেয়া সম্পদের বন্টন-ব্যবস্থা, যে সম্পদ সৃষ্টি করেছেন আল্লাহ্ স্বয়ং। তিনিই উত্তমরূপে জানেন কোনটা পুরুষের জন্যে আর কোনটা নারীর জন্যে কল্যাণকর।[৫৩] আল্লাহ যথার্থ বলেছেন ঃ

"হে মানব, তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে ভয় কর যিনি তোমাদিগকে এক ব্যক্তি হইতেই সৃষ্টি করিয়াছেন ও যিনি তাহা হইতে তাহার স্ত্রী করেন, যিনি তাহাদের দুইজন হইতে বহু নর-নারী ছড়াইয়া দেন; এবং আল্লাহ্কে ভয় কর যাঁহার নামে তোমরা একে অপরের নিকট যাঞ্চা কর এবং সতর্ক থাক জ্ঞাতি বন্ধন সম্পর্কে। নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখেন।"[৫৪]

৫১। Hummudah Abdalati, op-cit, p-313
৫২। আল-কুরআন, ২ঃ৫২
৫৩। Hummudah Abdalati, op-cit, p-
৫৪। আল-কুরআন, ৪ঃ১।

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় অধ্যায়

ইসলামে নারীমুক্তি অন্দোলনের ইতিহাস ও প্রকৃতি

Dhaka University Institutional Repository

ইসলামে নারীমুক্তি অন্দোলনের ইতিহাস ও প্রকৃতি

রাসুল (সঃ)-এর যুগে উল্লেখযোগ্য মহিলা সাহাবী ও তাঁদের অবদান

উম্মুল মু'মীনিন হযরত খাদীজা বিনতে খুয়াইলিদ রাযী আল্লাহু আনহা ঃ

যখন হযরত খাদীজা রাযী আল্লাহু আনহা এর সাথে বিবাহ হয় তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বয়স ছিল ২৫ বছর। আর হযরত খাদীজার বয়স ছিল ৪০ বছর। এটাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সর্বপ্রথম বিবাহ। খাদীজা রাযী আল্লাহু আনহা জীবিত থাকাকালে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অন্য কোন বিবাহ করেননি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বয়স যখন পঞ্চাশ বছর তখন হযরত খাদীজা ৬৫ বছর বয়সে পরলোকগমন করেন।[১] ইতোপূর্বে হযরত খাদীজার আরো দুই বিবাহ হয়েছিল।[২] হযরত খাদীজার গর্ভে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দুই পুত্র ও চার কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। পুত্রদ্বয় শৈশবেই পরলোক গমন করেন। কন্যাদের নাম হযরত ফাতিমা যাহ্‌রা, হযরত যয়নব, হযরত রুকাইয়্যা ও হযরত উম্মে কুলসুম।[৩]

হযরত খাদীজাই ছিলেন পৃথিবীর সর্বপ্রথম মুসলমান। কাফিরদের যুলুম অত্যাচারের অবাধ বন্যা যখন বয়ে চলেছিল তখন তিনিই ছিলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহায় ও পরামর্শ দাতা। শত্রুতার চৌমুখী ঝঞ্ঝা বায়ু যখন তাঁকে অতিষ্ঠ করে তুলত তখন হযরত খাদীজাই তাঁকে সান্তনা দিতেন। হযরত খাদীজা স্বীয় গুণ-গরিমা ও ভালবাসা দ্বারা রসূলের অন্তর রাজ্য দখন করে রেখেছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পরেও এই ভালবাসায় ভাটা দেখা দেয়নি।[৪]

১। ইবন কায়িস আল জাওযিয়্যা যাদুল মা'আদ (মিশরঃ মাতবা আ মসুতাফাল বাবিল হলবী, ১৯০৫ হিঃ) ১ম খন্ড, পৃ-২৬।

২। ড.এইচ.এস. মুজতবা হোছাইন; হযরত মুহাম্মাদ মুস্তাফা (সাঃ) সমকালীন পরিবেশ ও জীবন, ঢাকাঃ ১৯৯৮ খ্রিঃ (১৪১৯ হিঃ ঢাকা ইসলামিক রিসার্স ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ, প্রথম প্রকাশ, পৃ-৯৬২।

৩। শিবলী নু'মানী, সীরাতুন্নবী (আযমগড়ঃ মাতবা মা'আরিফ, ১৩৬৯হিঃ) ২য় খন্ড, পৃ-১৮৪-১৮৫।

৪। ইবন আব্দুল রব, আল্ ইস্‌তীআব, বৈরুতঃ দারুল জেল, ১৯৫৩খিঃ, ২য় খন্ড, পৃ-৭৪০-৭৪১।

Dhaka University Institutional Repository

হযরত খাদীজার (রাঃ) মর্যাদা ঃ

"আলী রাযী আল্লাহু আনহু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ মারয়াম ছিলেন (পূর্ববর্তী) নারী সমাজের মধ্যে শ্রেষ্ঠ আর খাদীজা (বর্তমান উম্মতের মধ্যে) নারী সমাজের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।"[৫]

"আবু হুরায়রা রাযী আল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ একদা জিবরাইল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর নিকট এসে বললেন, হে আল্লাহর রসূল। এই যে খাদীজা একটা পাত্র নিয়ে আসছেন তাতে তরকারী কিংবা (বলেন) খাবার অথবা কোন পানীয় দ্রব্য রয়েছে, (বলেন) যখন তিনি আপনার নিকট আসবেন তখন আপনি তাঁকে তাঁর রবের পক্ষ থেকে এবং আমার পক্ষ থেকে সালাম বলুন এবং তাঁকে জান্নাতের মধ্যে মণিমুক্তা খচিত এমন একটা প্রাসাদের সুসংবাদ দিন-যেখানে না কোন শোরগোল হবে এবং না কোন হবে এবং না কোন কষ্ট ক্লান্তি থাকবে।"[৬]

উপরোক্ত হাদীস থেকে তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব ও অবদান সুস্পষ্টভাবে উপলব্দি করা যায়। খাদীজা রাযী আল্লাহু আনহা মহানবী মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর শুধু সহধর্মিনী নন, তিনি তাঁর দ্বীন প্রতিষ্ঠার বিপ্লবী আন্দোলনের প্রথম কর্মীও। খাদীজা রাযী আল্লাহু আনহা ওফাতের পর নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে যতটুকু স্ত্রী হিসেবে স্মরণ করতেন তার চেয়েও বেশি স্মরণ করতেন প্রথম মুসলমান ও শ্রেষ্ঠ সহযোগী হিসেবে।[৭]

৫। ইমাম মুহাম্মদ ইবন ইসমাঈল বুখারী, সহীহ আল-বুখারী, ঢাকা, আধুনিক, ৩য় খন্ড, পৃ-৫৮৮।

৬। সহীহ আল বুখারী, ৩য় খন্ড, প্রাগুক্ত, ৫৯০।

৭। মুহাম্মাদ নূরুযযামান, সংগ্রামী নারী, ঢাকাঃ আধুনিক প্রকাশনী, ২য় প্রকাশ, জানুয়ারী, ১৯৯৭ খ্রিঃ, সাবান ১৪১৭, পৃ-২৪-২৫।

Dhaka University Institutional Repository

উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা রাযী আল্লাহু আনহা ঃ

উম্মুল মু'মিনীন আয়েশা সিদ্দিকা বিনতে আবু বকর সিদ্দিক রাযী আল্লাহু আনহা। তাঁর মায়ের নাম উম্মে রোমান বিনতে আমের ইবনে ওয়াইসির। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নবুওয়াত প্রাপ্তির চতুর্থ সনে তাঁর জন্ম হয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নারী পরুষ নির্বিশেষে সকলের জন্যই নবী ছিলেন। সকলের নিকটেই আল্লাহর বাণী পৌঁছে দেয়া তাঁর কর্তব্য ছিল। হায়য্, নিফাস, প্রসব ও স্বামী সহবাস সম্পর্কীয় শরী'আতের বহু মাস্'আতের বহু মাস্'আলা এরূপ আছে যা একমাত্র নিজের স্ত্রী ব্যতীত অন্য কারো নিকট খুলে বলা যায় না। মোটকথা নারী বিষয়ক মাসআলাসমূহ প্রচারের জন্য হযরত আয়িশার ন্যায় ধীশক্তিমান, বিচক্ষণ ও বুদ্ধিমতী নারীরই প্রয়োজন ছিল।[৮]

সুতরাং আল্লাহর তরফ হতে এই ব্যবস্থারই নির্দেশ আসল। দু'বার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বপ্নযোগে দেখতে পেলেন।

"আয়েশা রাযী আল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বলেনঃ বিয়ের পূর্বে স্বপ্নের মাঝে দু'বার তোমাকে আমায় দেখান হয়েছে। আমি স্বপ্নে দেখ যে, তুমি এক খন্ড রেশমী বস্ত্রে আচ্ছাদিতা। আমাকে বলা হল ঃ ইনি আপনার স্ত্রী। তারপর আমি তার মুখাবরণ উন্মোচন করে দেখি যে, সে তুমিই। তখন আমি মনে মনে বললাম ঃ এ স্বপ্ন যদি আল্লাহর পক্ষ থেকে হয় তবে তা তিনি কার্যকর করবেনই।"[৯]

যখন নবুওয়াতের দশম বর্ষ তখন হযরত আয়িশার বয়স মাত্র ছয় বছর। এই বছরেই হযরত খাদীজা রাযী আল্লাহু আনহা ইন্তিকাল করেন। হযরত খাদীজার মৃত্যুর পর হযরত খাওলা বিনতে হাকীম। রসূলের সম্মতিক্রমে হযরত আয়েশার মাতা উম্মে রোমানের নিকট তাঁর বিয়ের প্রস্তাব করলেন। তিনি স্বামীকে এই সংবাদ পৌঁছালেন। একথা শুনে হযরত আবু বকর হযরত খাওলার মধ্যস্থতায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাথে হযরত আয়েশা রাযী আল্লাহু আনহাকে বিয়ে দিয়ে দিলেন।[১০]

৮। ড. মুজতাবা হোছাইন, প্রাগুক্ত, পৃ-৯৬৫।
৯। সহীহ আল বুখারী, ৩য় খন্ড, প্রাগুক্ত, পৃ-৬৩১।
১০। শিবলী নু'মানী, ২য় খন্ড, প্রাগুক্ত, পৃ-৪০৬।

Dhaka University Institutional Repository

হযরত আয়েশা বলেন- শুধু আমার ঘরে আমার লেহাফের নিচে থাকাকালে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর প্রতি ওহী নাযিল হয়েছে, অন্য কোন পত্নীর ঘরে এরূপ হয়নি। একপাত্র হতে পানি নিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার সাথে গোসল করেছেন, অন্য কোন পত্নীর সাথে এরূপ করেননি। আমার ঘরে আমার বুকের উপর মাথা রেখে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইনতিকাল করেছেন।[১১]

কুর'আন, হাদীস, আফসীর, ফিকহ, ফতওয়া মোটকথা ইসলামী শিক্ষার সকল বিভাগেই তাঁর অগাধ জ্ঞান ছিল। হযরত আয়েশা রাযী আল্লাহু আনহা কর্তৃক সংশোধিত বিষয়সমূহ সংগ্রহ করে আল্লামা সুয়ুতী একটি পুস্তক প্রণয়ন করেছেন।[১২] শরী'আত সংক্রান্ত কোন সূক্ষ্মও জটিল সমস্যার সমাধান সম্ভব না হলে তদানিন্তন বড় বড় আলিমগণ মীমাংসার জন্য হযরত আয়েশার খিদমতে উপস্থিত হতেন। হযরত আবু মূসা রাযী আল্লাহু আনহু বলেন- কোন জটিল সমস্যা নিয়ে আলিমগণ হযরত আয়েশার নিকট উপস্থিত হলে এর সমাধানের যথোপযুক্ত জ্ঞান তাঁর নিকট পেতেন।[১৩]

হাদীস গ্রন্থ সমূহে হযরত আয়েশা রাযী আল্লাহু আনহা কর্তৃক ২২১০টি হাদীস বর্ণিত হয়েছে। কোন কোন আলিমের মতে শরঈ বিধানাবলীর এক চতুর্থাংশ হযরত আয়েশা কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে। যারা শরঈ বিধানাবলী বর্ণনা করেছেন তাদের সংখ্যা সহস্র সহস্র। যদি একা হযরত আয়েশা রাযী আল্লাহু আনহা কর্তৃক এক চতুর্থাংশ বর্ণিত হয়ে থাকে তবে তাঁর জ্ঞানের গভীরতা ও প্রাচুর্য উপলব্ধি করা যায়।[১৪]

সাহিত্য, কাব্য, ইতিহাস এবং বংশ তালিকার সূত্র পরম্পরা সম্পর্কেও তাঁর অগাধ জ্ঞান ছিল। অন্ধযুগের কবিদের সুদীর্ঘ কবিতাসমূহ তিনি কণ্ঠস্থ করে রেখেছিলেন। মোটকথা বিশ্বজগতে নারীদের মধ্যে তিনিই ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ বিদূষী। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ইনতিকালের পর তিনি ৪৮ বছর জীবিত থাকেন। এই সময় তিনি দ্বীন প্রচার এবং বিদ্যা চর্চায় অতিবাহিত করেছেন।[১৫]

১১। ইবন সায়্যিদুন্নাস, উয়ূনুল আসর (বৈরুত ঃ দারুন জেল, ১৯৭৪), ২য় খন্ড, পৃ-৩০২; জালালুদ্দিন সুয়ূতী, আল কানযুল মদফুন (মিশন ঃ মসুতাফাল বাবিল হালবী, ১৯৩৯ খ্রিঃ) ৫ম খন্ড, পৃ-৭।

১২। শিবলী নু'মানী, ২য় খন্ড, প্রাগুক্ত, পৃ-৪০৭।

১৩। মাওলানা আব্দুর রউফ দানাপুরী, আসাহহুস্ সিয়ার (ঢাকা ঃ কুতুবখানা রশীদিয়া, ১৯৯০ খ্রিঃ) পৃ-৫৭১।

১৪। শিবলী নু'মানী, প্রাগুক্ত, পৃ-৪০৭।

১৫। শিবলী নু'মানী, প্রাগুক্ত, পৃ-৪০৭-৪০৮।

Dhaka University Institutional Repository

আবু মুসা আশআরী রাযী আল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ পুরুষদের মধ্যে অনেকেই কামালিয়াত অর্জন করেছেন। কিন্তু স্ত্রীলোকদের মধ্যে কামালিয়াত অর্জন করেছেন কেবল ফিরআউনের স্ত্রী আসীয়া ও ইমরানের কন্যা মারয়াম। আর যাবতীয় খাদ্যের ওপর সরীদ-এর মর্যাদা যেমন, সমস্ত স্ত্রীলোকের ওপর আয়েশার মর্যাদাও তেমন।[১৬]

আয়েশা রাযী আল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, তিনি তার বোন আসমার নিকট থেকে একটা হার ধার নেন। তারপর সেটি (যুদ্ধ শেষে ফেরার পথে) পড়ে যায়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সাহাবীদের কয়েকজনকে ঐ হারের তালাশে পাঠান। পথিমধ্যে নামাযের সময় হলে সাহাবীরা (পানি না পেয়ে) বিনা অযুতেই নামাজ পড়েন। তারপর তারা যখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট ফিরে আসেন তখন ব্যাপারটা তাঁর নিকট পেশ করেন। ঐ সময় তায়াম্মুমের আয়াত নাযিল হয়। উসাইদ ইবনে হুযাইর বলেনঃ হে আয়শা! আল্লাহ আপনাকে উত্তম প্রতিদান দিন। আল্লাহর কসম! যখনই আপনি কোন সংকটে পড়েছেন তখনই আল্লাহ আপনার জন্য তার সমাধানের একটা পথ খুলে দিয়েছেন এবং সমস্ত মুসলমানদের জন্য তার মধ্যে বরকত দান করেছেন।[১৭]

"হে মুমিনগণ! নেশাগ্রস্ত অবস্থায় তোমরা সালাতের নিকটবর্তী হইও না, যতক্ষণ না তোমরা যাহা বল তাহা বুঝিতে পার, এবং যদি তোমরা মুসাফির না হও তবে অপবিত্র অবস্থাতেও নহে, যতক্ষণ পর্যন্ত না তোমরা গোসল কর। আর যদি তোমরা পীড়িত হও অথবা সফরে থাক অথবা তোমাদের কেহ নীচ স্থান হইতে আসে অথবা তোমরা নারী সম্ভোগ কর এবং পানি না পাও তবে পবিত্র মাটির দ্বারা তায়াম্মুম করিবে এবং মসেহ করিবে, মুখমন্ডল ও হাত, নিশ্চয়ই আল্লাহ পাপ মোচনকারী, ক্ষমাশীল।[১৮]

১৬। সহীহ বুখারী, ৩য় খন্ড, প্রাগুক্ত, পৃ-৫৬৯।
১৭। সহীহ বুখারী, ৩য় খন্ড, প্রাগুক্ত, পৃ-৫৭০।
১৮। আল-কুর'আন, ৪ঃ৪৩।

Dhaka University Institutional Repository

"আবু হিশাম রাযী আল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ লোকেরা তাদের যাবতীয় হাদীয়া উপঢৌকন যে দিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আয়েশার গৃহে অবস্থান করতেন সেদিন প্রেরণ করত। আয়েশা রাযী আল্লাহু আনহা বলেন ঃ একদিন আমার সঙ্গিনীরা উম্মে সালামার নিকট একত্রিত হয়ে বললঃ হে উম্মে সালামা, আল্লাহর কসম! লোকেরা ইচ্ছাকৃতভাবে নিজেদের হাদীয়া আয়েশার জন্য নির্দিষ্ট দিন পাঠিয়ে থাকে। অথচ আয়েশার মতো আমাদেরও কল্যাণ লাভের আকাঙ্খা আছে। কাজেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলুন, তিনি যেন লোকদেরকে বলে দেন যে, তিনি যখন যেখানে থাকবেন কিংবা যে ঘরে থাকবেন তারা যেন সেখানেই হাদীয়া পাঠিয়ে দেয়। আয়েশা রাযী আল্লাহ আনহা বলেনঃ উম্মে সালামা এ ব্যাপারটা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট বললেন। উম্মে সালামা বলেনঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার নিকট থেকে চলে গেলেন। তারপর পুনরায় যখন আমার নিকট এলেন তখন আমি ব্যাপারটা পুনরুল্লেখ করলাম। এবারও তিনি আমার নিকট থেকে চলে গেলেন। অতঃপর তৃতীয়বার যখন আমি তাঁকে বললাম, তখন তিনি বললেন ঃ হে উম্মে সালামা! আয়েশার ব্যাপারে আমাকে কষ্ঠ দিও না। কেননা, আল্লাহর কসম! আয়েশা ছাড়া তোমাদের মধ্যে অন্যকোন স্ত্রীর বিছানায় আমার নিকট ওহী আসেনি।[১৯]

উম্মুল মু'মিন হযরত আয়েশা রাযী আল্লাহু আনহা এর জীবন খুব ঘটনা বহুল। আল্লাহর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর জীবনকালে এবং তাঁর তিরোধানের পরও তিনি বিভিন্ন ঐতিহাসিক ঘটনার সাথে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল ইফকের ঘটনা।

বনি মুসতালিকের যুদ্ধের সময় হযরত আয়েশা রাযী আল্লাহু আনহা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সফর সঙ্গী ছিলেন। এই সফরের সময় হযরত আয়েশা রাযী আল্লাহু আনহার গলার হার হারিয়ে যাওয়াকে কেন্দ্র করে ইফকের ঘটনা ঘটে।[২০]

১৯। সহীহ বুখারী, প্রাগুক্ত, পৃ-৫৭০।

২০। মুহাম্মাদ আব্দুল মা'বুদ আসহাবে রাসূলের জীবন কথা, বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার কাটাবন, ঢাকা, প্রথম প্রকাশনা, ১৯৯৯ খ্রিঃ, রমাদান-১৪২০, পৃ-৯৩০।

Dhaka University Institutional Repository

এই মিথ্যা অপবাদ সারা শহরের মধ্যে প্রচলিত হতে লাগল। বিবি আয়েশা রাযী আল্লাহু আনহা প্রায় একমাস অসুস্থ্য হয়ে বিছানায় পড়ে রইলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খুব চিন্তিত ও পেরেশানীতে ছিলেন। হযরত আবু বকর রাযী আল্লাহু আনহু ব্যথিত শোকাভিভূত এবং পেরেশান। সমগ্র মুসলিমের মধ্যে এ বিষয়টি একটি যন্ত্রনাদায়ক ও কষ্টকর বিষয় হয়ে দাঁড়াল। এমনি একদিন দীর্ঘ একমাস পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিবি আয়েশা রাযী আল্লাহু আনহা এর কাছে এসে বসলেন। হযরত আবু বকর এবং উম্মে রুমান তাঁর নিকটে এসে বসলেন।

নবী করীম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, "আয়িশা! তোমার সম্পর্কে এই সব কথা আমার কানে পৌছেছে। তুমি যদি নিস্পাপ হয়ে থাক, তাহলে আশা করি আল্লাহ তোমার নির্দোষিতা প্রকাশ ও প্রমাণ করে দিবেন। আর তুমি যদি বাস্তবিকই কোন প্রকার গুনাহে লিপ্ত হয়ে থাক, তাহলে আল্লাহর নিকট তাওবা কর ক্ষমা চাও। বান্দাহ যখন গুনাহ স্বীকার করে, তাওবা করে, তখন আল্লাহ মাফ করে দেন।

এরই মধ্যে আল্লাহর পক্ষ থেকে আমার নির্দোশিতা প্রমাণ করে 'ওহী' নাযিল হল। আল্লাহপাক সত্যকে সবার সামনে প্রকাশ করে দিলেন।[২১] ওহী কালীন অবস্থা পেশ হয়ে গেলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে খুবই উৎফুল্ল দেখা গেল তিনি হাসি সহকারে প্রথম যে কথাটি বললেন তা ছিল এইঃ "আয়িশা তোমাকে সুসংবাদ। আল্লাহ তোমার নির্দোষিতা ঘোষণা করে ওহী নাযিল করেছেন।" অতঃপর তিনি কুর'আনের আয়াত তেলাওয়াত করে শুনালেন।[২২] যাহারা এই অপবাদ রচনা করিয়াছে তাহারা তো তোমাদেরই একটি দল; ইহাকে তোমরা তোমাদের জন্য অনিষ্টকর মনে করিও না; বরং ইহা তো তোমাদের জন্য কল্যাণকর; উহাদের প্রত্যেকের জন্য আছে উহাদের কৃত পাপকর্মের ফল এবং উহাদের মধ্যে যে এই ব্যাপারে প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছে, তাহার জন্য আছে মহাশাস্তি। যখন তাহারা ইহা শুনিল তখন মুমিন পুরুষ এবং মুমিন নারীগণ আপন লোকদের সম্পর্কে কেন ভাল ধারণা করিল না এবং বলিল না, ইহা তো সুস্পষ্ট অপবাদ।[২২] এভাবে কুরআনের আয়াত নাযিলের মাধ্যমে আল্লাহ পাক হযরত আয়েশা রাযী আল্লাহু আনহা-কে সম্মানিত করলেন।

২১। সহীহ বুখারী, ৫ম খন্ড, পৃঃ-১৯৮-২০১।

২২। আল কুরআন, ২৪ঃ১১-১২।

Dhaka University Institutional Repository

ঈলা বা তাখঈর এর ঘটনা ঃ

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও তাঁর বিবিগণ প্রতিনিয়ত অভাব অনটন ও মিতব্যয়িতার মধ্যে দিয়ে জীবন-যাপন করতেন। ইসলামের জীবনকালে তাঁরা তাঁদের জন্য নির্ধারিত বরাদ্দের পরিমাণ বৃদ্ধির জন্য দাবী জানান। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই সময় প্রতিজ্ঞা করেন তিনি কোন স্ত্রীর কাছেই এক মাস যাবেন না ২৯ দিন পর তিনি সর্বপ্রথম আয়েশা রাযী আল্লাহু আনহার ঘরে যান। যেহেতু নবউ পত্নীগণ জীবন যাপনের মান বৃদ্ধির দাবিদার ছিলেন।[২৩] এজন্য আল্লাহ তায়ালা তাখঈর এর আয়াত নাযিল করেন। আর যদি তোমরা কামনা কর আল্লাহ, তাঁহার রাসূল ও আখিরাত, তবে তোমাদের মধ্যে যাহারা সৎ কর্মশীল আল্লাহ তাহাদের জন্য মহা প্রতিদান প্রস্তুত রাখিয়াছেন।[২৪] এই আয়াত যখন নাযিল হলো তখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সর্বপ্রথম হযরত আয়িশা রাযী আল্লাহু এর সাথে করা বললেন। তোমাকে একটি কথা বলছি, খুব তাড়াতাড়ি করে জবাব দিও না। তোমার পিতা মাতার মতামতা জেনে নাও। তারপর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে সূরা আল আহযাবের ২৯নং আয়াত তেলাওয়াত করে শুনালেন। সাথে সাথে হযরত আয়িশা রাযী আল্লাহু আনহা বললেন ঃ এই বিষয়ে আমার বাবা-মায়ের নিকট কি জিজ্ঞেস কবর? আমি তো আল্লাহ তাঁর রসূল এবং পরকালের সাফল্যই চাই।[২৫]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর ইন্তেকাল ঃ

হযরত আয়েশা রাযী আল্লাহু আনহা-এর বয়স যখন আঠারো বছর তখন স্বামী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইনতিকাল করেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অসুস্থ অবস্থায় শেষের দিকে পার্থিব জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তিনি আয়িশা রাযী আল্লাহু আনহা এর ঘরে অবস্থান করেন। যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর শেষ সময়। আয়িশা রাযী আল্লাহু আনহা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সুস্থতার জন্য দু'আ করে চলেছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপনার তো বড় কষ্ট হচ্ছে। বললেন ঃ কষ্ঠ অনুপাতে প্রতিদানও আছে। আয়িশা রাযী আল্লাহু আনহা হযরত রসূলে করীমকে সামনে নিয়ে বসে আছেন। হঠাৎ তাঁর দেহের ভার অনুভব করলেন। চোখের দিকে তাকিয়ে বুঝলেন, তিনি আর নেই। আস্তে করে পবিত্র মাথাটি বালিশের উপর রেখে কান্নায় ভেঙ্গে পড়লেন।[২৬]

২৩। সহীহ বুখারী, ৫ম খন্ড, পৃ-২০১।
২৪। আল-কুরআন, ৩৩ঃ২৯।
২৫। সহীহ বুখারী, ৮ম খন্ড, পৃ-৬৯।
২৬। মুহাম্মাদ আব্দুল মা'বুদ, প্রাগুক্ত, পৃ-৯৯।

Dhaka University Institutional Repository

হযরত আয়িশা রাযী আল্লাহু আনহা সবচেয়ে বড় সম্মান ও মর্যাদা এই যে, তাঁরই ঘরের মধ্যে, এক পাশে রসূলে পাকের পবিত্র দেহ সমাহিত করা হয়।[২৭]

৬৬ বছর বয়সে ৫৭ হিজরীতে তিনি ইনতিকাল করেন। এই সময় মারওয়ানের পক্ষ হতে হযরত আবু হুরায়রা রাযী আল্লাহু আনহু মদীনার শাসনকর্তা ছিলেন। সুতরাং তিনি তাঁর জানাযা পড়ান। অতঃপর হযরত আয়িশার অসিয়্যত অনুযায়ী তাঁকে জান্নাতুল বাকী কবরস্থানে রাত্রিকালে দাফন করা হয়।

কাশিম ইবন মুহাম্মদ, আব্দুল্লাহ ইবন আবদুর রহমান, আব্দুল্লাহ ইবন আবু আতীক, উরওয়া ইবন যুবায়র এবং আব্দুল্লাহ ইবন যুবায়র রাযী আল্লাহু আনহু তাঁকে কবরে নামান। প্রথমোক্ত দু'জন ছিলেন হযরত আয়িশার ভ্রাতুষ্পুত্র, আর শেষোক্ত দু'জন ছিলেন তাঁর বোনের ছেলে। আর আব্দুল্লাহ ইবন আবু আতীক ছিলেন তাঁর ভ্রাতার পৌত্র।[২৮]

উম্মুল মু'মিনীন হযরত সাওদাত বিনতে যামআহ ঃ

উম্মুল মু'মিনীন সাওদা বিনতে যামআহ ইবনে কায়েস ইবনে আবদে শামস। কুরাইশ বংশের বনু আমের গোত্রীয়া। প্রথমে স্বীয় চাচাত ভাই সকরান ইবনে আমেরের সাথে তাঁর বিয়ে হয়। ইসলাম প্রচারের প্রাথমিক যুগেই তাঁরা স্বামী স্ত্রী উভয়ে ইসলাম গ্রহণ করেন। হাবশায় দ্বিতীয় হিজরীতে তাঁরা উভয়ে অংশগ্রহণ করেছিলেন। হাবশা হতে মক্কায় প্রত্যাবর্তনের কিছুদিন পর হযরত সওদা ও তাঁর গর্ভজাতপুত্র আব্দুর রহমানকে জীবিত রেখে সকরান পরলোক গমন করেন। হযরত খাদীজা রাযী আল্লাহু আনহার মৃত্যুর পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অত্যন্ত শোকাকুল হয়ে পড়েন। বাড়ি ঘর এবং শিশু ছেলে-মেয়েদের যত্ন এবং তত্ত্বাবধান করারও বিশেষ অসুবিধা হয়ে দাঁড়ায়। এই সময় হযরত খাওলা বিনতে হাকীম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খিদমতে হাযির হয়ে বললেন-এই অবস্থায় আপনার একজন সহানুভূতিশীল জীবন-সঙ্গিনীর প্রয়োজন। অনুমতি পেলে আমি তার জন্য চেষ্টা করতে পারি।

২৭। মুহাম্মাদ আব্দুল মা'বুদ, প্রাগুক্ত, পৃ-৯৯।
২৮। শিবলী নুমানী, প্রাগুক্ত, পৃ-৪০৭।
২৯। শিবলী নুমানী, প্রাগুক্ত, পৃ-৪০৩।
৩০। সহীহ বুখারী, ১ম খন্ড, পৃ-২৬।

Dhaka University Institutional Repository

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সম্মতি পেয়ে খাওলা হযরত সওদার পিতার নিকট গিয়ে বিবাহের প্রস্তাব দিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট বিয়ে দিতে আপত্তির কোন কারণ থাকতে পারেন না। সুতরাং সব বিষয়ের মীমাংসা হয়ে গেল। নির্দিষ্ট সময়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বররূপে বিবাহ মজলিসে উপস্থিত হলেন। হযরত সওদার পিতা চারশত দিরহাম মোহর নির্ধারণ করে বিয়ে পড়িয়ে দিলেন।[২৯]

নবী পত্নীদের বাইরে যাওয়া ওমর রাযী আল্লাহু আনহু পছন্দ করতেন না। তিনি প্রায়ই পর্দার ব্যবস্থা করার জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট প্রস্তাব করতেন। একদিন রাত্রিকালে হযরত সাওদা রাযী আল্লাহু আনহা মলমূত্র ত্যাগের জন্য যাচ্ছিলেন। তিনি ছিলেন দীর্ঘকায় ও হৃষ্টপুষ্ট। হযরত ওমর রাযী আল্লাহু আনহু দূর হতে দেখে বললেন-হে সাওদা রাযী আল্লাহু আনহা, আমি আপনাকে চিনতে পেরেছি এই কথা শুনে হযরত সাওদা রাযী আল্লাহু আনহা অত্যন্ত মর্মাহত হলেন। গৃহে ফিরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তিনি একথা জানালেন। এরপর পর্দার আয়াত অবতীর্ণ হল।[৩০]

দানশীলতা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর একটি বিশেষ গুণ ছিল সংসর্গের কারণে স্ত্রীগণের মধ্যে এই গুণটি বিশেষভাবে প্রসার লাভ করেছিল। কিন্তু হযরত আয়িশাকে বাদ দিয়ে তাঁদের মধ্যে হযরত সাওদা ছিলেন এই গুণে সেরা। একবার হযরত ওমর রাযী আল্লাহু আনহু এক থলি দিরহাম তাঁর জন্য প্রেরণ করলেন। তিনি প্রশ্ন করলেন-থলির ভিতরে কি আছে? বাহক বলল, দিরহাম। তিনি আশ্চার্যান্বিত হয়ে বললেন, খেজুরের ন্যায় টাকা-পয়সা কি থলি ভরে প্রেরণ করা হয়? অতঃপর তিনি উক্ত থলির সমস্ত দিরহাম গরীব দুঃখীদের মধ্যে বন্টন করে দিলেন। নিজের ন্য এক কপর্দকও রাখলেন না। স্বামী ভক্তি ও তার একটি বিশেষ গুণ ছিল। এই গুণে উম্মুল মু'মিনীনদের মধ্যে তিনি ছিলেন অনুপম। তিনি মাত্র পাঁচটি হাদীস রিওয়াত করেছেন। তন্মধ্যে মাত্র একটি হাদীস সহীহ বুখারীতে আছে।[৩১]

২৯। শিবলী নুমানী, প্রাগুক্ত, পৃ-৪০৩।
৩০। সহীহ বুখারী, ১ম খন্ড, পৃ-২৬।
৩১। শিবলী নুমানী, প্রাগুক্ত, পৃ-৪০৫।

Dhaka University Institutional Repository

হযরত উমর রাযী আল্লাহু আনহু এর খিলাফতকালে হযরত সাওদা পরলোক গমন করেন। এটা ইমামা বুখারীর রিওয়ায়ত। ইমাম যাহারী আততারীখুল কবীর-এ উল্লেখ করেছেন যে, হযরত উমরের খিলাফতের শেষ সময়ে তাঁর ইনতিকাল হয়। দিয়ারবকরী তারখুল খমীস গ্রন্থে উল্লেখ করেন যে, এটাই তাঁর মৃত্যুর সঠিক তারিখ।

২৩ হিজরীতে হযরত উমর রাযী আল্লাহু আনহু শহীদ হন। সম্ভবত ২২ হিজরীতে হযরত সওদার মৃত্যু হয়েছিল। হযরত খাদীজা রাযী আল্লাহু আনহা এর অবর্তমানে যে প্রয়োজনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত সওদাকে বিয়ে করেছিলেন, বাস্তবিক তিনি সে প্রয়োজন মিটাবার উপযুক্ত পাত্রীই ছিলেন। এই গুণবতী বিধবা মহিলা হযরত খাদীজার স্থলাভিষিক্ত হয়ে শিশু ছেলে-মেয়েদেরকে উপযুক্ত আদর-যত্ন এবং ঘরকন্নার কাজ সুচারুরূপে সম্পন্ন করতেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর শূন্যস্থান পূর্ণ করতে পূর্বমাত্রায় সক্ষম হয়েছিলন।[৩২]

উম্মুল মু'মিন হযরত হাফসা রাযী আল্লাহু আনহা ঃ

হযরত হাফসা ছিলেন হযরত উমরের কন্যা। বংশক্রমে-

হাফসা বিনত উমর ইবন খাত্তাব বিন নোফায়েল বিন আবদুল উজ্জা বিন বিরাহ বিন আব্দুল্লাহ বিন কুরাত বিন রিযাহ বিন আদি বিন লুই বিন ফিহর বিন মালিক। মায়ের নাম ঃ যয়নব বিনতে মজউন। যিনি ছিলেন বিখ্যাত সাহাবী উসমান বিন মজউনের বোন, আর নিজেও তিনি সাহাবী ছিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নবুওয়ত প্রাপ্তির পাঁচ বছর পূর্বে তাঁর জন্ম হয়। প্রথম হযরত খুনায়স ইবন হুযাফার সালে তাঁর বিয়ে হয়। হযরত হাফসা স্বামীর সাথে হিজরত করে মদীনায় যান। হযরত খুনায়স বদর যুদ্ধে আহত হয়ে শহীদ হন। হযরত হাফসার গর্ভে হযরত কুনায়সের কোন সন্তানাদি জন্মগ্রহণ করেনি।[৩৩]

৩২। ড. এ এম. মুজতবা হোছাইন, প্রাগুক্ত, পৃ-৯৬৫।

৩৩। যরকানী, শাহ মাওয়াহিবিল লাদুন্নিয়া (মিসর ঃ তাব'আতুল আযহাবিয়্যা, ১৩২৮ খ্রিঃ), ২য় খন্ড, পৃ-২৭০।

Dhaka University Institutional Repository

হযরত হাফ্সা পিতার ন্যায় তেজস্বী ও অসীম সাহসিকতার অধিকারিণী ছিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, উমরকে দেখলে শয়তান পালিয়ে যায়। হযরত হাফসা সম্পর্কে হযরত আয়িশা বলেন ঃ হাফসা বাপেরই বেটী। অর্থাৎ হযরত হাফসাও তাঁর পিতার ন্যায় তেজস্বী ও উগ্র স্বভাব সম্পন্ন। এই উগ্র স্বভাবের দরুন একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে তালাক দিতে মনস্থ করেছিলেন। তখন হযরত জিবরীল (আঃ) হাযির হয়ে বললেন-

যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম,আপনি তাঁকে তালাক দিবেন না। কারণ তিনি খুব রোযা রাখেন এবং রাত্রি জাগরণ করে আল্লাহ তাআলার ইবাদত বন্দেগী করেন।[৩৪]

হযরত মু'আবিয়া রাযী আল্লাহু আনহু এর খিলাফতকালে ৪৫ হিঃ শাবান মাসে তিনি তেষট্টি বছর বয়সে পরলোক গমন করেন। মৃত্যুর পূর্বে তিনি কিছু সম্পত্তি ওয়াক্ফ করেন এবং কিছু টাকা পয়সাও আল্লাহর নামে সদকা করে যান। তখন মারওয়ান মদীনার গভর্ণর ছিলেন। তিনিই তাঁর জানাযা পড়ান। জানাজার পর মারওয়ান তার খাটি কাঁঠে করে বনু হাযমের বাসস্থান হতে হযরত মুগীবার বাসস্থান পর্যন্ত নিয়ে যান। অতঃপর হযরত আবু হুরায়তা কাঁধে নিয়ে কবর পর্যন্ত পৌঁছান। তাঁর ভাই আব্দুল্লাহ ও আসিম এবং ভ্রাতুস্পুত্র সালিম, আব্দুল্লাহ ও হামযা তাঁকে কবরে রাখেন।[৩৫]

হযরত উম্মুল মাসাকীন যয়নব রাযী আল্লাহু আনহা ঃ

যয়নব তাঁর নাম। বংশক্রম- যয়নব বিনত খুযায়মা বিন আব্দুল্লাহ বিন উমর বিন আবদে মানফ বিন হিলাল বিন আমের বিন সাআসাআ। তিনি দরিদ্রদের খুবই উদারতা ও দয়ার্দ্রতার সঙ্গে খাওয়াতেন, সেজন্য "উম্মুল মাসাকিন" বা "দারিদ্র-মাতা" উপনামে বিখ্যাত হন। মহানবীর সঙ্গে বিবাহের পূর্বে তিনি আব্দুল্লাহ ইবন জাহাশের স্ত্রী ছিলেন।

৩৪। আবু মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ ইবন আব্দুর রহমান আদদারিমী, সুনানুল দারিমী, ২য় খন্ড, পৃ-১৬১।
৩৫। ইবন সায়্যিদুন্নাস, প্রাগুক্ত, পৃ-৩০২-৩০৩।

Dhaka University Institutional Repository

হযরত আব্দুল্লাহ শহীদ হওয়ার পর তৃতীয় হিজরীতেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাথে তাঁর বিয়ে হয়। বিবাহের দুই তিন মাস পরেই চতুর্থ হিজরীতে তিনি ইন্তেকাল করেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জীবিত থাকাকালে প্রথমে হযরত খাদীজা অতঃপর হযরত যয়নব ইন্তিকাল করেন। এছাড়া আর কোন পত্নীই তার জীবদ্দশায় ইন্তিকাল করেননি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বয়ং তাঁর জানাযা পড়ান এবং জান্নাতুল বাকী কবর স্থানে তাঁকে দাফন করেন।[৩৬]

হযরত উম্মু সালামা রাযী আল্লাহু আনহা ঃ

উম্মুল মু'মিনীন হযরত উম্মু সালামার রাযী আল্লাহু 'আনহা আসল নাম 'হিন্দা'। 'উম্মু সালামা' ডাক নাম এ নামেই তিনি প্রসিদ্ধ।[৪৬] অনেকে তাঁর নাম রাসালা বলেছেন, কিন্তু মুহাদ্দিগণ একে ভিত্তিহীন মনে করেছেন।[৪৭] মূলত রামালা উম্মুল মু'মিনীন হযরত উম্মে হাবীবা রাযী আল্লাহু আনহা-এর নাম। উম্মে সালামা রাযী আল্লাহু আনহা-এর পিতা আবু উমাইয়্যা ইবন আল-মুগীরা ইবন আব্দুল্লাহ ইবন 'আমর ইবন আল-মাখযুম।' [৩৭]

হযরত উম্মু সালামা রাযী আল্লাহু আনহা-এর মাতার নাম 'আতিকা বিনত' আমির ইবন রাবি 'আ ইবন মালিক আল-কিনারিয়্যা।' কোন কোন গ্রন্থকার মনে করেছেন উম্মু সালামা রাযী আল্লাহু আনহা এর মা আতিকা ছিলেন আবদুল মুত্তালিবের কন্যা। সুতরাং উম্মু সালামা রাযী আল্লাহু আনহা-এর পিতার সাথে এই আতিকার বিয়ে হয়েছিল এবং তাঁর গর্ভে আব্দুল্লাহ, উম্মু যুহাইর ও কারীবা নামের তিনটি সন্তান জন্মলাভ করে। কিন্তু এ আতিকা উম্মু সালামা রাযী আল্লাহু আনহা-এর মা নন। তাঁর মা আমির ইবন রাবী 'আর কন্যা আতিকা।'[৩৮]

হযরত উম্মু সালামা রাযী আল্লাহু আনহা এর প্রথম বিয়ে হয় আব্দুল্লাহ ইবন আবদিল আসাদ আল মাখযুমীর সাথে। অন্যদিকে আবু সালাম ছিলেন রসূলের দুধভাই।

৩৬। ইব্ন কাসীর, আসসীরাতুন নববিয়্যা (মিশরঃ ইসাল বাবিল হালবী, ১৯৬৪ খ্রিঃ), ৩য় খন্ড, পৃ-১৭৩।
৩৭। আল বালাজুরী আনসাবুল আশরাফ, প্রাগুক্ত, ১ম খন্ড, পৃ-৪২৯।
৩৮। আব্দুর রউফ দানাপুরী, প্রাগুক্ত, পৃ-৬২১।

Dhaka University Institutional Repository

তাঁরা স্বামী-স্ত্রী উভয়ে ছিলেন ঐ সকল লোকদের অন্তর্গত যাঁদেরকে বলা হয় কাদীমুল ইসলাম বা প্রথম পর্বে ইসলাম গ্রহণকারী। হযরত আব্দুল্লাহ সর্বপ্রথম সস্ত্রীক হাবশায় হিজরত করেন। সেখানেই তাঁদের একটি পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করে। তাঁর নাম ছিল সালামা। তাঁর বয়স অনুসারেই হযরত আব্দুল্লাহ আবু সালাম এবং হযরত হিন্দকে উম্মু সালামা বলা হত। হাবশা হতে ফিরে এসে তাঁরা মক্কায় আসেন। পুনরায় মক্কা হতে মদীনায় হিজরত করেন। নারীদের মধ্যে হযরত উম্মু সালামাই সর্বপ্রথম হিজরত করে মদীনা যান।[৩৯]

হযরত উম্মু সালামা ছিলেন অত্যন্ত ধর্মপরায়ণ, ধৈর্যশীলা, মেধাবী, বিদ্যানুরাগিনী, প্রত্যুৎপন্নমতি ও সূক্ষ্মদর্শী নারী। ফিক্‌হশাস্ত্রে তাঁর অগাধ জ্ঞান ছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ইনতিকালের পর বড় বড় সাহাবী ও তাবেঈগণ তাঁর নিকট এসে জটিল মাসআলাসমূহের মীমাংসা করতেন। জ্ঞান-গরিমা ও বিদ্যা-বুদ্ধিতে হযরত আয়েশার পরেই হযরত উম্মু সালামার স্থান।[৪০]

হযরত আবু সালামা অল্প বয়স্ক তিনটি পুত্র ও তিনটি কন্যা রেখে পরলোক গমন করেন। তাঁর মৃত্যুর পর এই ছয়টি সন্তানের লালন-পালনের ভারও উম্মু সালামার উপর ন্যস্ত হয়। হযরত আবু সালামার মৃত্যুর পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত উম্মু সালামাকে বিয়ের প্রস্তাব জানালেন। তিনি কয়েকটি কারণ দেখিয়ে এ প্রস্তাবে আপত্তি জানালেন। হযরত উম্মু সালামা যখন বুঝতে পারলেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বেচ্ছায় সমস্ত ঝঞ্ঝাটি গ্রহণ করেছেন তখন তিন সম্মতি প্রদান করলেন এবং বিয়ে হয়ে গেল।

যে হুজরাতে হযরত উম্মুল মাসাকীন বাস করতেন। হযরত উম্মু সালামাকে সেই হুজুরায় দেয়া হল। তিনি প্রথম দিন স্বামীর গৃহে এসে যব ও চর্বি দ্বারা খাদ্য প্রস্তুত করতঃ রসূলের সম্মুখে হাজির করলেন। এই ছিল তাঁর বিবাহের ওলীমা।

উম্মুহাতুল মু'মিনের মধ্যে সকলের শেষে হযরত উম্মু সালামা পরলোকগমন করেন। ইহাই ঐতিহাসিকগণের সর্বাধিক সম্মত হত।[৪১]

৩৮। শিবলী নুমানী, সীরাতুন্নবী, প্রাগুক্ত, পৃ-৪১১-৪১২।

৪০। মাওলানা আবুল বারাকাত, "আব্দুর রউফ দানাপুরী (ঢাকাঃ কুতুব খানা রশীদিয়া, ১৯৯০ খ্রিঃ), পৃ-৫৮০।

৪১। আব্দুর রউফ দানাপুরী, প্রাগুক্ত, পৃ-৫৮০-৫৮১।

Dhaka University Institutional Repository

হযরত যায়নব বিনত জাহাশ রাযী আল্লাহু আনহা ঃ

উম্মুল মু'মিনীন হযরত যায়নাব-এর ডাকনাম ছিল উম্মু হাকাম। তাঁর পিতা ছিলেন বনু আসাদ ইবন খুযায়মা গোত্রের জাহাশ ইবন রাবার আল-আসাদী এবং মাতা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ফুফু আব্দুল মুত্তালিব। সুতরাং তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আপন ফুফাতো বোন।[৬০] হযরত যায়নাব রাযী আল্লাহু আনহা ইসলামের আদি পর্বেই মুসলমান হন। ইবনুল আসীর বলেনঃ তিনি ছিলেন আদি পর্বের মুসলমান।[৪২]

বিয়ে ঃ

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বীয় আযাদকৃত দাস ও পালিত পুত্র যায়িদ ইবন হারিসার সাথে তাঁর বিয়ে দেন। এত সৎ গুণ ও বৈশিষ্ট্য থাকা সত্ত্বেও তিনি ছিলেন দাস। তার জয়নাব ছিলেন কুরাইশ বংশের। তিনি কিছুতেই যায়েদকে মন থেকে মেনে নিতে পারেনি।

যায়িদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট এসে বলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যায়নাব তাঁর কঠোর বাক্যবানে আমাকে বিদ্ধ করে। আমি তাঁকে তালাক দিতে চাই। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত যায়িদকে তালাক দান থেকে বিরত রাখার চেষ্টা করেন।[৪৩] কুর'আন পাকে সে চেষ্টা এভাবে বিধৃত হয়েছে।

স্মরণ কর, আল্লাহ যাহাকে অনুগ্রহ করিয়াছেন এবং তুমিও যাহার প্রতি অনুগ্রহ করিয়াছ, তুমি তাহাকে বলিতেছিলে, তুমি তোমার স্ত্রীর সহিত সম্পর্কে বজায় রাখ এবং এবং আল্লাহকে ভয় কর।[৪৪]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর শত চেষ্টা সত্ত্বেও হযরত যায়নাব ও হযরত যায়িদ রাযী আল্লাহু আনহু-এর বিয়ে টিকল না। হযরত যায়িদ তাকে তালাক দিয়েই ছাড়ছেন।

৪২। ইবনুল আসীর উস্‌দুল গাবা ফী মা'রিফাতিস সাহাবা (বৈরুতঃ দারু ইহইয়া আত-তুরাম, আল আবাবী, ৫ম খন্ড, পৃ-৪৬৩।

৪৩। মুহাম্মদ আব্দুল মা'বুদ, ৫ম খন্ড, প্রাগুক্ত, পৃ-২৩৫।

৪৪। আল-কুরআন, ৩৩ঃ৩৭।

Dhaka University Institutional Repository

যায়নাবের ছিল বংশ কৌলিন্য। প্রথম থেকেই এ বিয়েতে হযরত যায়নাবের মত ছিল না। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে সরাসরি বলে দিয়েছিলেন- তাকে নিজের জন্য পছন্দ করি না। কিন্তু সবশেষে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নির্দেশে রাজি হন।[৪৫] তখন সূরা আল আহযাবের এ আয়াত নাযিল হয়-

"আল্লাহ ও তাঁহার রাসূল কোন বিষয়ে নির্দেশ দিলে কোন মু'মিন পুরুষ কিংবা মু'মিন নারীর সে বিষয়ে ভিন্ন সিদ্ধান্তের অধিকার থাকিবে না।"[৪৬]

বিয়ের পর এক বছর দুইজন একসাথে থাকেন কিন্তু প্রেম-প্রীতির সম্পর্ক গড়ে উঠল না। দিন দিন সম্পর্ক তিক্ত থেকে তিক্তকর হয়ে উঠল। হযরত যায়িদ রাযী আল্লাহু আনহু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর নিকট এসে অভিযোগ করলেন এবং তালাক দানের ইচ্ছা প্রকাশ করলেন।[৪৭]

হযরত যায়িদ রাযী আল্লাহু আনহু-এর সাথে হযরত যায়নাব রাযী আল্লাহু আনহা-এর বিয়েটি হয় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর ইচ্ছায়। এ বিয়েতে যায়নাবের মোটেই মত ছিলনা। যায়নাব ছিলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বোন। বোধ-বুদ্ধি হওয়া পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে লালন পালন করেন। তাই যখন তাদের ছাড়া ছাড়ি হয়ে গেল, তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে খুশি করার জন্য নিজেই বিয়ে করার ইচ্ছা পোষণ করতে লাগলেন। কিন্তু যেহেতু পালিত পুত্রের বিচ্ছেদ প্রাপ্তা স্ত্রীকে বিয়ে না করার প্রথাটি ছিল একটি জাহিলী সংস্কার মাত্র, আর আল্লাহ ও তাঁর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর ইচ্ছা ছিল তার মূলোৎপাটন করা,[৪৮] এ কারণে আল্লাহ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর সে সময়ের মনের ইচ্ছাটি প্রকাশ করে দেন।

"তুমি তোমার অন্তরে যাহা গোপন করিতেছ আল্লাহ তাহা প্রকাশ করিয়া দিতেছেন; তুমি লোক ভয় করিতেছিলে, অথচ আল্লাহকেই ভয় করা তোমার পক্ষে অধিকতর সংগত।[৪৯]

৪৫। ইবন সা'দ, আত-তাবাকাত আল-কুবরা (বৈরুতঃ দারু সাদির, ৮ম খন্ড, পৃ-১০৮)।
৪৬। আল-কুরআন, ৩৩ঃ৩৬।
৪৭। ইবন মাজার ফাতহুল বারী, মিসর ঃ ১৩১৯ হিঃ) তাফসীর, সূরা আল-আহযাব।
৪৮। মুহাম্মদ আবদুল মা'বুদ, ৫ম খন্ড, প্রাগুক্ত, পৃ-২৩৬।
৪৯। আল-কুরআন, ৩৩ঃ৩৭।

Dhaka University Institutional Repository

ইমাম তিরমিযী বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যদি ওহীর কোন কিছু গোপন করতেন তাহলে এ আয়াতটি করতেন। কারণ আল্লাহ এ আয়াতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর একটি গোপন ইচ্ছা প্রকাশ করে দিয়েছেন।

সহীহ মুসলিমে হযরত আনাস রাযী আল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত হয়েছে। হযরত যায়নাব রাযী আল্লাহু আনহা-এর ইদ্দত কাল শেষ হলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত যায়িদকেই তাঁর কাছে এই বলে পাঠালেন যে, তুমি তার কাছে আমার বিয়ের পয়গম নিয়ে যাও।

অন্য একটি বর্ণনায় এসেছে, হযরত যায়িদ রাযী আল্লাহু আনহু যায়নাব রাযী আল্লাহু আনহা-এর ঘরের দরজায় দিকে পিঠ ফিরিয়ে দাঁড়িয়ে বলেন, যায়নাব! আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পয়গাম নিয়ে এসেছি। হযরত যায়নাব জবাব দিলেন, "এখন আমি কাজ করছি। আল্লাহর কাছে ইসতিখারা ব্যতীত কিছু বলতে পারি না। একথা বলে তিনি মসজিদের দিকে যেতে শুরু করেন। এদিকে আল্লাহ তা'আলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর নিকট আয়াত নাযিল করেন।[৫০]

"অতঃপর যায়দ যখন যয়নবের সহিত বিবাহ সম্পর্ক ছিন্ন করিল, তখন আমি তাহাকে তোমার সহিত পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ করিলাম, যাহাতে মু'মিনদের পোষ্য পুত্রগণ নিজ স্ত্রীর সহিত বিবাহ সূত্র ছিন্ন করিলে সেইসব রমনীকে বিবাহ করায় মু'মিনদের কোন বিঘ্ন না হয়। আল্লাহর আদেশ কার্যকরী হইয়াই থাকে।"[৫১]

ইবন ইসহাক বলেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর সাথে হযরত যায়নাব রাযী আল্লাহু আনহা-এর বিয়ের কাজটি আঞ্জাম দেন হযরত আবু আহমাদ ইবন জাহাশ রাযী আল্লাহু আনহু হতে পারে পরে সামাজিকভাবে বিয়ে হয়েছিল এবং সেই কাজটি করেন আবু আহমদ ইবন জাহাশ। কিন্তু সহীহ মুসলিমে স্পষ্ট বর্ণিত হয়েছে যে উপরোক্ত আয়াত নাযিলের পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন পূর্ব অনুমতি ছাড়াই যায়নাব রাযী আল্লাহু আনহা-এর নিকট উপস্থিত হন।

৫০। মুসলিম ইবন হাজ্জাজ আল-কুশায়রী, সহীহ মুসলিম, (দিল্লীঃ আল মাকতাবা রশীদিয়া, ১৩৭৬ হিঃ), অধ্যায় কিতাবুল নিকাহ।

৫১। আল-কুরআন, ৩৩ঃ৩৭।

Dhaka University Institutional Repository

সহীহহাইনের একটি বর্ণনায় এসেছে, হযরত যায়নাব রাযী আল্লাহু আনহা তাঁর সতীনদের নিকট এই বলে গর্ব করতেন যে, আপনাদের বিয়ে আপনারদের অভিভাবকগণ দিয়েছেন, আর আমার বিয়ে দিয়েছেন খোদ আল্লাহু তা'আলা। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর এ বিয়ের কাজটি সম্পন্ন হয় ৫ম হিজরীর জিলকাদ মাসে।[৫৩]

সূরা আল আহযাবের ৩৭তম আয়াতে আল্লাহ বলেছেন, " আমরা তাকে (তালাক প্রাপ্ত মহিলা যায়নাবকে) তোমার সাথে বিয়ে দিলাম। এ কথাগুলোও ব্যবহৃত শব্দ দ্বারা একথা স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, নবী করীম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বিয়ে নিজের ইচ্ছা ও কামনার ভিত্তিতে নয়। বরং স্বয়ং আল্লাহ তা'আলার নির্দেশেই করেন।

আরবে মুখ-ডাকা আত্মীয়দের সম্পর্কে অত্যন্ত মারাত্মক ধরণের ভুল প্রথা প্রচলিত হয়েছিল এবং যুগ যুগ ধরে অব্যাহতভাবে তা চলে আসছিল পূর্ণ দাপটের সাথে। তা উৎখাত করার একটি মাত্র উপায় কার্যকর ও সফল হতে পারত। আর তা হলো আল্লাহর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেই অগ্রসর হয়ে তা শিকড়সহ উপড়ে ফেলবেন। অতএব স্পষ্ট বুঝা যাচ্ছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘরে তাঁর স্ত্রীদের সংখ্যা বৃদ্ধিতর উদ্দেশ্যে আল্লাহ তা'আলা এই বিয়ে করাননি। একটি অত্যন্ত বড় ও অতিশয় প্রয়োজনীয় কাজের লক্ষ্যেই তিনি তা করেছিলেন।[৫৪]

বিয়ের পর ইসলামের দুশমনরা সারাদেশে সমালোচনার ঝড় তুলল। এর জবাবে আল্লাহ বলেন-

"মুহাম্মাদ তোমাদের মধ্যে কোন পুরুষের পিতা নহে; বরং সে আল্লাহ্‌র রাসূল এবং শেষ নবী। আল্লাহ সর্ব বিষয়ে সর্বজ্ঞ।"

"মুহাম্মদ তোমাদের পুরুষদের মধ্যে কারো পিতা নয়, বরং আল্লাহর রসূল ও সর্বশেষ নবী মাত্র। আর আল্লাহ সর্ব বিষয়ে জ্ঞানী।"[৫৫]

৫২। আব্দুর রউফ দানাপুরী, প্রাগুক্ত, পৃ-৬২৮।

৫৩। আল-ইমাম, আজ-জাহাবী, সিয়ারু, আ-লাম আল-নু'বানা, প্রাগুক্ত, পৃ-২১৭।

৫৪। সাইয়্যেদ আবুল আলা মওদূদী, তাফহীমুল কুরআন, আধুনিক প্রকাশনী, ঢাকাঃ জুলাই-১৯৯, সফর-১৪১৪, ১২শ খন্ড, টীকা নং-৭২, পৃ-৬৩।

৫৫। আল-কুরআন, ৩৩ঃ৪০।

Dhaka University Institutional Repository

মুহাম্মদ তোমাদের পুরুষদের মধ্যে কারও পিতা নয়। অর্থাৎ যে ব্যক্তির পরিত্যক্ত স্ত্রীকে মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামবিয়ে করেছেন সে-তো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর পুত্রই ছিল না। কাজেই তার পরিত্যক্ত স্ত্রীকে বিয়ে করা রসূলের জন্য কখনও হারাম ছিল না। তোমরা নিজেরাই জান যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আদপেই কোন পুত্র সন্তান নেই।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত যায়নাব রাযী আল্লাহু আনহা-কে স্ত্রী হিসেবে ঘরে আনার পর ওলীমার আয়োজন করেন। ইবন সা'দ এই ওলীমার বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করেছেন এভাবে-

"রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর অন্য কোন স্ত্রীর ওলীমা সেভাবে করেনি যেভাবে যায়নাব রাযী আল্লাহু আনহা-এর ওলীমা করেছিলেন। তিনি যায়নাব রাযী আল্লাহু আনহা-এর ওলীমা করেন ছাগলের গোশত দিয়ে। হযরত আনাস রাযী আল্লাহু আনহু বলেন, এতো ভাল ও এত বেশি খাবারের আয়োজন তিনি অন্য কোন স্ত্রীর ওলীমাতে করেননি।[৫৬]

হযরত যায়নাব রাযী আল্লাহু আনহা-এর বিয়ের মধ্যে এমন কয়েকটি বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান যা আর কোথাও পাওয়া যায় না। সংক্ষেপে তা নিম্নরূপ ঃ

১. পালিত ও ধর্মপুত্রকে ঔরসজাত পুত্রের সমান জ্ঞান করা হতো, সেই ভ্রান্তি দূর হয়।

২. দাস ও স্বাধীন ব্যক্তির ব্যক্তির মধ্যে যে পর্বত পরিমাণ ব্যবধান ছিল তা দূর করে ইসলামী সাম্যের বাস্তব দৃষ্টান্ত এ বিয়েতে প্রতিষ্ঠিত হয়। দাস যায়িদকে আরবের সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বাধিক অভিজাত নারীর সাথে বিয়ে দেয়া হয়।

৩. এ বিয়েকে কেন্দ্র করে হিজাবের হুকুম নাযিল হয় অথবা বলা চলে এ বিয়ে ছিল হিজাবের হুকুম নাযিলের পটভূমি।

৪. এ বিয়ের জন্য ওহী নাযিল হয়।

৫. এ বিয়ের ওলীমা হয় জাঁকজমকপূর্ণভাবে।[৫৭]

৫৬। আব্দুর রউফ দানাপুরী, প্রাগুক্ত, পৃ-৬২২।

৫৭। মুহাম্মদ আব্দুল মা'বুদ, প্রাগুক্ত, পৃ-

Dhaka University Institutional Repository

এ সবের কারণেই হযরত যায়নাব রাযী আল্লাহু আনহা তাঁর অন্য সতীনদের সামনে গর্ব করতেন। একদিন তো রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলেই বসলেন ঃ

ইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আমি আপনার অন্য কোন বিবির মত নই। তাঁদের মধ্যে এমন কেউ নেই যার বিয়ে তাঁর পিতা, ভাই অথবা খান্দানের কোন অভিভাবক দেননি। একমাত্র আমি, যার বিয়ে আল্লাহ তা'আলা আসমান থেকে আপনার সাথে সম্পন্ন করেছেন। আপনার ও আমার দাদা একই ব্যক্তি, আর আমার ব্যাপারে জিবরাঈল (আঃ) হলেন দূত।[৫৮]

আল্লাহ যায়নাবকে তাঁর নবী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর সাথে কোন অভিভাবক ও সাক্ষী ছাড়াই বিয়ে দেন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর বিবিগণের মধ্যে যাঁরা হযরত আয়িশার সমকক্ষতা দাবি করতে পারতেন তাঁদের মধ্যে হযরত যায়নাব রাযী আল্লাহু আনহা অন্যতম। এ ব্যাপারে খোদ আয়িশা রাযী আল্লাহু আনহা-এর মন্তব্য ছিল এ রকম-

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বিবিগণের মধ্যে তিনিই আমার সমকক্ষতার দাবিদার ছিলেন।[৫৯]

ইফক এর ঘটনায় হযরত যায়নাব রাযী আল্লাহু আনহা-এর বোন হযরত হামনা বিনতে জাহাশ ও জড়িয়ে পড়েন। তিনি মনে করেন, এই সুযোগে বোন যায়নাব রাযী আল্লাহু আনহা-এর সতীন ও প্রতিদ্বন্দ্বী আয়িশা রাযী আল্লাহু আনহা-কে কাবু করতে পারলে বোন যায়নাব অপ্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে যাবেন। বোনের শুভ চিন্তায় তিনি এই নোংরা ষড়যন্ত্রে জড়িয়ে পড়েন।

৫৮। ইবন সাদ, তাবাকাত, প্রাগুক্ত, ৮ম খন্ড, পৃ-১০৪।

৫৯। আল ইমাম আজ-জাহাবী, সিয়ারু আলাম আল-নুবানা, প্রাগুক্ত, ২য় খন্ড, পৃ-২১১-২১২।

Dhaka University Institutional Repository

এখানে দেখার বিষয় হলো, এ সময় হযরত যায়নাব রাযী আল্লাহু আনহা-এর ভূমিকা কি ছিল। প্রতিদ্বন্দ্বী সতীনকে ঘায়েল করার, এবং পথের কাঁটা দূর করার চমৎকার একটা সুযোগ। এমন মোক্ষম সুযোগ জগতের কোন সতীন হাত ছাড়া করেছে বলে জানা যায় না। কিন্তু হযরত যায়নাব রাযী আল্লাহু আনহা নৈতিকতা ও আধ্যাত্মিকতার যে স্তরে উপনীত হয়েছিলেন তাতে তাঁর মত লোকের পক্ষে এমন নোংরা ষড়যন্ত্রের সুযোগ গ্রহণ করতে পারেন এমন কল্পনা করা যায় কেমন করে। তাই হযরত আয়িশা রাযী আল্লাহু আনহার সে দুর্যোগের দিনে একদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আয়িশা রাযী আল্লাহু আনহা সম্পর্কে হযরত যায়নাব রাযী আল্লাহু আনহা-এর মতামত জানতে চাইলেন। হযরত যায়নাব রাযী আল্লাহু আনহা অত্যন্ত স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন, আমি তাঁর মধ্যে ভাল ছাড়া আর কিছুই জানি না।

হযরত আয়িশা রাযী আল্লাহু আনহা আজীবন হযরত যায়নাব রাযী আল্লাহু আনহা-এর এ ঋণ মনে রেখেছেন। সারা জীবন তিনি মানুষের কাছে সে কথা বলেছেন। যায়নাবের মধ্যে যত গুণাবলি তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন, অকপটে তা মানুষকে জানিয়েছেন।

হাদীসের গ্রন্থাবলিতে হযরত আয়িশা রাযী আল্লাহু আনহা-এর যে সব উক্তি ছড়িয়ে আছে তাতেই হযরত যায়নাব রাযী আল্লাহু আনহা-এর প্রকৃত মর্যাদা ফুটে উঠেছে। হযরত আয়িশা রাযী আল্লাহু আনহা বলেন,

"আমি যায়নাব রাযী আল্লাহু আনহা এর চেয়ে কোন মহিলাকে বেশী দীনদার, বেশী পরহেযগার, বেশী সত্যভাষী, বেশী উদার, দানশীল, সৎকর্মশীল এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে বেশী তৎপর দেখিনি। শুধু তাঁর মেজাজে একটু তীক্ষ্ণতা ছিল। তবে তার জন্য তিনি খুব তাড়াতাড়ি লজ্জিশত হতেন।"[৬০]

আল্লামা ইবন আবদিল বার হযরত যায়নাব রাযী আল্লাহু আনহা সম্পর্কে হযরত আয়িশা রাযী আল্লাহু আনহা নিম্নোক্ত বর্ণনা করেছেন ঃ

"দ্বীনের ব্যাপারে আমি যায়নাব রাযী আল্লাহু আনহা-এর চেয়ে ভাল কোন মহিলা কখনো দেখিনি। ইবন সা'দ হযরত আয়িশা রাযী আল্লাহু আনহা-এর নিম্নোক্ত মন্তব্যটি সংকলন করেছেন।"[৬১]

৬০। ইবন হাজার আসকালানী, আল-ইসাবা ফী তামযীয়িস সাহাবা, বৈরুতঃ দার আল-ফিকর, ১৯৭৮ খিঃ ৪র্থ খন্ড, পৃ-৩১৩।

৬১। ইবন আবদিল বার: আল ইসতায়াব আল-ইসাবা গ্রন্থের পার্শ্ব টিকা, ২য় খন্ড, পৃ-৭৫৪।

Dhaka University Institutional Repository

আল্লাহ যায়নাব বিনতে জাহাশের প্রতি সদয় হোন। সত্যিই দুনিয়াতে অতুলনীয় সম্মান ও মর্যাদা লাভ করেছেন। আল্লাহ স্বয়ং তাঁর নবীর সাথে তাঁকে বিয়ে দিয়েছেন এবং তাঁর উপলক্ষ্যে আল কুরআনের কয়েকটি আয়াত নাযিল হয়েছে।[৬২]

হযরত আয়িশা রাযী আল্লাহু আনহা আরও বলেছেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পরকালে তাঁর সাথে সর্বপ্রথম মিলিত হওয়ার এবং জান্নাতে তাঁর স্ত্রী হওয়ার সুসংবাদ দান করে গেছেন।[৬৩]

হযরত উম্মু সালামা রাযী আল্লাহু আনহা তাঁর সম্পর্কে বলেছেন ঃ

" তিনি ছিলেন খুব বেশী সৎকর্মশীলা, বেশী সাওম পালনকারিনী ও বেশী সালাত আদায়কারিনী।"[৬৪]

খলীফা হযরত উমর রাযী আল্লাহু আনহা-এর খিলাফতকালে হিজরী ২০ সনে হযরত যায়নাব রাযী আল্লাহু আনহা ইনতিকাল করেন।[৬৫]

হযরত জুওয়াইরিয়া বিনত হারিস ঃ

উম্মুল মু'মিনীন হযরত জুওয়াইরিয়া রাযী আল্লাহু আনহা আরবের খুযা'আ গোত্রের মুসতালিক শাখার কন্যা। পিতা হারিস ইবন দিরার ছিলেন বানূ মুসতালিকের নেতা।[৬৬]

৬২। ইমাম আজ-জাহাবী, ২য় খন্ড, পৃ-২১৫।
৬৩। আলসাবুল আশরাফ, ১ম খন্ড, পৃ-৪৩৫।
৬৪। ইমাম আজ-জাহাবী, ২য় খন্ড, পৃ-২১৭।
৬৫। ইবন হাজার আল আসকালানী, ৪র্থ খন্ড, প্রাগুক্ত, পৃ-৩১৫।
৬৬। ইমাম আজ-জাহাবী, ২য় খন্ড, পৃ-২৬৩।

Dhaka University Institutional Repository

বনূ আল-মুসতালিক -এর যুদ্ধে হযরত জুওয়াইরিয়া রাযী আল্লাহু তার সামনে এসে বলেছেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ। আমি ইসলাম গ্রহণ করে এসেছি। আমি আমার গোত্রপতি হারিস ইবন দিরারের কন্যা। মুসলিম বাহিনীর হাতে বন্দী হয়ে এসেছি এবং সাবিত ইবন কায়েসের ভাগে পড়েছি। সাবিত আমার সাথে মুকাতাবা করেছেন। কিন্তু আমি অর্থ পরিশোধ করতে পারছি না। আমি আপনার নিকট এই প্রত্যাশা নিয়ে এসেছি যে, আপনি আমার চুক্তিবদ্ধ অর্থ পরিশোধে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিবেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তুমি কি এর চেয়ে ভাল কিছু আশা কর না? বললেন, তা কী? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আমি তোমার চুক্তিকৃত সকল অর্থ পরিশোধ করে দিই এবং তোমাকে বিয়ে করি। এমন অপ্রত্যাশিত প্রস্তাবে হযরত জুওয়াইরিয়া রাযী আল্লাহু আনহা দারুণ খুশী হন এবং সম্মতি প্রকাশ করেন। অতঃপর হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাবিতকে ডেকে পাঠান এবং চুক্তির তাঁকে দান করে জুওয়াইরয়া রাযী আল্লাহু আনহা-কে দাসত্ব থেকে মুক্ত করেন। অতঃপর তাঁকে বিয়ে করে স্বাধীন স্ত্রীর মর্যাদা দান করেন। ইবন ইসহাক ঘটনাটি এভাবে বর্ণনা করেছেন।

বিয়ের খবর যখন মুসলিম মুজাহিদদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ল, তখন তাঁরা বললেন, বনু আল-মুসতালিক তো এখন রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সম্মানিত শ্বশুরকুল। যে খান্দানে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিয়ে করেছেন। তাঁরা কখনো দাস-দাসী হতে পারে না। এরপর তাঁরা পরামর্শ করলেন এবং একজোট হয়ে এক সাথে সকল বন্দীকে মুক্ত করে দিলেন।[৬৭]

ইবনুল আসীর লিখেছেন, এই উপলক্ষ্যে বনু মুসতালিকের একশো বাড়ির সকল বন্দী মুক্তি পায়। ইমাম আবু দাউদ ও ইমাম আহমাদ হযরত আয়িশা রাযী আল্লাহু আনহা থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন[৬৮]

" আমি কোন নারীকে তার সম্প্রদায়ের জন্য জুওয়াইরিয়া থেকে অধিকতর কল্যাণময়ী দেখিনি। ইবন সা'দ হযরত জুওয়াইরিয়া রাযী আল্লাহু আনহা-এর দেনমোহর সম্পর্কে বলেছেন-[৬৯]

৬৭। ইবন সাদ, আত-তাবাকাত, ৮ম খন্ড, প্রাগুক্ত, পৃ-১১৬।

৬৮। ইবনুল আসীর, উসুদুল গাবা ফী মা'রিফাতিস সাহাবা (বৈরুতঃ দারু ইহইয়া আত-তুরাস আল আরাবী, ৫ম খন্ড, পৃ-৪২০)।

৬৯। ইমাম আজ-জাহাবী, ২য় খন্ড, প্রাগুক্ত, পৃ-২৬২।

Dhaka University Institutional Repository

বনু আল-মুসতালিক-এর প্রতিটি বন্দীর মুক্তি তার মোহর হিসেবে ধার্য হয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর সাথে হযরত জুওয়াইরিয়া রাযী আল্লাহু আনহা এর যে সময় বিয়ে হয় তখন তিনি মাত্র বিশ বছর বয়সের এক তরুণী। হযরত আয়িশা রাযী আল্লাহু আনহা প্রথম দর্শনেই তাঁকে যথেষ্ট রূপবতী এবং তাঁর চাল-চলন খুবই মিষ্টি-মধূর বলে মনে করেছেন। হযরত আয়িশা রাযী আল্লাহু আনহা তাঁর রূপ সৌন্দর্য বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন।[১০২]

"জুওয়াইরিয়ার মধ্যে মধুরতা ও ছলা কলা উভয় রকমের গুণ বিদ্যমান ছিল। কেউ তাঁকে দেখলেই তাঁর অন্তরে স্থান করে নিতেন। ইমাম আজ জাহারী বলেন "তিনি ছিলেন সেরা রূপবতী মহিলাদের একজন।"

তিনি ছিলেন খুবই ব্যক্তিত্বসম্পন্ন মহিলা। তাঁর মধ্যে ছিল সীমাহীন আত্মসম্মান বোধ।[৭১] হাদীসের একাধিক বর্ণনায় জানা যায় যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ম তাঁর কাছে এসে তাঁকে তাসবীহ ও তাহলীলে মশগুল দেখতে পেয়েছেন।

খলিফা ওমর রাযী আল্লাহু আনহু যখন ভাতা প্রচলন করলেন তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর স্ত্রীগণের মধ্যে সাফিয়্যা রাযী আল্লাহু আনহা ও জুওয়াইরিয়া রাযী আল্লাহু আনহা ব্যতীত অন্য সকলের জন্য বারো হাজার করে নির্ধারণ করলেন। তাঁদের দুই জনের জন্য করলেন ছয় হাজার করে। তাদের দুইজনের জীবনের এক পর্যায় দাসত্ব থাকার কারণে তিনি এমন করেন। কিন্তু তারা উমর রাযী আল্লাহু আনহু-এর আচরণে ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করলেন এবং ভাতা গ্রহণে অস্বীকৃতি জানালেন। তাঁরা সমতার দাবি জানালেন। উমার তাঁদের দাবি মানতে বাধ্য হলেন। অন্য একটি বর্ণনায় মায়মূনার রাযী আল্লাহু আনহার কথাও এসেছে এবং বারো হাজারের স্থলে দশ হাজার এসেছে।[৭২]

হাসীস বর্ণনা ঃ হযরত জুওয়াইরিয়া রাযী আল্লাহু আনহা রসূলের ৭টি হাদীস বর্ণনা করেছেন। তার মধ্যে ইমাম বুখারী একটি ও মুসলিম দুইটি হাদীস বর্ণনা করেছেন।[১০৬]

৭০। ইবনুল আসীর, ৫ম খন্ড, প্রাগুক্ত, পৃ-২২০।
৭১। ইমাম আজ-সাহাবী, ২য় খন্ড, প্রাগুক্ত, পৃ-২৬১।
৭২। ইউসুফ আল-কানধালুরী; হায়াতুস সাহাবা (দিসাযাক, দারুল কালাম, ২য় সংস্করণ, ১৯৮৩ খ্রিঃ) ২য় খন্ড, পৃ-২১৫।

Dhaka University Institutional Repository

হিজরী ৫ম সনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর সাথে বিয়ের সময় হযরত জুওয়াইরিয়া রাযী আল্লাহু আনহা-এর বয়স ছিল বিশ বছর। সঠিক মতানুযায়ী হিজরী ৫০ সনের রবিউল আওয়াল মাসে তিনি মদীনায় ইনতিকাল করেন। তখন তাঁর বয়স ৬৫ বছর। তৎকালীন মদীনার গভর্ণর মারওয়ান জানাযার নামাজ পড়ান। তাঁর কবর মদীনার আল-বাকী গোরস্তানে। মুহাম্মদ ইবন উমারের বর্ণনামতে তাঁর মৃত্যু সন হিজরী ৫৬ সালে।

অতঃপর বাদশাহ নাজ্জাশী শুরাহবীল ইবন হাসনার সাথে তাঁকে রসূলের খিদমতে প্রেরণ করলেন। হাদীসের বিভিন্ন গ্রন্থে হযরত উম্মু হাবীবা রাযী আল্লাহু আনহা-এর ৬৫টি হাদীস সংকলিত হয়েছে। তার মধ্যে দু'টি হাদীস ইমাম বুখারী এবং দুটি ইমাম মুসলিম এককভাবে বর্ণনা করেছেন। তাঁর সূত্রে যে সকল রাবী হাদীস বর্ণনা করেছেন তাঁদের সংখ্যাও একেবারে কম নয়। তাদের মধ্যে সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য কয়েকজন হলেন।

হাবীবার (কন্যা) মু'আবিয়া, উৎবা (আবু সুফইয়ানের দুই ছেলে) আব্দুল্লাহ ইবন উতবা, আবু সুফিয়ান ইবন সাঈদ সাকাদী, সালিম ইবন সাওয়ার, আবুল জাররাহ। সাফিয়া বিনত শায়ারা, যায়নাব বিনত উম্মু সালামা, উরওয়া ইবন যুবাইর, আবু সালিহ আস-সাম্মান, শাহর ইবন হাওশাব, আনবাসা, ওতাইব ইবন শাকাল, আবুল মালীহ, আমির আল-হুজালী প্রমুখ।[৭৩]

সপ্তম হিজরীতে তাঁর বিয়ে হয়। ৪৪ হিঃ তিনি মদীনায় পরলোকগমন করেন। মদীনাতেই তাঁকে দাফন করা হয়।[৭৪]

হযরত উম্মি হাবীবা রাযী আল্লাহু আনহা ঃ

হযরত উম্মি হাবীবা রাযী আল্লাহু আনহা মক্কার প্রসিদ্ধ সরদার আবু সুফাইয়ানের কন্যা ছিলেন। তাঁর প্রকৃত নাম ছিল রমলা।

৭৩। সিয়ারু আলাম আন-নুবালা; ২য় খন্ড, প্রাগুক্ত, পৃ-২৬৩, ২৭০ ও ২৯৯।
৭৪। শিবলী নু'মানী; প্রাগুক্ত, পৃ-৪১৬-৪১৮।

Dhaka University Institutional Repository

হাবশায় যাওয়ার পর উবায়দুল্লাহ খ্রীস্টান ধর্ম গ্রহণ করে এবং উম্মি হাবীবাকে পরিত্যাগ করে। এই নিরাশ্রয় অবলা মহিলার বিপদ সংবাদ জানতে পেরে রসূল হাদীস বিবাহ প্রস্তাব নিয়ে আমর যমরীকে হাবশার রাজা নাজ্জাশীর নিকট প্রেরণ করেন। নাজ্জাশী আবরাহা নামক তাঁর এক দাসীকে পাঠিয়ে দিয়ে হযরত উম্মি হাবীবাকে এ সংবাদ জানালেন। সংবাদ পেয়ে আনন্দের অতিশয্যে হযরত উম্মি হাবীবা তাঁর সকল অলংকার আবরাহকে পুরস্কার দিলেন এবং তার মামাতো ভাই খালিদ ইবন সাঈদকে বিয়ের উকিল বানিয়ে নাজ্জাশীর নিকট প্রেরণ করলেন।

সন্ধ্যার পর নাজ্জাশী হযরত জাফর ও অন্যান্য মুসলমানগণকে সমবেত করে তারে সম্মুখে বিয়ে পড়িয়ে দিলেন। তিনি নিজেই বিবাহের খুতবা পাঠ করলেন। এই বিবাহে তিনি চারশত দীনার (স্বর্ণমুদ্রা) মোহর নির্ধারিত করেন এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর তরফ হতে তিন নিজে বিবাহ মজলিশে উক্ত মোহর আদায় করে দেন। অতঃপর উপস্থিত লোকদেরকে ওলীমা ভোজনে আপ্যায়িত করেন।[৭৫]

হযরত সাফিয়্যা রাযী আল্লাহু আনহা ঃ

হযরত সাফিয়্যা হযরত হারুন (আঃ) এর বংশধর ছিলেন। তাঁর পিতার নাম ছিল হাযায ইবন আখতার। প্রথমে সাল্লাম ইবন মিশকাশের সাথে তাঁর বিয়ে হয়।[১১২] তারপর দ্বিতীয়বার কিনানার সাথে বিয়ে হয়। বিয়ের কয়েক দিন পর খায়বার যুদ্ধে তাঁর স্বামী, পিতা, ভ্রাতা সব নিহত হয় এবং তিনি মুসলমানদের হাতে বন্দী হন।[৭৬]

যখন সমস্ত কয়েদী একত্রিত করা হল তখন হযরত দিহয়াতুল কলবী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর নিকট একটি দাসী চাইলেন। তিনি বললেন-আচ্ছা, তুমি দেখে একজন দাসী নিয়ে যাও। হযরত দিহইয়া হযরত সফিয়্যাকে পছন্দ করলেন। তখন এক ব্যক্তি এসে বলল-হুযুর, যে মেয়েটি নবীবংশে জন্মগ্রহণ করেছে এবং নবীর ও কুলায়যা গোত্রের সরদারের কন্যা সে মেয়েটি আপনি দিহইয়াতুল কলবীকে দান করেছেন?[৭৭] রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত দিহইয়াতুল কলবী এবং হযরত সাফিয়্যাকে ডেকে আনলেন এবং হযরত সাফিয়্যার পরিবর্তে তাঁকে অন্য একটি দাসী দান করলেন। তৎপর তিনি হযরত সাফিয়্যাকে দাসত্ব হতে মুক্তি প্রদানপূর্বক বিয়ে করলেন।[৭৮]

৭৫। আহম্মদ ইবন হাম্বল, আল মুসনাদ, ৬ষ্ঠ খন্ড, পৃ-৪২৭।
৭৬। সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা, ২য় খন্ড, প্রাগুক্ত, পৃ-২৩১।
৭৭। সায়্যিদ 'আব্দুল্লাহ হাশিম' জম'উল ফাওয়াহিদ (মিসরঃ দারুত তালীফ, ১৯৬১ খ্রিঃ), ২য় খন্ড, পৃ-১৩৪।
৭৮। সহীহ আল-বুখারী, ৭ম খন্ড, পৃ-৩৬০।

Dhaka University Institutional Repository

খায়বার হতে ফিরার পথে সাহাবা নামক স্থানে এসে বিয়ের ওলীমা করলেন। অতঃপর তথা হতে মদীনা অভিমুখে যাত্রা করার সময় হযরত মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্দা করে উটের উপর আরোহণ করালেন। এতে লোকেরা বুঝতে পারল যে, হযরত সাফিয়্যা দাসী নয়; বরং রাসূলের পত্নী এবং উম্মুল মু'মিনীন।

৫০ হিজরীতে হযরত সাফিয়্যার ইন্তিকাল হয় এবং জান্নাতুল বাকী কবরস্থানে তাঁকে দাফন করা হয়।[৭৯]

হযরত মায়মূনা রাযী আল্লাহু আনহা ঃ

হযরত মায়মুনা রাযী আল্লাহু আনহা সম্ভ্রান্ত বংশের কন্যা। তাঁর পিতার নাম হারিস এবং মাতার নাম হিন্দ। বড় লুবাবা নামক তাঁর এক ভগ্নি হযরত আব্বাস রাযী আল্লাহু আনহু-এর স্ত্রী ছিলেন। ছোট লুবাবা নামক আর এক ভগ্নি হযরত খালিদ ইবন ওলীদের মাতা ছিলেন। আসমা বিনতে উমায়স নামক তাঁর এক বৈপিত্রেয় ভগ্নি হযরত জা'ফরের স্ত্রী ছিলেন। হযরত জাফর শহীদ হওয়ার পর হযরত আবু বকর রাযী আল্লাহু আনহু তাকে বিবাহ করেন। হযরত আবু বকরের মৃত্যুর পর হযরত আলী রাযী আল্লাহু আনহু তাকে বিয়ে করেন। সালমা বিনু মায়স নামক তাঁর আরেক বৈপিত্রেয় ভগ্নি হযরত হামযার স্ত্রী ছিলেন।

প্রথমে মাস'উদ সকফীর সাথে হযরত মায়মুনা রাযী আল্লাহু আনহা-এর বিবাহ হয়। অতঃপর আবু রুহম তাকে বিবাহ করে। আবু রুহমের মৃত্যুর পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে তাঁর বিয়ে হয়। ইহাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর শেষ বিবাহ। হযরত আব্বাস রাযী আল্লাহু আনহাও বিবাহের প্রস্তাব দেন এবং তিনিই বিয়ে পড়ান।[৮০]

কাযা উমরার সময় সরফ নামক স্থানে বিয়ে হয়। এখানে স্ত্রীর সাথে তাঁর মিলন হয়। ৫১ হিজরীতে উক্ত সরফেই তাঁর মৃত্যু হয়। এখানেই তাঁকে দাফন করা হয়। হযরত আব্দুল্লাহ ইবন আব্বাস তাঁর জানাযা পড়ান এবং তাঁকে কবরে রাখেন। হযরত আব্দুল্লাহ তাঁর ভাগ্নে ছিলেন।[৮১]

৭৯। সায়্যিদ 'আব্দুল্লাহ হাশিম, প্রাগুক্ত, পৃ-১৩৫-১৩৬।
৮০। মুহাম্মদ ইবন সা'আদ, প্রাগুক্ত, পৃ-৯৪।
৮১। ইবন সায়্যিদুন্নাস, প্রাগুক্ত, পৃ-৩০৮-৩০৯।

Dhaka University Institutional Repository

হযরত ফাতিমাতুয যাহরা রাযী আল্লাহু আনহা ঃ

তাঁর নাম ফাতিমা এবং যাহ্‌রা তাঁর উপাধি। তাঁর জন্ম তারিখ সম্পর্কে ঐতিহাসিকদের মতভেদ আছে। এক বর্ণনা মতে নবুয়তের প্রথম বছর, অপর রিওয়ায়েত নবুওয়াতের পাঁচ বছর পূর্বে, আরেক রিওয়ায়েত এক বছর পূর্বে জন্মগ্রহণ করেন।[৮২]

শৈশব ঃ "আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসউদ রাযী আল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাবার নিকটে দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করছিলেন। আর কুরায়েশের একটি দল মজলিশ জমিয়ে বসেছিল। এমন সময় তাদের একজন বলল ঃ তোমরা কি এই রিয়াকারীকে দেখনি? তোমাদের এমন কে আছে যে অমুক গোত্রের উট জবাই করার স্থান পর্যন্ত যেতে রাজি? সেখান থেকে গোবর, রক্ত ও নাড়িভূঁড়ি নিয়ে অপেক্ষায় থাকবে। যখন সে সিজদায় যাবে, তখনই এগুলো তার ঘাড়ে চাপিয়ে দেবে। এ কাজের জন্য তাদের চরম হতভাগ্য ব্যক্তি (উক্‌বা ইব্‌ন আবু মু'আইত) উঠে দাঁড়াল এবং (তা নিয়ে এলো)। যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সিজদায় গেলেন, সে তাঁর দু'কাধের মাঝখানে সেগুলো রেখে দিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সিজদায় স্থির রয়ে গেলেন। এতে তারা হাসাহাসি করতে লাগল। এমনকি হাসতে হাসতে একজন আরেকজনের গায়ের উপর লুটিয়ে পড়তে লাগল। (এ অবস্থা দেখে) এক ব্যক্তি ফাতিমা রাযী আল্লাহু আনহা এর কাছে গেল। তখন তিনি ছোট বালিকা মাত্র ছিলেন। তিনি দৌড়ে চলে এলেন। তখনও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সিজদারত ছিলেন। ফাতিমা রাযী আল্লাহু আনহা সেগুলো তাঁর উপর থেকে ফেলে দিলেন এবং মুশরিকদের লক্ষ্য করে গালমন্দ দিতে লাগলেন।[৮৩] (বুখারী ও মুসলিম)।

দ্বিতীয় হিজরীতে আঠার বছর বয়সে আলী রাযী আল্লাহু আনহু এর সাথে তাঁর বিয়ে হয়।[৮৪] হযরত আলী তাঁর বর্মটি হযরত উসমান রাযী আল্লাহু আনহু-এর নিকট চারশত আশি দিরহামে বিক্রয় করলেন এবং সকল দিরহাম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর হাতে সমর্পন করলেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিয়ের আয়োজন করলেন এবং যথাসময়ে বিবাহ সম্পন্ন হয়ে গেল।[৮৫]

৮২। ড. মুজতবা হোসাইন, প্রাগুক্ত, পৃ-৯৯০।
৮৩। সহীহ বুখারী, ২য় খন্ড, পৃ-১৪১; সহীহ মুসলিম, ৫ম খন্ড, পৃ-১৭৯।
৮৪। মুহাম্মদ নুরুয্যামান, প্রাগুক্ত, পৃ-১১৯।
৮৫। ড. মুজতবা হোসাইন, প্রাগুক্ত, পৃ-৯৯১।

Dhaka University Institutional Repository

যৌবনে ঃ সাহল রাযী আল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তাঁকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওহুদের দিনের যখম সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুখমন্ডলে আঘাত পেয়েছিলেন। তাঁর সামনের দাঁত ভেঙ্গে গিয়েছিল এবং শিরস্ত্রাণ ও ভেঙ্গে গিয়েছিল। হযরত আলী রাযী আল্লাহু আনহু পানি ঢেলে দিচ্ছিলেন, আর ফাতিমা রাযী আল্লাহু আনহা রক্ত ধুয়ে পরিস্কার করেছিলেন। রক্তক্ষরণ ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে দেখে তিনি (ফাতিমা) একটি চাটাই জ্বালিয়ে ছাই বানালেন এবং তা ক্ষতস্থানে লাগিয়ে দিলেন। এরপর রক্তক্ষরণ বন্ধ হয়ে গেল।[৮৬] (বুখারী ও মুসলিম)।

হযরত ফাতিমা জীবিত থাকতে হযরত আলী রাযী আল্লাহু আনহু অন্য কোন বিয়ে করেননি। হযরত হাসান, হযরত হুসাইন, হযরত মুহসিন, হযরত উম্মি কুলসুম ও হযরত যয়নব, এই পাঁচ সন্তান হযরত ফাতিমার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। হযরত মুহসিন শিশুকালেই ইহলোক পরিত্যাগ করেন। চারজন ইসলামের ইতিহাসে বিখ্যাত। রসূলের সন্তানগণের মধ্যে একমাত্র হযরত ফাতিমা রাযী আল্লাহু আনহা-এর সন্তান-সন্ততি বংশ পরম্পরাই বিদ্যমান আছে। এই বংশে বহু নামজাদা ওলী, বুযুর্গ ও ইমাম জন্মগ্রহণ করেছেন।[৮৭]

সহনশীলতা ও গৃহ পরিচর্যা

"আলী রাযী আল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, ফাতিমা হাত দিয়ে যাঁতা ঘুরানোর ফলে হাতে ফোসকা পড়ে যাওয়ার অভিযোগ দিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর কাছে এলেন। ফাতিমা জানতে পেরেছিলেন তাঁর কাছে কিছু গোলাম এসেছে। কিন্তু তার সাথে ফাতিমার দেখা হলো না। তিনি আয়িশা রাযী আল্লাহু আনহাকে ঘটনা বলে চলে গেলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাড়িতে এলে আয়িশা রাযী আল্লাহু আনহা তাঁকে সে সম্পর্কে অবহিত করলেন। আলী বলেন, তিনি আমাদের কাছে এমন সময় এলেন যখন আমরা ঘুমের জন্য শুয়ে পড়েছি। আমরা উঠতে যাচ্ছিলাম, কিন্তু তিনি বললেনঃ তোমরা আমার কাছে যা চেয়েছ তার চেয়েও কল্যাণকর জিনিসের কথা কি তোমাদের বলে দেব? যখন তোমরা বিছানায় যাও, তেত্রিশবার "সুবহানাল্লাহ" তেত্রিশবার "আলহামদুলিল্লাহ" এবং চৌত্রিশবার "আল্লাহু আকবার" পড়বে। এটা তোমাদের উভয়ের জন্য খাদেমের চেয়েও উত্তম।[৮৮]

৮৬। সহীহ বুখারী, ৬/৪৩৭; সহীহ মুসলিম ৫/১৭৮।
৮৭। ড. মুজতবা হোসাইন, প্রাগুক্ত, পৃ-৯৯১।
৮৮। সহীহ বুখারী, ১১/৪৩৩; সহীহ মুসলিম, প্রাগুক্ত, ৮/৮৪।

Dhaka University Institutional Repository

ফাতেমা রাযী আল্লাহু আনহা-এর মর্যাদা

"মিসওয়ার ইবন মাখরামা রাযী আল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ ফাতিমা রাযী আল্লাহু আনহা আমার দেহের একটি টুকরা। যে তাকে রাগান্বিত করল সে নিশ্চয়ই আমাকে রাগান্বিত করল।"[৮৯]

"আয়িশা রাযী আল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মৃত্যু পীড়ায় আক্রান্ত হন তখন একদিন তাঁর কন্যা ফাতেমা রাযী আল্লাহু আনহাকে ডেকে পাঠান এবং চুপিচুপি তাকে কিছু বলেন। তখন ফাতেমা রাযী আল্লাহু আনহা কেঁদে ফেললেন। তার পর আবার তাকে ডেকে পাঠান এবং চুপিচুপি তাকে কিছু বলেন। তখন তিনি হেসে ফেলেন। আয়িশা রাযী আল্লাহু আনহা বলেন ঃ আমি এ ব্যাপারে ফাতেমাকে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, (প্রথমবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামাম চুপিচুপি আমাকে এ খবরটি দিলেন যে, ঐ অসুখেই তিনি ইনতিকাল করবেন, যে অসুখে তিনি ওফাত পেয়েছেন। তখন আমি কেঁদে ফেললাম। তারপর (দ্বিতীয়বার) তিনি চুপিচুপি আমাকে এ খবরটি দিলেন যে, তার পরিজনদের মধ্যে আমিই সর্বপ্রথম তাঁর পশ্চাৎগামী হব। তখন আমি হেসে ফেললাম।[৯০]

ওফাত ঃ

হযরত ফাতিমা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছয়মাস পরে একাদশ হিজরীতে ইহলোক পরিত্যাগ করত জান্নাতবাসী পিতার সাথে মিলিত হন। তাঁর অসিয়্যত অনুযায়ী হযরত আবু বকরের রাযী আল্লাহু আনহু স্ত্রী হযরত আসমা বিনত উমায়স এবং হযরত আলী রাযী আল্লাহু আনহু স্ত্রী হযরত আসমা বিনত উমায়স এবং হযরত আলী রাযী আল্লাহু আনহু তাঁকে গোসল দেন। হযরত আব্বাস রাযী আল্লাহু আনহু মতান্তরে হযরত আলী রাযী আল্লাহু আনহু তাঁর জানাযা পড়ান।[৯১]

৮৯। সহীহ বুখারী, ৩য় খন্ড, প্রাগুক্ত, পৃ-৫৬৮।
৯০। সহীহ বুখারী, প্রাগুক্ত, পৃ-৫৮৬।
৯১। শিবলী নু'মানী, প্রাগুক্ত, পৃ-৪২৬-৪২৮।

Dhaka University Institutional Repository

উম্মি আম্মার বিনতে কা'ব

উম্মি আম্মারা রাযী আল্লাহু আনহা-এর আসল নাম নুসাইবা। তাঁর পিতার নাম কা'ব বিন আমর। বংশ পর পরম্পরা হল নুসাইবা বিনতে কা'ব বিন আমর বিন আওফ বিন মারযুল বিন আমর বিন গানম বিন মাযান বিন নাজ্জার। তিনি সপীনার মশহুর খাজরাজ গোত্রের বনু নাজ্জার শাখায় জন্মগ্রহণ করেন।

নিকাহ

যায়েদ বিন আসিসের সঙ্গে তার প্রথম বিবাহ অনুষ্ঠিত হয়। দ্বিতীয় বিবাহ হয় আবরা বিন আমরের সঙ্গে। তিনি মোট চারটা সন্তান গর্ভে ধারণ করেছিলেন। এদের দু'জন প্রথম স্বামীর ঔরসজাত। সন্তানদের নাম হাবীব, আব্দুল্লাহ, তাসিম ও খাওয়াসা।

ইসলাম কবুল

উম্মি আম্মার ও তাঁর খান্দানের লোকেরা রসূলের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে ইসলাম কবুল করলেন। ইসলাম গ্রহণের পর হজ্জের মওসুমে উম্মি আম্মার রাযী আল্লাহু আনহা ও তাঁর স্বামী আবরা বিন আমরও রওয়ানা হলেন ৭২ জন নও মুসলমানদের সঙ্গে মক্কায় যিয়ারতের জন্য। তের নববী সনে ১২ই জিলহজ্জ গভীর রাত্রে আকাবার পাদদেশে গোপন কেন্দ্রে আল্লাহর রসূলের সাক্ষাত পেলেন। মদীদার মুসলমানরা আল্লাহর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে বাইয়াত করলেন।[৯২]

ওহুদের যুদ্ধ

মুসলমান ও কাফেরদের মধ্যে সংঘটিত যুদ্ধের মধ্যে অন্যতম হলো ওহুদের যুদ্ধ। এই যুদ্ধে মহানবী মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওহুদ পর্বতের পাদদেশে ৫০ জন তিরন্দাজ মুসলমানদের একটি দল নিয়োগ করলেন। পশ্চাৎ দিক থেকে শত্রুপক্ষ আক্রমণের জন্য ধাবিত হলো তাদের প্রতিরোধ করার জন্য নির্দেশ দিলেন। দ্বিতীয় হুকুম না দেয়া পর্যন্ত স্থান ত্যাগ করতে তাদের বারণ করলেন।

৯২। মুহাম্মদ নুরুয যামান, প্রাগুক্ত, পৃ-১৭৭-১৭৮।

Dhaka University Institutional Repository

যুদ্ধ শুরু হল। আল্লাহর পথে জীবন উৎসর্গকারী মুসলিম বাহিনীরই জয় হল প্রথমে। বিজয় সংকেত আল্লাহু আকবর ধ্বনি শুনে তীর নিক্ষেপকারীগণ আনন্দে আত্মহারা হয়ে গেলেন। অনাকাঙ্খিতভাবে নিজেদের কর্তব্য ভুলে গিয়ে তারা যুদ্ধের পরিত্যক্ত সম্পদ সংগ্রহে লেগে গেলেন। অরক্ষিত মুসলমানদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন কাফিররা। এ যুদ্ধে বহু সাহাবী শাহাদাত বরণ করেন। এদিকে মুসলিম বাহিনীর বিশৃঙ্খলার সুযোগে পেছনের পথ অরক্ষিত পেয়ে খালিদ তার সৈন্য নিয়ে অপ্রস্তুত মুসলমানদের উপর হামলা করে বসলেন। শুরু হল, রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম, এবার সম্পূর্ণরূপে যুদ্ধের মোড় ঘুরে গেল। মুসলমানগণ দর্বল হয়ে পড়লেন। বীর হামযা, আনাস রাযী আল্লাহু আনহু, আমীর হামযা রাযী আল্লাহু আনহু প্রমুখ প্রখ্যাত সাহাবীগণ শহীদ হলেন। কাফেররা চতুর্দিক থেকে মহানবীর উপর ঝাঁপিয়ে পড়তে লাগল। তারা হুংকার ছাড়তে লাগল ঃ কোথায় মুহাম্মদ, তার সন্ধান কেউ বলে দেবে। সে বেঁচে থাকলে আমাদের নিস্তার নেই।[৯৩]

ওহুদের যুদ্ধে উম্মি আম্মারা রাযী আল্লাহু আনহা-এর পুত্র আব্দুল্লাহ আহত হন। তাঁর বাহু থেকে অবিরাম রক্ত ঝরছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাত ব্যান্ডেজ করার জন্য উম্মি আম্মারকে আদেশ করলেন। ব্যান্ডেজ করার পর উম্মি আম্মার নির্ভীকভাবে আদেশ দিলেন ঃ যাও কাফিরদের সাথে লড়।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার আদর্শ দেখে খুব প্রীত হয়েছিলেন। কয়েকবার আল্লাহর কাছে দোয়া করলেন তিনি। তাকে উদ্দেশ্য করে বললেন ঃ এমন সাহস কার আছে? উম্মি আম্মারা রাযী আল্লাহু আনহা একটু পরেই পুত্রের আঘাতের প্রতিশোধ গ্রহণ করার সুযোগ পেলেন এবং পুত্রের প্রতিশোধ গ্রহণ করলেন। আঘাত কারীকে তলোয়ারের আঘাতে দু টুকরো করে দিলেন।[৯৪]

448487

ইবনে কামিয়ার সাথে যুদ্ধ

আরবের মাশহুর অশ্বারোহী ইবনে কামিয়ার সাথে ওহুদ প্রান্তরে উম্মি আম্মারের যে যুদ্ধ সংঘটিত হয় তা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। দূর থেকে আল্লাহর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দু'টি দাঁত শহীদ হয়। এ ঘটনা সংঘটিত হওয়ার পর আল্লাহর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লা -এর হেফাযতকারী সাহাবী সৈনিকগণ সম্ভবতঃ আল্লাহর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন।

৯৩। ইবনুল কায়িস আল জাওযী, ২য় খন্ড, প্রাগুক্ত, পৃ-৯৩-৯৬।
৯৪। মুহাম্মদ নুরুযযামান, প্রাগুক্ত, পৃ-১৮০-১৮১।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

ইবনে কামিয়া এ সুযোগ গ্রহণ করে খুব ক্ষিপ্রগতিতে আল্লাহর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর খুব সন্নিকটে পৌঁছে তাকে আক্রমন করে। এ হামলাতে আল্লাহর রসূলের চেহারা মোবারক আহত হয় এবং তা থেকে রক্তের ধারা প্রবাহিত হয়। যা দেখে সাহাবায়ে কিরাম খুব পেরেশান হন। এ দুর্যোগ লগ্নে উম্মি আম্মারা রাযী আল্লাহু আনহা ইবনে কামিয়াকে হত্যা করার সংকল্প নেন। আল্লাহর ওপর ভরসা করে তিনি সম্মুখে অগ্রসর হন এবং তার গতি প্রতিরোধ করেন। ক্ষিপ্র গতিতে তিনি তাকে তলোয়ার দিয়ে আক্রমন করেন। কিন্তু আল্লাহর দুশমন সুদৃঢ় বর্ম পরিহিত থাকার কারণে উম্মি আম্মারার তলোয়ার ভেংগে যায়। সে উম্মি আম্মারা রাযী আল্লাহু আনহাকে পাল্টা আক্রমন করে । সে তাঁর কাঁধে মারাত্মকভাবে জখম করে। উম্মি আম্মারা ভাংগা তলোয়ার দিয়ে শত্রুর মুকাবিলা করলেন। বেশিক্ষণ ইবনে কামিয়া দৃঢ়পদ থাকতে পারল না। সে ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে যুদ্ধের ময়দান থেকে পালিয়ে গেল।

যুদ্ধের পরও আল্লাহর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উম্মি আম্মারার বীরত্বের কথা সাহাবায়ে কিরামকে বলতেন, উম্মে আম্মারা রাযী আল্লাহু আনহা-এর শরীরে ওহুদের যুদ্ধে কমপক্ষে বারটি আঘাতের চিহ্ন ছিল।

উম্মি আম্মারা বর্ণনা করেন ঃ আমি ওহুদের দিন লোকজন কি করছে তা দেখার জন্য বের হলাম। আমি আহতদেরকে পানি পান করাচ্ছিলাম। আমি আখেরী নবী হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর নিকট পৌঁছলাম, তখন তিনি তার সাহাবাদের ভীড়ের মধ্যে ছিলেন। সে সময় পর্যন্ত মুসলমানদের পাল্লা ভারী ছিল। কিন্তু যখন মুসলমানগণ পরাজিত হলেন তখন আমি তার চারদিকে যুদ্ধ করতে লাগলাম।[৯৫]

আমার তলোয়ার দ্বারা তাকে রক্ষা করতে লাগলাম। শত্রুগণ তাঁর নিক্ষেপ করতে লাগল। একটি তীর আমাকে আঘাত করলে আমি আহত হলাম। ইবনে কামিয়া আমার ওপর তীর নিক্ষেপ করেছিল। ঘটনা এভাবে ঘটেছিল, লোকজন পেছনে ছিল। ইবনে কামিয়া সামনে অগ্রসর হয়ে জিজ্ঞেস করল, মুহাম্মদ কোথায়? তিনি যদি বেঁচে যান তা হলে আমার নিস্তার নেই। তখন মাসআব বিন আসির এবং আমি তার মুকাবিলা করতে থাকি। সে তীর নিক্ষেপ করতে আমাকে আহত করে, আমিও প্রতিশোধ গ্রহণ করার জন্য বারবার তাকে আক্রমন করি। কিন্তু আল্লাহর দুশমনের শরীরে দুটো বর্ম ছিল।

৯৫। মুহাম্মদ নুরুযযামান, প্রাগুক্ত, পৃ-১৮১।

Dhaka University Institutional Repository

অসীম সাহসিকতা, অতুলনীয় খেদমত এবং অনুপম নিষ্ঠার জন্য উম্মি আম্মারা রাযী আল্লাহু আনহা সর্বযুগের ও সর্বকালের সচেতন ও সংগ্রামী মানুষের আদর্শ হয়ে থাকবেন।[৯৬]

খাওলা বিনতে সা'লাবা

বনি আওস গোত্রে খাওলা বিনতে সা'লাবার জন্ম। তিন রিসালাতে মুহাম্মদীতে বিশ্বাস স্থান করে নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বাইয়াত করার সৌভাগ্য অর্জন করেছিলেনল। খাওলা রাযী আল্লাহু আনহা-এর স্বামী আওস বিন সামিতের আচরণে একটু কঠোরতা ছিল, মেজাজ ছিল কর্কশ। একদিন স্ত্রীর উপর অসন্তুষ্ঠ হয়ে বললেন। " তোমার পৃষ্যদেশ আমার মা'র মত।"

খাওলা রসূলের দরবারে এ ঘটনা বর্ণনা করার উদ্দেশ্যে গেলেন তিনি বলেন, "হে আল্লাহর রসূল! আউস ইবন সামিত আমার স্বামী। আমার সারাটা যৌবন তার কাছেই কেটেছে এবং আমি গর্ভবতীও হয়েছি। বর্তমানে যখন বার্ধক্যে উপনীত হয়েছি, আমার শরীর দুর্বল হয়ে গেছে, এমন পরিস্থিতিতে তিনি আমার সাথে "যিহার" করেছেন।[৯৭]

হে আল্লাহর রসূল! তার ঔরসে আমার গর্ভজাত কয়েকজন সন্তান রয়েছে। তাদেরকে তার কাছে দিলে যত্নের অভাবে তারা ধ্বংস হয়ে যাবে। আর তাদেরকে আমার কাছে রাখলে তারা অনাহারে কাটাবে। এরপর খাওলা রাযী আল্লাহু আনহা মাথা তুলে আল্লাহর দরবারে অভিযোগ করতে থাকলেন। এরই সাথে আল্লাহ তা'আলা সূরা মুজাদালা অবতীর্ণ করেন। আল্লাহ অবশ্যই শুনিয়াছেন সেই নারীর কথা, যে তাহার স্বামীর বিষয়ে তোমার সহিত বাদানুবাদ করিতেছে এবং আল্লাহর নিকটও ফরিয়াদ করিতেছে। আল্লাহ তোমাদের কথোপকথন শোনেন, আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা।[৯৮]

উমর রাযী আল্লাহু আনহু-এর খিলাফাতকালে একদিন তিনি একদল লোকের সাথে কোথাও যাচ্ছিলেন। পথিমধ্যে খাওলা রাযী আল্লাহু আনহা সামনে এসে উমর রাযী আল্লাহু আনহুকে থামিয়ে উপদেশের স্বরে বললেন ঃ উমর! তুমি এক সময় ছোট্ট শিশু ছিলে, এরপর পূর্ণবয়স্ক উমরে রূপান্তরিত হলে, আর বর্তমানে আমীরুল মু'মিনীন হিসেবে অধিষ্ঠিত। তাই যে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় কর। যে ব্যক্তি মৃত্যুকে বিশ্বাস করে, সে কোন বিষয় যাতে বাদ না পড়ে সেদিকে সতর্ক থাকে। আর যে ব্যক্তি হিসেবে দিবসকে বিশ্বাস করে, সে শাস্তিকে ভয় করে।"

৯৬। শেখ মুহাম্মদ রেজা; মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ (মিসর), পৃ-২০৫।

৯৭। মুহাম্মদ সায়্যিদ আস-সাক্বাতী, অনুবাদ মাহমুদুল হাসান ইউসুফ, মুসলিম নারী প্রসঙ্গ, ঢাকাঃ দারুল ইহসান বিশ্ববিদ্যালয়, মে, ২০০০ খ্রিঃ পৃ-৮১।

৯৮। আল-কুরআন, ৫৮ঃ১।

Dhaka University Institutional Repository

এ সময় উপস্থিত কেউ কেউ খাওলা রাযী আল্লাহু আনহা থেকে এই বলে বাধা দিতে চাইলেন যে, আপনি শুধু শুধু দেরী করাচ্ছেন, তিনি প্রশাসনিক কাজে খুবই ব্যস্ত আছেন। উমর রাযী আল্লাহু আনহু তাদেরকে বললেন ঃ আপনারা চুপ করুন। আল্লাহর শপথ করে বলছি, তিনি যদি আজকে সারাদিন আমাকে আগলে রাখেন, তবু আমি ফরয সালাতের সময়টুকু ছাড়া সবটুকু সময় তাকে দিতে বাধ্য। আপনারা কি এ বৃদ্ধাকে চেনেন? তিনি তো খাওলা বিনত সালাবা যার কথা আল্লাহ তা'আলা সপ্ত আকাশের উপর থেকে শুনেছেন, আল্লাহ তাআলা তাঁর কথা শুনেছেন, আর উমর তাঁর কথা শুনবে না।?''[৯৯]

সুমাইয়া বিনতে খাবাত ঃ

হযরত সুমাইয়ার রাযী আল্লাহু আনহা-এর পিতার নাম ছিল খাবাত। তিনি ছিলেন আবু হুযায়ফা বিন মুগীরা মখজুমীর কৃতদাসী। চিন্তা ও বিবেক বুদ্ধির দিক থেকে তিনি আরবের যে কোন শরীফ খান্দানের মহিলার চেয়ে কোন অংশে কম ছিলেন না। তিনি ছিলেন সাহাবী হযরত আম্মার রাযী আল্লাহু আনহু [১০০] এর মাতা। আম্মার জন্মগ্রহণ করলে আবু হোযায়ফা সুমাইয়া রাযী আল্লাহু আনহাকে আযাদ করে দেন।

আম্মার বিন ইয়াসীরের মাতা সুমাইয়া মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রিসালাতে আস্থা স্থাপন করে মুসলমানদের সংখ্যা সাত এ উন্নিত করেন। তিনি ইসলামী সমাজের গোড়া পত্তনের সংগ্রামে যেভাবে ধৈর্য ও সহিষ্ণুতার সংগে নিজেকে তিলে তিলে বিলিয়ে দিয়েছিলেন তার নজির দুনিয়ায় বিরল।

তিনি স্বামী পুত্রসহ ইসলাম কবুল করলে শত্রুদের নির্মম নির্যাতনের শিকার হন। নির্যাতন ভোগ করে স্বামী ইয়াসির ইনতিকাল করলেন। কিন্তু এতেও সুমাইয়া রাযী আল্লাহু আনহা বিন্দুমাত্র দমিত হলেন না। মক্কার নরপিশাচ দল সুমাইয়া রাযী আল্লাহু আনহাকে তপ্ত বালুরাশির উপর শুইয়ে রাখত। মাথার উপর প্রতীপ্ত সূর্য এবং নিচে তপ্ত বালুরাশির মধ্যে ঘন্টার পর ঘন্টা কেটে যেতে।

৯৯। তাফসীর কুরতুবী, ১৭/২৬৯; তাফসীর ইবন কাছীর, ৮/৬০-৬১।

১০০। শায়খ ওয়ালী উদ্দিন আবু আব্দুল্লাহ আল-খতীব (র), অনুবাদঃ এস. আফলাতুন কায়সার, ''আসমাউর রিজাল'', ঢাকাঃ এমদাদিয়া লাইব্রেরী, পৃ-৯৫।

Dhaka University Institutional Repository

সন্ধ্যা বেলা তাকে গৃহে ফিরে আনা হত। নতুন আদর্শে বিশ্বাস স্থাপন করার বিষয়টি আরও চিন্তা ভাবনা করে দেখার জন্য রাতের বেলা তাকে ফুরসত দেয়া হত। পরদিন তার কাছে এসে তাদের আশা ভংগ হত। ক্রোধে ফেটে পড়ত অবিশ্বাসীর দল। আল্লাহর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর নির্যাতন দেখে খুব কষ্ট পেতেন। বেহেশতের সুসংবাদ তাকে প্রদান করতেন। হে ইয়াসির পরিবার এর বদলে তোমাদের জন্য বেহেশত রয়েছে।

দিনান্তে নির্যাতন ভোগ করে সুমাইয়া রাযী আল্লাহু আনহা তাঁর পর্ণ কুটিরে ফিরেছেন। আবু জেহেল তার ঘরে এসে অকট্য ভাষায় গালাগালি শুরু করে দিল। কিন্তু এতেও তার রাগ প্রশমিত না হওয়ায় একটা বর্শা হাতে নিয়ে তাকে আঘাত করল। সুমাইয়া রাযী আল্লাহু আনহা এর বুকের তাজা খুব ঝড়ে পড়ল মাটিতে দুশমনের খঞ্জরের আঘাতে। হিজরতের পূর্বেই এ ঘটনা সংঘটিত হয়েছিল এবং সুমাইয়া রাযী আল্লাহু আনহা আল্লাহর রসূলের অনুসারীরে মধ্যে প্রথম শহীদ হন।[১০১]

আসমা বিনতে আবু বকর রাযী আল্লাহু আনহা ঃ

আসমা রাযী আল্লাহু আনহা প্রথম খলিফা আবু বকর রাযী আল্লাহু আনহু-এর কন্যা। তাঁর মায়ের নাম কাতিলা বিনতে আবদুল উযযা, যিনি কুরায়শদের অন্যতম প্রভাবশালী নেতা ছিলেন। তিনি উম্মুল মুমিনীন আয়িশার রাযী আল্লাহু আনহার সৎবোন ছিলেন। যুবায়ার বিন আওয়ারেম সাথে তার বিবাহ সম্পাদিত হয়।[১০২]

তিনি উত্তমভাবে গৃহ পরিচর্যা করতেন। তিনি স্বামীর নিবিড় সংস্পর্শে থাকতেন।[১০৩] আল্লাহর পথে তিনি অকাতরে অর্থ দান করতেন।[১০৪]

১০১। মুহাম্মদ নুরুযযামান, প্রাগুক্ত, পৃ-৩৫৩।
১০২। আসমাউর রিজাল, প্রাগুক্ত, পৃ-৪২।
১০৩। সহীহ বুখারী, প্রাগুক্ত, ১১/২৩৪।
১০৪। সহীহ মুসলিম, প্রাগুক্ত, ৭/১২।
১০৫। সহীম মুসলিম, ৪র্থ খন্ড, পৃ-৫৫।

Dhaka University Institutional Repository

নবুওয়াতের নবারুনকে যারা গোড়াতেই সমর্থন জানিয়ে ছিলেন আবু বকর তনয়া আসমা রাযী আল্লাহু আনহা তাঁদের মধ্যে অন্যতমা। সমকালীন আরব সমাজের প্রতিবন্ধকতা উপেক্ষা করে আবু বকরের কন্যা যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিপ্লবী দলে যোগদান করেন, তখন মুসলমানদের সংখ্যা উনিশের কোটা পার হয়নি। দীর্ঘদিন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বিশ্বস্ত সহচরের তত্ত্বাবধানে থেকে তিনি যে নিখুঁত চরিত্র গঠন করেছিলেন। তাই জীবনের শেষ প্রান্তে ও তাঁর মনে শক্তি, সাহস এবং বিশ্বাসের অনির্বাণ দ্বীপ-শিখা জ্বালিয়ে রেখেছিলেন।

ইবাদাত ও জ্ঞানার্জনের প্রতি তাঁর একান্ত আগ্রহ ছিল। তিনি ছিলেন অপরিসীম জ্ঞান ও প্রজ্ঞার অধিকারী। তিনি ছিলেন প্রসিদ্ধ সাহাবী হযরত আব্দুল্লাহ ইবন যুবায়র রাযী আল্লাহু আনহু আব্দুল্লাহ ইবন যুবায়র রাযী আল্লাহু আনহু-এর মাতা।[১০৫]

১০৫। সহীম মুসলিম, ৪র্থ খন্ড, পৃ-৫৫।

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ অধ্যায়

নারীমুক্তি আন্দোলন ও আধুনিক মতামত

Dhaka University Institutional Repository

নারীমুক্তি আন্দোলন ও আধুনিক মতামত

শান্তি প্রাপ্তির পূর্বশর্ত হল স্বাধীনতা। এ স্বাধীনতা কাকে বলে, কখন মানুষ প্রকৃতভাবে স্বাধীন হয় তা সম্যক জানা দরকার। স্বাধীনতা অর্থ স্ব-অধীনতা অর্থাৎ নিজের অধীনে নিজে থাকাকে স্বাধীনতা বলে। অর্থাৎ অন্যের অধিকার ও হক নষ্ট না করে, ক্ষুন্ন না করে নিজের অধিকার ও প্রাপ্তি পূর্ণরূপে পাবার সুনিশ্চিত গ্যারান্টিকে স্বাধীনতা বলে। কোন দেশের অধীন হলে মানুষ পরাধীন হয়, কোন ব্যক্তির গোলামী করলে, কারো কাছে ক্রীত হলে মানুষ পরাধীন হয়-তার চেয়েও বড় ও কঠিন পরাধীনতা হল আদর্শহীন মতবাদ, অযৌক্তিক ভূয়া খোদার গোলামী করা। বিবেকহীন নাফস, অন্ধ স্বার্থপরতা, সুনাম সুখ্যাতির আকাঙ্কা, অধিক প্রাপ্তির লোভ ও লালসা মানুষকে পশু থেকে অধম করে তোলে। তার কোন স্বাধীনতা থাকে না। কোন প্রকৃত স্বাধীন ব্যক্তি মিথ্যা বলতে পারে না। জীব জানোয়ারের গলা থেকে রশি খুলে দিলেই সে স্বাধীন হয় না। তার পাশবিক গুণাবলীর সে গোলাম। অনুরূপ পশু প্রকৃতির মানুষ স্ব-পরাধীন; আর এটাই হল সবচেয়ে নিকৃষ্ট পরাধীনতা। স্বাধীনতা যেমন দুনিয়ার মধ্যে সর্বোৎকৃষ্ট সম্পদ, স্ব-পরাধীনতা তেমনি সর্বনিকৃষ্ট সম্পদ। এ অবস্থা বিরাজিত থাকা অবস্থায় শান্তির আশা নতুন এক সূর্য সৃষ্টির মতই দূরাশা মাত্র।

পরম করুণাময় বিশ্ব জাহানের মহান স্রষ্টা ও অধিপতি আল্লাহ্ পাক তাই দুনিয়ার মানুষকে মৌলিক স্বাধীনতা অর্জনের জন্য প্রথম আহবান জানিয়ে বলেন, বল, আমার কোন হুকুমদাতা, আইনদাতা নেই, নেই আমার দেহমনে, পরিবারে, সমাজ-রাষ্ট্র আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে, নেই সম্পদ-সম্পত্তিতে কোন রকম রেওয়াজ নিয়ম নীতিতে, নেই পৃথিবীতে, নেই আকাশে বাতাসে, সাগরে, নেই ফেরেশতা মানব দানব-শয়তানের সমাজে; আমি কারো হুকুম, কারো আইন মানি না। আমি মানুষ, আমি মহান, আমি বড়, আমি তুলনাহীন; আমার ত্রি জগতে কেউ নেই।

ইল্লাল্লাহু-আল্লাহ ব্যতীত। আমি তাঁর হুকুম মানি, যাঁর আদেশ মানি, যাঁর আদেশ-নিষেধ নির্দেশ মানতে বাধ্য, তাঁর নাম আল্লাহ। তাঁর হুকুম ও আইন ছাড়া আমি কারো হুকুম মানি না, মানতে বাধ্য নই। তাঁর হুকুম মানতে আমি এজন্য বাধ্য যে, তিনি আমার ও বিশ্ব জাহানের হাজার হাজার সৌরজগরের সব কিছুর স্রষ্টা, মালিক, পালনকারী, আইনদাতা, নিয়ন্ত্রণকারী এবং শেষ ও একমাত্র আশ্রয়স্থল।

Dhaka University Institutional Repository

যিনি আমার এবং সবার, সবকিছুর উর্ধ্বে, সদা জাগ্রত, চিরঞ্জীব, ভাল-মন্দের একমাত্র কর্তা, মহান বিচারক, প্রাপ্য শাস্তি ও শাস্তি দাতা। যাঁর ক্ষমতা ও সৃষ্টি বাইরে কেউ নেই। যিনি অসংখ্য সৌরজগতের স্রষ্টা ও আইনদাতা; যাঁর ক্ষমতা ও সৃষ্টির বাইরে কেই নেই। যিনি অসংখ্য সৌরজগতের স্রষ্টা ও আইনদাতা; যাঁর আইনে প্রতিটি সৃষ্টি, সৃষ্টির অনু পরমাণু ও সব কিছু চলে, চলতে বাধ্য। তাই আমি শুধু তাঁরই আইন মানবো। সারা দুনিয়া আমার বিপক্ষে গেলেও আমাকে আগুনে পুড়িয়ে কিংবা কেটে টুকরো টুকরো করে হত্যা করলেও আমি তাঁর আইনের বাইরে কোন আইনই মানতে বাধ্য নই।

এ ঘোষণার পর দুনিয়া ও আসমানের সমস্ত কৃত্রিম খোদাকে অস্বীকার করার কারণে মানুষ পূর্ণ স্বাধীন হয়, স্বাধীনতার স্বাদ গ্রহণ করে সমুন্নত হয়। সে হয় সারা দুনিয়ার প্রভু, গোটা সৃষ্টি জগত হয় তার অনুগত দাস। বিষয়টা পূর্ণ একটা গাড়ি ও ড্রাইভারের সাথে তুলনা করা যায়। গাড়ি যদি ড্রাইভারের অনিয়ন্ত্রণে যায় তাহলে শান্তিপূর্ণ যাত্রা বিঘ্নিত হবেই। আর গাড়ি যদি ড্রাইভারের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে থাকে তাহলে ড্রাইভারসহ সবাই শান্তি পাবে। বিশ্বজাহান মূলত একখানা গাড়ি। প্রতিটি পুরুষ ও নারী তাঁর আরোহী বটে, ড্রাইভারও। সেই ড্রাইভার যদি গাড়ির নিয়ন্ত্রণে না চলে তাহলেও সর্বনাশ। আজ সারা দুনিয়ায় সর্বনাশের যে প্রবল বন্যা বয়ে যাচ্ছে, সে বন্যা রোধ করতে হলে প্রতিটি মানুষকে আল্লাহ্র এ বিপ্লবী দাওয়াত আন্তরিকভাবে কবুল করতে হবে। কেননা শুধুমাত্র আল্লাহ্ পাকের এ দাওয়াত কবুলের মাধ্যমেই নারী-পুরুষ স্বাধীনতা লাভ করে। কোন দেশের প্রত্যেকটি মানুষ পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ করলে সে দেশে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না।

প্রশ্ন হতে পারে আল্লাহ্র দাসত্ব স্বীকার করলে তো মানুষ পরাধীনই হয়ে পড়ল-তাহলে সে পূর্ণ স্বাধীন হল কিভাবে? সত্য বটে। প্রথমত, মানুষের স্বভাবই হল কারো না কারো দাসত্ব বা গোলামী করা। সে যখন একক আল্লাহ্র অবশ্য গ্রহণযোগ্য দাসত্ব স্বীকার না করবে তখন তাকে একাধিক দোখার দাস হতে হবে। সূর্যের অবর্তমানে রাতে আলো পেতে দুনিয়ার মানুষ যে কত প্রকার আলো জ্বালে। কিন্তু এত কিসিমের আলো জ্বেলেও রাতকে একটুকু দূর করা যায় না। অনুরূপই হয় দাসত্বের ক্ষেত্রে। হাজারো খোদার বন্দেগী করে অশান্তির আঁধার বাড়ে বৈ এতটুকু কমে না। তাই সেই একক সত্য সুন্দর, একক প্রকৃত আলোকের বান্দা বানাবার জন্যে যুগে যুগে; গোত্রে-দেশে অগণিত নবী-রাসূল আগমণ করেছেন।[১]

১। কবিতা সুলতানা, ধন্য আমি নারী, ঢাকাঃ মদিনা পাবলিকেশন্স, ১৯৯৫, পৃ-৩৬-৩৮।

Dhaka University Institutional Repository

নর ও নারী একে অপরের পরিপূরক। ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক ও জাতীয় জীবনে এ কথা সত্য। বিশেষ করে একটি জাতির উন্নতির গোড়াতেই হলো নারী। মায়েরা সন্তানদেরকে যেভাবে গড়ে তোলেন, একটা জাতি সেভাবে গড়ে উঠে।

কিন্তু নারীর এ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার স্বীকৃতি পুরুষরা অনেক সময় দেননি। ইতিহাসে নারীর সামাজিক মর্যাদায় প্রচুর উত্থান-পতন লক্ষ্য করা যায়। বিশেষ করে গত পাঁচশত বছরের ইতিহাসের দিকে তাকালে এ সংক্রান্ত চারটি পর্যায়ে রূপ বদলাতে দেখা যায়।

প্রথম পর্যায়ে নারীর অবস্থা ছিল অত্যন্ত করুণ। এ সময় নারীর উপর চলে অবিচার ও অত্যাচার। অত্যাচার এত লোকহর্ষক ছিল যে, নারীকে মানুষ আত্মাধারী প্রাণী বলে মনে করলে এমন অত্যাচার করা সম্ভব হতো না। সুতরাং সপ্তদশ শতাব্দীতে রোম নগরীতে নর সমাজ তাদের Council of the wose[২] সিদ্ধান্তে উপনীত হয় যে, 'Women has no soul" অর্থাৎ " নারীর কোন আত্মা নেই"। তার মানে আত্মাহীন আবর্জনাকে যেমন পুড়িয়ে ফেলা যায়, নারীকেও তা করা হয়। এর ফলে খ্রিস্টান জগত তাদের নব্বই লক্ষ নারীকে আগুনে পুড়িয়ে বিচার করে।

গ্রীক সমাজে নারীর অবস্থা সক্রেটিসের কথায় ফুটে ওঠে। তাঁর ভাষায় নারী হলো জগতে বিশৃঙ্খল ও ভাঙনের সর্বশ্রেষ্ঠ উৎস। চীন সভ্যতায় নারীকে Waters of Woe বা 'দুঃখের প্রস্রবণ' বলা হতো। নারী ছিল স্বামীর পরিবারের সম্পত্তি। সুতরাং স্বামী ইচ্ছা করলে স্ত্রীকে অন্যের উপ-পত্নী হিসেবে বিক্রয় করতে পারতো। ভারতেও নারীর অবস্থা ভাল ছিল না। স্বামী মারা গেলে স্ত্রীকে পুড়ে মরতে হতো। মোটকথা এই প্রথম পর্যায়ে গোটা বিশ্বেই নারীর অবস্থা ছিল অত্যন্ত করুণ। নারী ছিল কাজের দাসী আর ভোগের বস্তু। প্রয়োজনে কাজ নেওয়া যায়, ভোগ করা যায়। প্রয়োজন ফুরিয়ে গেলে ডাস্টবিনে ফেলে দেওয়া যায় অথবা আবর্জনার মতো পুড়িয়ে ফেলা যায়।

দ্বিতীয় পর্যায় হলো নারী মুক্তির কাল। প্রথম পর্যায়ের অনিবার্য ফল হিসেবেই নারীর মুক্তি আন্দোলন শুরু হয়। পর্যায়ক্রমে এ আন্দোলন সফলতা লাভ করে। নারীর আত্মা স্বীকৃত হয়। ক্রমানুয়ে এক পর্যায়ে পাশ্চাত্যে নারীর ভোটাধিকারও স্বীকৃত হয়। ধীরে ধীরে নারী পায় স্বাধীনতা, বাঁচার অধিকার, মানুষ হিসেবে মর্যাদা।

২। আব্দুল খালেক, নারী, প্রাগুক্ত, পৃ-৭।

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় পর্যায় হলো নারী প্রগতির কাল। এ পর্যায়ে পাশ্চাত্যের নারী সমাজ মুক্তির স্বাদ পেয়ে ভারসাম্য হারিয়ে ফেলে। মুক্তি মানে সকল নিয়ম শৃঙ্খলা থেকে মুক্তি নয়। এ কথা ভুলে গেল। ফলে স্বাধীনতার ব্যপ্তি নরের দাসত্ব ও বিবাহের বন্ধন অতিক্রম করে যৌন স্বাধীনতা পর্যন্ত ছড়িয়ে গেল। যৌনান্দ ভোগ করার জন্য স্বামীত্বের গন্ডিতে যাওয়ার প্রয়োজন নেই। পুরুষদেরকে যৌন খেলনা হিসেবে ব্যবহার করা যাবে। পাশ্চাত্যের সমাজে তা স্বীকৃত হলো। আর এ প্রগতির হাওয়া বয়ে গেল বিশ্বের সর্বত্র।

এবার এর পরিণতি লক্ষ্য করুন। পূর্বে পুরুষরা নারীকে উপ-পত্নী হিসেবে ব্যবহার করতে পারত। কিন্তু তার একটা সীমা ছিল। কারণ, অনায়াসে মেয়ে পাওয়া যেত না; নারী ছিল ঘরে আবদ্ধ। কিন্তু এখন? পুরুষদের পূর্বের ভোগ প্রবৃত্তি তো এখনো আছেই। অপরদিকে নারীরাও যৌন স্বাধীনতা ও প্রগতির সনদ নিয়ে দৌড়ে এগিয়ে আসছেন। ফলে মিলনটি হয়ে পড়েছে অবাধ ও স্বাভাবিক। আর নরকে আকর্ষণ করার প্রতিযোগিতায় নারীদের মধ্যে শুরু হয়েছে দেহের মহড়া, উলঙ্গপনা, নাইট ক্লাবের জলসা ইত্যাদি।

এর সামাজিক পরিণতির দিকে দৃষ্টিপাত করুন। নারী স্বাধীনতা ও প্রগতির ফলে পাশ্চাত্যের যৌন সম্পর্ক হয়ে পড়ে একটা স্বাভাবিক ব্যাপার, এতে বিয়ের কোন প্রয়োজন নেই। কেউ যদি সংসার করতে চায়, তখনি শুধু বিয়ের প্রশ্ন ওঠে। এতে করে এক পুরুষ বহু নারীর সঙ্গে এবং এক নারী বহু পুরুষের সঙ্গে যৌন মিলনের অবাধ প্রচলন হয়। এতে সৃষ্টি হয় দুরারোগ্য ব্যাধি। মেয়ে পুরুষের মধ্যে পারস্পারিক সম্পর্ক গড়ন ও ভাঙন প্রক্রিয়ায় সৃষ্টি হয় মনস্তাত্ত্বিক সমস্যা, মস্তিস্কবিকৃতি ও আত্মহত্যা। নারী তার পুরুষ আর পুরুষ তার নারী বদলের পালায় দেখা দেয় দ্বন্দ্ব। দ্বন্দ্ব থেকে মারামারি ও হত্যা। পাশ্চাত্য জগতে যৌন সংক্রান্ত হত্যাকান্ডের সংখ্যা অগণিত। কুমারী মাতৃত্বের হিসেব নেই।

এরপর হলো চতুর্থ পর্যায়। এ পর্যায়ে নারী প্রসঙ্গে দু'টি ধারা লক্ষা করা যায়। একটি দল আরো বেশী নারী প্রগতির প্রবক্তা। নারী স্বাধীনতা, নারী মুক্তি, নারী প্রগতি ইত্যাদির নামে তার আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছে। অপরদিকে অনেকেই নারী প্রগতির কুফল লক্ষ্য করে নৈতিক মূল্যবোধ এবং সুশৃঙ্খল পারিবারিক জীবনের গুরুত্ব উপলব্ধি করছেন। এমনকি পাশ্চাত্যের অনেক বুদ্ধিজীবীও নারী প্রগতির করুণ পরিণামের কথা তুলে ধরছেন।

Dhaka University Institutional Repository

এ হলো সমকালীন নারী ইতিহাসের চারটি পর্যায়ের সংক্ষিপ্ত কাহিনী। তাহলে দেখা যাচ্ছে, আজ যখন নারী ইতিহাসের চতুর্থ পর্যায়ে দাঁড়িয়ে তখন একদিকে অতি প্রগতিবাদিরা অদুরদর্শীর মতো আরো বলগাহীন নারী স্বাধীনতার কথা বলছেন এবং অপরদিকে পাশ্চাত্যের, চিন্তাশীলরাই নারী প্রগতির ভয়াবহ পরিণামের পর্যালোচনা করছেন।

নারী-প্রগতি ও পাশ্চাত্য জগত

আধুনিক যুগে সর্বাক্ষেপা বিপ্লবাত্মক যে আন্দোলন শুরু হয়, তা হল "নারী মুক্তি আন্দোলন"। এর প্রকৃতি অসাধারণভাবে গতিশীল। এ মহাপ্লাবন উত্থিত হয়ে মানব সমাজে যে বিপর্যয় সাধন করেছে, সমাজ বিজ্ঞানীদের এটা উত্তমরূপে বিশ্লেষণ করে দেখা কর্তব্য। ধনতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে এ বিপ্লব শুরু হয় এবং বিদ্যুৎ গতিতে তা সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। সামাজিক রীতিনীতি ও ধর্মের বিধি-নিষেধ এটা একেবারে ছিন্ন-ভিন্ন করে ফেলে। নারী পুরুষের অবাধ মিলনের পথে যত অন্তরায় ছিল, এতে এটা আগুন ধরিয়ে দেয়।

বর্তমানে শতাব্দীতে এ আন্দোলন উন্নতির চরম শিখরে উপনীত হয়েছে এবং এর বিষময় ফলাফল পরিস্ফুট হয়ে ওঠেছে। এর পরিণাম এত বিপদসঙ্কুল, বিভ্রান্তিকর ও আতঙ্কজনক হয়েছে যে, এর বর্ণনা দিতেও শরীর শিউরে ওঠে। এর কুফল দর্শনে এ আন্দোলনের নেতৃবৃন্দও আজ শঙ্কিত ও বিহবল হয়ে পড়েছেন এবং প্রমাদ গুণছেন।[৩]

কিন্তু গভীর পরিতাপের বিষয়, যে আপদ হতে রক্ষার জন্য আজ পাশ্চাত্য জগত উদগ্রীব হয়ে উঠেছে, মুসলিম বিশ্ব সেটাই এখন ক্রমশ বরণ করে দিতে উদ্যত হয়েছে। পাশ্চাত্যের উচ্ছিষ্ট ভক্ষণে আমরা এই অভ্যস্ত হয়ে পড়েছি যে, নারী মুক্তির নামে নারীদিগকে অফিস-আদালতে, কল-কারখানার কাজে টেনে আনা হচ্ছে এবং আনন্দময় গার্হস্থ্য জীবন বর্জনে তাদেরকে উৎসাহিত করা হচ্ছে। পর্দা-প্রথা বিসর্জন দিয়ে নারী-পুরুষের অবাধ মিলনের সুযোগ করে দেওয়া হচ্ছে। সমাজ দরদীদের অনতিবিলম্বে এ সম্পর্কে সচেতন হওয়া আবশ্যক।[৪]

৩। কবিতা সুলতানা, প্রাগুক্ত, পৃ-৩৪।
৪। আব্দুল খালেক, নারী, প্রাগুক্ত, পৃ-৬৮।

Dhaka University Institutional Repository

ইসলামের আবির্ভাবের পূর্বে বিভিন্ন ধর্ম ও সভ্যতায় নারীর স্থান ও মর্যাদা কিরূপ ছিল ইতিপূর্বে তা আমরা আলোচনা করে এসেসি। এমতাবস্থায় নারী মুক্তি আন্দোলন অতি স্বাভাবিক বলেই আমরা মনে করি। খ্রিস্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীতে পাশ্চাত্যের দার্শনিক ও সাহিত্যিকগণ নারী মুক্তির যে আন্দোন শুরু করলেন তখন তাদের সম্মুখে সেই ভ্রান্তিপূর্ণ বিশ্বাস এবং সামাজিক রীতি-নীতি প্রচলিত ছিল যা মানবাত্মাকে স্বভাব বিরুদ্ধ শৃঙ্খলে আবদ্ধ করে উন্নতির সকল দ্বার রুদ্ধ করে দিয়েছিল। কিন্তু তাদের নারী মুক্তির পদক্ষেপ এমন পথে পরিচালিত হল, যার শেষ পরিণতি বর্তমানে সর্বনাশা পর্যায়ে পৌঁছেছে।

নারী জাতিকে অধঃপতন হতে উন্নীত করার যে আন্দোলন পরিচালিত হল, এর সুফল অচিরেই সমাজ জীবনে দেখা দিল। যে নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গীতে নারীকে তুচ্ছ ও অবহেলিত করে রাখা হত এর সংশোধন করা হল এবং সে সমস্ত রীতি-নীতির কারণে তাকে দাসীর জীবন যাপন করতে হত তারও সংশোধন হল। নারীদের যোগ্যতা ও প্রতিভা বিকাশের সুযোগ ঘটলো এবং শিক্ষার দ্বার তাদের জন্য উন্মুক্ত হল। তারা গৃহ সামলালো, সামাজিক পবিত্রতা আনয়ন করল এবং সমাজের প্রভূত কল্যাণ সাধন করল। এ সবই ছিল নারী মুক্তি আন্দোলনের প্রাথমিক সুফল।[৫]

কিন্তু নারী মুক্তি আন্দোলনের উদ্যোক্তাদের কার্যক্রম অচিরেই সীমালঙ্গন করে চলল এবং বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভেই পাশ্চাত্য জগত অসংযম এবং অমিতাচারের প্রান্তসীমায় এসে উপনীত হল। নারী পুরুষের অবাধ মেলামেশার ভিত্তিতে পাশ্চাত্য সমাজ ব্যবস্থা গড়ে উঠল। আর এর বিষময় পরিণাম অনতিবিলম্বেই দেখা দিল।

সাম্যের অর্থ করা হল কেবল মানবিক অধিকার ও নৈতিক মর্যাদার ক্ষেত্রেই নয়; এবং সামাজিক জীবনে পুরুষ যে কাজ করে নারীও তাই করবে এবং নৈতিক বন্ধন পুরুষের জন্য যেমন শিথিল, নারীর জন্য তদ্রূপ শিথিলই থাকতে হবে। ফলে প্রকৃতিগত যে সব কার্যের উপর সভ্যতা ও মানব জাতির স্থায়িত্ব নির্ভর করে, এমন দৈনন্দিন কার্যের প্রতি নারী উদাসীন ও বিদ্রোহী হয়ে উঠল। দাম্পত্য জীবনের দায়িত্ব, সন্তান-সন্ততির লালন-পালন, গৃহ-পরিচালনা, পারিবারিক সেবা-শুশ্রূষা আর তার কর্মসূচির অন্তর্ভূক্ত রইল না; বরং স্বাধীন ব্যবসায় ও শিল্প কারখানায় পুরুষের সালে প্রতিযোগিতা, অফিস-আদালতে ও কল-কারখানায় চাকুরী লাভ, নির্বাচনী অভিযানে প্রতিদ্বন্দ্বিতা এবং খেলাধুলা, ক্লাব, রঙ্গমঞ্চ,নৃত্য-গীতি ইত্যাদি চিত্তবিনোদনমূলক কার্যে অংশগ্রহণ তার কর্তব্য কর্মের অন্তর্ভূক্ত হয়ে পড়ল।

৫। আব্দুল খালেক, প্রাগুক্ত, পৃ-৬৮।

Dhaka University Institutional Repository

বিবাহই নারী-পুরুষের পারস্পারিক সাহায্যের উৎকৃষ্ঠ পন্থা এবং এটা হতেই সভ্যতা গড়ে উঠে। এই বৈবাহিক সম্পর্ক একবারে বিদুরীত না হলেও নিতান্ত দুর্বল হয়ে পড়ল। জন্ম-নিয়ন্ত্রণ, গর্ভপাত ও সন্তান হত্যার মাধ্যমে মানব-বংশ বৃদ্ধির পথ রুদ্ধ হতে চলল। নৈতিক সাম্যের অলীক মতবাদ নারী পুরুষের চরিত্রহীনতার সাম্য এনে দিল। নারী-পুরুষ সংক্রান্ত কোন কাজই এখন আর লজ্জাজনক রইল না।

পুরাতন রীতি অনুসারে পুরুষ উপার্জন করত এবং নারী গৃহ পরিচালনা করত। কিন্তু নারীর অর্থনৈতিক স্বাধীনতার ফলে এই নীতির পরিবর্তন হল এবং এটা তাকে পুরুষ হতে একেবারে বেপরোয়া করে দিল। যৌন সম্পর্ক ব্যতীত নারী পুরুষের মধ্যে এখন কোন সম্পর্ক রইল না-যা উভয়কে একত্রে থাকতে বাধ্য করে। সুতরাং প্রশ্ন উঠল, একমাত্র কাম-বাসনা চরিতার্থ করবার উদ্দেশ্যে নারী পুরুষের চিরন্তন বন্ধনে আবদ্ধ থেকে এক গৃহে কেন একত্রে বসবাস করবে? নারী এখন নিজেই জীবিকা অর্জনে সক্ষম এবং সে নিজেই তার সকল প্রয়োজন মেটাতে পারে। আর সে এখন নিরাপত্তা এবং সাহায্যের জন্য একটি পুরুষের অধীনতা সে কেন স্বীকার করবে? একটি পরিবার পরিচালনার দায়িত্বভারই বা কেন সে বহন করবে? আর কেনই বা সে আইনগত ও নৈতিক বাধা নিষেধ নিজ স্কন্ধে তুলে নিবে?

তদুপরি নৈতিক সাম্যের ধারণা সহজ সুন্দর রুচিসম্মতরূপে তার কাম-বাসনা পূরণের পথ নিষ্কন্টক করে দিল। তাই সে কেন এখন সেকেলে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ থেকে এক গৃহে কেন একত্রে বসবাস করবে? সে তো এখন যেখানে সেখানে যখন ইচ্ছা তখন বেশ সুন্দরভাবে বিপুল আনন্দের সাথে তার কাম-বাসনা পূরণ করতে পারে। এর ফলে কুমারী মাতা ও জারজ সন্তানের সংখ্যা বৃদ্ধি পেল। তৎপর কুমারী মাতা ও জারজ সন্তানের পক্ষে আন্দোলন এত প্রবল হয়ে উঠল যে, যারা তাদের বিরুদ্ধে বলে তাদেরকেই প্রাচীনপন্থী কুসংস্কারাচ্ছন্ন বলে অভিযুক্ত করা হতে থাকে।

Dhaka University Institutional Repository

সর্বশেষ নারী পুরুষের অবাধ মেলামেশার অধিকার নারীদের মধ্যে নগ্নতা, অশ্লীলতা ও সৌন্দর্য প্রদর্শনের স্পৃহা অত্যন্ত বৃদ্ধি করে দিল। যুবক-যুবতীদের মধ্যে স্বভাবতই যৌন আকর্ষণ প্রবল থাকে এবং অবাধ মেলামেশার কারণে এটা নিতান্ত বৃদ্ধি পায়। পুরুষদেরকে আকর্ষণের জন্য নারীদের হৃদয়ে চাকচিক্যময় মনোরম সাজ-সজ্জা এবং বিভিন্ন প্রকার মনভোলানো প্রসাধনে সজ্জিত হওয়ার প্রবল বাসনা জেগে ওঠে। কিন্তু এতেও পুরুষদের সাধ মিটেনা দেখে হতভাগিনী নারীরা নগ্ন হয়ে পড়ে। অসীম যৌন পিপাসায় অতৃপ্ত কামাতুর যুবক-যুবতীর দল সকল সম্ভাব্য উপায়ে পরস্পরকে যৌন-তৃপ্তি সাধনের পরিপূর্ণ সুযোগ-সুবিধা প্রদান করতে থাকে। এই যৌন তৃষ্ণাকে আরও প্রবল করে তুলবার জন্য পাশ্চাত্য জগত আর্টের নামে নগ্নচিত্র, বল-নৃত্য, যৌনদ্দীপক সাহিত্য ও চলচ্চিত্রের ব্যাপক প্রচলন করে রেখেছে।[৬]

এরূপে ওহীর জ্ঞান বিবর্জিত মেঘাচ্ছন্ন দুনিয়া পরম সম্মানিত বনী আদমকে হেয় ও লাঞ্ছিত করল। অসঙ্গত সীমালঙ্ঘন ও চরম ন্যূনতার মধ্যে সে বিবর্তিত হতেই রইল এবং মধ্যপন্থা অবলম্বনের যোগ্যতাই তার রইল না। একবার নারীকে দাসীতে পরিণত করা হলো; পুরুষ তার পতিদেব ও উপাস্য মাবুদে পরিগণিত হল, শৈশবে তাকে পিতা, যৌবনে স্বামী এবং বিধবা অবস্থায় পুত্রের অধীনে থাকতে হলো, তাকে উত্তরাধিকার হতে বঞ্চিত রাখা হলো, তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাকে একজন পুরুষের হস্তে সমর্পণ করা হলো এবং একান্ত অনভিপ্রেত হলেও আজীবন তাকে তার অউনে থাকতে হলো, স্বামীর চিতায় তাকে সহমরণে বাধ্য করা হলো; নারীর আত্মা ও ব্যক্তিত্ব অস্বীকার করা হলো, তাকে মানুষ বলে গণ্য করা হলো না; তাকে পাপ ও নৈতিক অধঃপতনের প্রতিমূর্তি বলে আখ্যায়িত করা হলো। অপরদিকে নারীর প্রতি করুণা প্রদর্শন করে তাকে পাশবিক প্রবৃত্তির ক্রীড়নকে পরিণত করা হলো। তাকে নিবিড়ভাবে পুরুষের দেহ-সঙ্গিনী করা হলো।

সুতরাং নারী মুক্তির যে প্রবল আন্দোলন পাশ্চাত্যে জন্মলাভ করে, এ হতে প্রাচ্য রেহাই পেল না। এ আন্দোলন কতটুকু সীমালঙ্ঘন করে গেল, এটাই অতি সংক্ষেপে নিম্নে আলোচনা করা হল।

৬। সাইয়েদ আব্দুল আলা মওদুদী, পর্দা ও ইসলাম, ঢাকা ঃ জাতীয় গ্রন্থ বিজ্ঞান, বাংলা বাজার, ঢাকা, ১৯৭৫, পৃ-১৫-১৬।

Dhaka University Institutional Repository

নারী-মুক্তি আন্দোলনের উদ্যোক্তাগণ বলতে লাগল-আবহমান কাল হতে প্রচলিত রীতি-নীতিই উন্নতির পথে কন্টক হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। এ সকলের মূলোৎপাটন করতে হবে। নৈতিকতার সকল বন্ধন ছিন্ন করতে হবে। সতীত্ব আবার কি? বিবাহ ছাড়া কেউ কারোও প্রণয়ে আবদ্ধ হলে এতে দোষ কি? বিবাহের পরেই বা মানুষ এত নির্দয় হবে কেন যে, অপরকে প্রেম নিবেদনের অধিকার হতে নিজকে বঞ্চিত করবে? এ ধরনের প্রশ্ন সমাজের সর্বত্র প্রচলিত হতে থাকে।

উনবিংশ শতাব্দীর শুরুতে জর্জ স্যান্ড এই দলের নেত্রী ছিল। যে সকল মৌলিক নীতিবোধের উপর মানব-সভ্যতা ও নারীর সম্ভ্রম-সতীত্ব নির্ভর করে, এই কূলটা রমণী এসব কিছুই ছিন্ন ভিন্ন করে ফেলে। সে বিবাহিতা অবস্থায়ই পরপুরুষের সাথে অবৈধ যৌন সম্পর্ক স্থাপন করে এবং এরপরই তার প্রণয়ী প্ররিবর্তনের পালা আরম্ভ হয়।

ফ্রান্সের কবি আলফ্রেড মুসে তার অন্যতম প্রেমিক। সে জর্জ স্যান্ডের বিশ্বাসঘাতকতায় মর্মাহত হয়ে ওসিয়ত করে যায়, স্যান্ড যেন তার অন্ত্যোষ্টিক্রিয়ায় যোগদান করতে না পারে। দীর্ঘ ত্রিশ বছরকাল ধরে তার সাহিত্যের মাধ্যমে ফরাসী যুবক-যুবতীদের চরিত্র প্রভাবান্বিত হতে থাকে। তার রচিত উপন্যাস Lelia-তে লেলিয়ার পক্ষ হতে সে স্টেনোকে লিখেছে ঃ

"জগতকে দেখবার আমার যতখানি সুযোগ হয়েছে, তাতে আমি অনুভব করি, প্রেম সম্পর্কে আমাদের যুবক-যুবতীদের ধারণা কত ভ্রান্ত! প্রেম কেবল একজনের জন্যই হবে অথবা তার মনকে জয় করতে হবে এবং তাও চিরদিনের জন্য এ ধারণা নিতান্তই ভুল। যাবতীয় অন্যায় কল্পনাকেও নিঃসন্দেনেহ মনে স্থান দিতে হবে। আমি এ কথা মেনে নিতে প্রস্তুত আছি; কিছুসংখ্যক লোকের দাম্পত্য জীবনে বিশৃস্ততার পরিচয় দেওয়ার অধিকার আছে। কিন্তু অধিকাংশ লোকই অন্যরূপ প্রয়োজন বোধ করে এবং তা অর্জনের যোগ্যতা তাদের আছে। এর জন্য আবশ্যক, নারী-পুরুষ একে অপরকে পূর্ণ স্বাধীনতা দিবে, পারস্পারিক উদারতা প্রদান করবে এবং যে সমস্ত কারণে পারস্পরিক উদারতা প্রদর্শন ব্যাহত হয় এবং সে সমস্ত কারণে প্রেমের ক্ষেত্রে হিংসা ও প্রতিযোগিতা সৃষ্টি হয়, তা অন্তর হতে নির্মূল করবে। সকল প্রেমই সত্য। তা উগ্র হোক বা শান্ত, কাম বা নিষ্কাম, স্থায়ী বা পরিবর্তনশীল, আত্মঘাতী বা সুখদায়িনী।"

Dhaka University Institutional Repository

জর্জ স্যান্ড তার অপর এক উপন্যাস 'জাজ' এ তার মতে এক আদর্শ স্বামীকে সমাজের সম্মুখে উপস্থাপিত করে। উপন্যাসের প্রধান চরিত্র জাকের স্ত্রী নিজকে পরপুরুষের বাহু বন্ধনে আবদ্ধ করছে; অথচ উদারচেতা স্বামী এতে কোন ঘৃণা বা আপত্তি করছে না। এর কারণ স্বরূপ স্বামী বলছে- "যে পুষ্প আমাকে ব্যতীত অন্যকেও তার সুরভি দান করতে চায়, তাকে পদদলিত করার আমার কি অধিকার আছে?"

জর্জ স্যান্ড অন্যত্র জাকের ভাষায় মন্তব্য করে ঃ

আমি আমার মত পরিবর্তন করিনি। সমাজের সঙ্গে কোন আপসও আমি করিনি। যত প্রকার সামাজিক রীতি আছে আমার মতে বিবাহ তন্মধ্যে এক চরম পাশবিক রীতি। আমার বিশ্বাস, যদি মানুষ ন্যায় ও জ্ঞান-বুদ্ধির উৎকর্ষ সাধন করতে ইচ্ছা করে, তবে অবশ্যই এই রীতি তারা রহিত করে দিবে। অতঃপর এর পরিবর্তে তারা একটি পবিত্র মানবীয় পন্থা বেছে নিবে। তখন মানব সন্তানগণ এ সকল নারী-পুরুষ হতে অধিকতর অগ্রগামী হবে।একে অপররের স্বাধীনতায় কোন প্রকার প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করবে না। বর্তমানে পুরুষ এমন স্বার্থপর এবং নারী এত ভীরু যে, তারা বর্তমানের প্রচলিত রীতি-নীতির পরিবর্তে কোন উন্নততর এবং সম্ভ্রান্ত রীতি-নীতির দাবী করে না। হ্যাঁ, যাদের মধ্যে বিবেক ও পূণ্যের অভাব আছে, তাদেরকে তো কঠিন শৃঙ্খলে আবদ্ধই থাকতে হবে।[৭]

খ্রিস্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে জর্জ স্যান্ডের মতবাদ প্রচলিত হতে থাকে। কিন্তু এই আন্দোলন তার সীমানার শেষ পরিণতিতে পৌঁছাতে পারেনি। এর ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ বছর পর ফ্রান্সের নাট্যকার, সাহিত্যিক ও দার্শনিকদের দ্বিতীয় দলের আবির্ভাব ঘটে। এ দলের বিশিষ্ট নেতা ছিল আলেকজান্ডার দুমা ও আলফ্রেড নাকেট। তারা এ মতবাদ পোষণ করত যে, স্বাধীনতা ও জীবনের সুখ-সম্ভোগে মানুষের জন্মগত অধিকার আছে। এর উপর নৈতিক রীতি-নীতি এবং সামাজিক বাধা-নিষধ চাপিয়ে দেওয়া ব্যক্তির প্রতি সামাজিক নির্যাতন ও উৎপীড় ছাড়া আর কিছুই নয়"। এ মতবাদ প্রচারে এই নব্য দল তাদের সর্বশক্তি নিয়োগ করে।

৭। আব্দুল খালেক, প্রাগুক্ত, পৃ-৭১-৭২।

Dhaka University Institutional Repository

এ যুগে যান্ত্রিক আবিস্কার ও ব্যাপক উৎপাদন অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে যে অসমাঞ্জস্যতা আনয়ন করল, এটা প্রতিটি ব্যক্তিকে নিজের অস্তিত্ব বজায় রাখার জন্য উপার্জন করতে বাধা করল। জীবিকা অর্জনের জন্য কুমারী বালিকা, বিবাহিতা মহিলা, বিধবা সকলকেই গৃহের বাইরে বের হতে হল। এরূপে নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশার সুযোগ-সুবিধা অধিকতর বৃদ্ধি পেল। এর অবশ্যম্ভাবী পরিণাম ফল উপলব্দি করে প্রগতির উদ্যোক্তাগণ মনে করত, এটা অধঃপতন নয়; বরং যা হচ্ছে বেশ ভাল হচ্ছে। বাস্তবিক উদ্যোক্তাগণ মনে করত, এটা অধঃপতন নয়; বরং যা হচ্ছে বেশ ভাল হচ্ছে। বাস্তবিক পক্ষে যে ব্যক্তি একজনের পুজারী হয়ে বসে থাকে, সে প্রকৃতই নির্বোধ। প্রতিটি আন্দ মুহূর্তে এক জনজন নতুন অভ্যাগতের নির্বাচন করা তার উচিত।[৮]

এটা হল উনবিংশ শতাব্দীর কথা। বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভ হতে নারী মুক্তির আন্দোলন কোন পর্যায়ে যেয়ে উপনীত হল, একবার লক্ষ্য করুন। ১৯০৮ খ্রিস্টাব্দে Piree Wolf ও Custo Lerous-এর Lalys নামক একটি নাটক প্রকাশিত হয়। এই নাটকে দুটি যুবতী বালিকা তাদের পিতার সাথে যুবক ভ্রাতার উপস্থিতিতে তর্ক-বিতর্ক করছে যে, তাদের ইচ্ছানুযায়ী স্বাধীনভাবে প্রেম নিবেদনের অধিকার তাদের আছে। তারা বলছে প্রেম ছাড়া একটি যুবতীর জীবন কত মর্মন্তুদ হতে পারে! এক পিতা জনৈক যুবকের সাথে প্রেম করার অপরাধে তার কন্যাকে ভর্ৎসনা করে। জবাবে কন্যা বলে, আমি তোমাকে কিরূপে বুঝাবো? একটি বালিকা প্রেম না করেই আইবুড়ো হোক, কোন বালিকাকে এটা বলবার অধিকার কারোও নেই। সে বালিকা তার ভগ্নিই হোক বা কন্যাই হোক। তুমি এটা কিছুতেই বুঝতে পার না।[৯]

৮। আব্দুল খালেক, প্রাগুক্ত, পৃ-৭৩-৭৪।

৯। সাইয়েদ আব্দুল আলা মওদুদী, প্রাগুক্ত, পৃ-৩৫।

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর নারী মুক্তি আন্দোলন চরম সীমায় উপনীত হয়। জন্ম-নিরোধ আন্দোলনের ফলে ফ্রান্সে জন্মহার হ্রাস পায়। সুতরাং জীবন মৃত্যু মহা সমরের সম্মুখীন হয়ে ফরাসী জাতি যুদ্ধোপযোগী যুবকের সংখ্যা নিতান্ত কম বলে প্রমাদগুণে এবং এই সিদ্ধান্ত উপনীত হয় যে, অল্প সংখ্যক এই যুবকের দলকে বিসর্জন দিয়ে জাতিকে নিরাপদ করা যেতে পারে বটে; কিন্তু শত্রুতা পরবর্তী আক্রমন প্রতিহত করা নিতান্ত দুস্কর হয়ে উঠবে। এ চেতনা জাতিকে জন্মহার বৃদিখর অনুপ্রেরণায় উদ্বুদ্ধ করে। তদনুযায়ী সাহিত্যিক, সাংবাদিক, রাজনীতিবিদ ও বিদ্বানমন্ডলী সমভাবে প্রচার করতে শুরু করে, সন্তান জন্মাও। বিবাহের প্রচলিত বন্ধানর ভয় করো না। যে সকল কুমারী বালিকা ও বিধবা জন্মভূমির কল্যাণের উদ্দেশ্যে নিজেদের গর্ভে সন্তান ধারণের জন্য প্রস্তুত হবে, তারা সমাজে নিন্দনীয় না হয়ে বরং সম্মানের অধিকারী হয়ে।

এতে নারী মুক্তি আন্দোলনের প্রবক্তাগণ চরম সুযোগ লাভ করে। তৎকালের বিশিষ্ট সাহিত্যিক Lay-Lyon Republican এর সম্পাদক 'বলপূর্বক ব্যভিচার অপরাধজনক কেন?' নামক প্রবন্ধে বলে ঃ নিরন্ন দরিদ্র ক্ষুধার তাড়নায় অতিষ্ঠ হয়ে চুরি ও লুটতারাজে লিপ্ত হয়ে বলা হয়ে থাকে, তার অন্ন-বস্ত্রের সংস্থান করে দাও। চুরি ও লুটতরাজ আপনা আপনিই বন্ধ হয়ে পড়বে। কিন্তু আশ্চার্যের বিষয় এই যে, দেহের একটি প্রাকৃতিক চাহিদা মেটাবার জন্য যে সাহায্য-সহানুভূতি করা হয়, অনুরূপ দ্বিতীয় প্রাকৃতিক এবং গুরুত্বপূর্ণ চাহিদা অর্থাৎ যৌন ক্ষুধা নিবৃত্তির জন্য তদ্রুপ করা হয় না। অথচ যৌন কামনা ক্ষুধা-তৃষ্ণা অপেক্ষা কম প্রাকৃতিক নয়। ক্ষুধার তীব্র তাড়নায় মানুষ চুরিকার্যে লিপ্ত হয়, তেমনি বলপূর্বক ব্যভিচার এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রাণ হত্যাও যৌন ক্ষূধার তদ্রুপ তীব্র তাড়নার কারণেই সংঘটিত হয়ে থাকে। আগামী সপ্তাহে অন্ন জুটবে এই আশ্বাসে যেমন কেউ ক্ষূধা নিবৃত্ত রাখতে পারে না, তদ্রুপ কোন স্বাস্থ্যবান শক্তিশালী যুবকও বলপূর্বক তার কামনা-বাসনা সংযত করে রাখতে পারে না। আমাদের শহরগুলোতে সবকিছুরই প্রাচুর্য আছে। কিন্তু একজন নিঃসম্বল ক্ষুধার্ত ব্যক্তির অন্নের অভাব যেমন মর্মন্তুদ, তেমনি তার যৌন সম্ভোগের অভাবও অতি মর্মন্তুদ। ক্ষুধার্তকে যেমন বিনামূল্যে খাদ্য বিতরণ করা হয়, তেমনই যৌনক্ষুধায় যারা অতিষ্ঠ, তাদের জন্য কিছু ব্যবস্থা করা আমাদের কর্তব্য।[১০]

১০। আব্দুল খালেক, প্রাগুক্ত, পৃ-৭৫-৭৬।

Dhaka University Institutional Repository

নারী-প্রগতির পরিণতি

নৈতিক অনুভূতির বিলুপ্তি

উনবিংশ শতাব্দীর শেষাংশে Henry Bataille, Pierre Louis, Paul Adam প্রমুখ সাহিত্যিকগণ যুবক-যুবতীদের স্বেচ্ছাচারিতায় সাহস সঞ্চারের উদ্দেশ্যে তাদের সর্বশক্তি নিয়োগ করে। এর ফলে নৈতিকতাবোধের লেশমাত্র যা মানব মনে অবশিষ্ট ছিল এবং যা তার হৃদয়ের গভীর কোণে কখনও কখনও কিছুটা দ্বিধা সংকোচের অনুভূতি জানিয়ে তুলতো, তাও একেবারে তিরোহিত হয়ে যায়।

পল এ্যাডাম তার La-Morale-de-L'a Amour গ্রন্থে বলেন

দেহ সম্ভোগের বাসনাকে প্রাচীন মতবাদ অনুযায়ী দূষণীয় মনে করা হয়। অথচ প্রকৃতিগতভাবে এটা প্রতিটি মানুষের মধ্যেই রয়েছে এবং এতে পাপ নেই। ল্যাটিন জাতির মারাত্মক দুর্বলতা হল, তাদের প্রেমিক-প্রেমিকারা স্পষ্ট করে বলতে সংকোচবোধ করে যে, তাদের মিলনের উদ্দেশ্য নিছক দৈহিক বাসনা চরিতার্থ করে সুখ-সম্ভোগ ও চরম আন্দ লাভ করা।

তরুণ-তরুণীরা যা কিছুই করুক না-কেন এটা যেন মন ও বিবেকের পরিপূর্ণ পরিতুষ্টির সাথে তারা করতে পারে এবং সমাজেও যেন তাদের যৌবনের উচ্ছৃঙ্খলতায় রুষ্ট না হয়ে এটাকে নৈতিকতার দিক নিয়ে সঙ্গত ও সমীচীন মনে করে। এই উদ্দেশ্য নিয়েই তৎকালের সাহিত্যিকগণ ব্যক্তিগত ঔদ্ধত্য, লাম্পট্য ও বলগাহীন স্বাধীনতাকে যুক্তি ও বিজ্ঞানের বিত্তির উপর প্রতিঠিত করবার চেষ্টায় প্রবৃত্ত হয়।

এই যুগে শিল্প বিপ্লবের ফলে ধনতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থায় ব্যক্তি সকল প্রকার সম্ভাব্য উপায়ে সম্পদ অর্জনের সীমাহীন নিরংকুশ অধিকার লাভ করে এবং সমষ্টির ক্ষতিসাধন করেও ব্যক্তির ধনোপার্জনের স্পৃহাকে বৈধ ও পবিত্র বলে মনে করা হয় এতে ব্যক্তির স্বার্থের বিপক্ষে সমষ্টির অধিকার রক্ষার কোন উপায়ই রইল না। এই সুযোগে যৌন উচ্ছৃংখলতা অত্যন্ত বৃদ্ধি পায়। রঙ্গমঞ্চ, নৃত্যশালা ও চলচ্ছিত্রের যাবতীয় কার্যকলাপ সুন্দরী নারীকে কেন্দ্র করেই চলতে থাকে। নারীকে কামোদ্দীপক মূর্তিতে ও উলঙ্গ আকারে লোকদের নিকট উপস্থাপনা একটা ফ্যাশানে পরিণত হয়।

Dhaka University Institutional Repository

আবার কতিপয় লোক নারীকে ভাড়ায় খাটাতে আরম্ভ করে, এতে পতিতাবৃত্তি একটা সুসংগঠিত আন্তর্জাতিক ব্যবসায় পরিণত হয়। অপরদিকে যুবতীর দল নব আবিস্কৃত যৌন উত্তেজক নতুন নতুন বেশ-ভূষা ও প্রসাধনে সুসজ্জিত হয়ে হন তোলানো ঠমকে সমাজে বিচরণ করতে শুরু করে। অপরিণামদর্শী যুবকদল সতৃষ্ণ নয়ন ও মন দিয়ে তাদের পেছনে ছুটতে থাকে।

ব্যবসা-বাণিজ্যের কোন বিভাগই যৌন উন্মাদনার উপায়-উপকরণ হতে মুক্ত থাকেনি। ব্যবসা-বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানের প্রচারপত্র ও বিজ্ঞাপনাদির প্রতি দৃষ্টিপাত করলেই বোঝা যায়, নারীর নগ্ন-অর্ধনগ্ন ছবি-এর এক অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে দাঁড়িয়েছে। হোটেল, রেস্তোঁরা, দোকানের শো-রুম প্রভৃতিতে নারী মূর্তি এমনভাবেই রাখা হয়েছে যেন পুরুষের দৃষ্টি সেদিকে আকৃষ্ট হয়।

স্বাধীনতার এই ধারণা আবার এই যুগে গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থার জন্ম দেয়; মানবীয় দুর্বলতামুক্ত কোন উর্ধ্বতন শক্তি ও কর্তৃত্ব এই শাসন ব্যবস্থা মানে না। এর মতে কোন প্রস্তাব যতই মন্দ ও অসঙ্গত হোক না-কেন, শতকরা উনপঞ্চাশজন পন্ডিত বিরোধীতা করলেও একান্নটি গাধার সমর্থনে এটা আইনে পরিণত হয়। এমতাবস্থায় সমাজ বিরোধী নৈতিকতা ধ্বংসকারী আইন প্রণয়নে স্বার্থান্ধ ব্যক্তিদিগকে বাধা দেবার কেউ থাকে না।

জার্মান বিশ্বজনীন যৌন সংস্থার সভাপতি দার্শনিক ড.ম্যাগ্‌নাস হার্শফিল্ড (Dr. Magnus Herschfield) দীর্ঘ ছয় বছর সমকামের ন্যায় কুকর্মের সমর্থনে প্রবল কার্য চালায়। অবশেষে জার্মান পার্লামেন্ট বিপুল ভোটাধিক্যে আইন পাশ করে, "উভয়পক্ষের সম্মতিক্রমে এই কার্য করলে এটা অবৈধ হবে না।"

এইরূপে জনমতের চাপে নিষিদ্ধ গর্হিত বৈধ বলে পরিগণিত হয় এবং অশ্লীলতা অবাধ গতিতে চলতে থাকে। মোটকথা, আধুনিক নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি, ধনতান্ত্রিক সাংস্কৃতিক অবস্থা এবং গণতান্ত্রিক শাসন পদ্ধতির একত্র সমাবেশে সম্পূর্ণরূপে নৈতিক অনুভূতির বিলোপ সাধিত হয়। লজ্জা, ঘৃণা, অবজ্ঞা ও শ্লীলতাজ্ঞান মানব মন হতে দূরে সরে যাওয়ায় ব্যভিচার এমন নির্দোষ কাজে পরিণত হয় যে, ঘৃণাভরে এটা গোপন রাখার প্রয়োজন বোধও রইল না। বিবাহ ছাড়া কোন পুরুষের সঙ্গে যৌন সম্পর্ক স্থাপন করলে নারীর মানসম্ভ্রমে আঘাত হানতে পারে- এই ধারণাও একেবারে বিদূরীত হল।[১১]

১১। আব্দুল খালেক, প্রাগুক্ত, পৃ-৭৯-৮১

Dhaka University Institutional Repository

আজকাল পাশ্চাত্য জগতে পতি-পত্নী নির্বাচনে প্রেমের খেলাই প্রধান উপকরণ হয়ে পড়েছে। যুবক-যুবতীরা প্রথমে পরস্পর পরিচিত হয়। তৎপর তারা মিলনের জন্য সময় ও স্থান নিরূপণ করে। সম্পর্ক পূর্ণতা লাভ করে এবং ক্রমশ উষ্ণতর হতে থাকে। অতঃপর অবাধ যাচাই-নিরীক্ষণ শুরু হয়। এতে তাকে প্রণয়তবে গলাগলি, সম্ভোগের পূর্বে কামোদ্দীপক কার্যাবলী ও প্রণয়পাশে আবদ্ধ হওয়া। এরূপে দীর্ঘকাল একত্রে বসবাস করার পর অপ্রত্যাশিতভাবে গর্ভসঞ্চার হয়ে পড়লে হয়ত এই যুবক-যুবতী বিবাহ সূত্রে আবদ্ধ হওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতেও পারে।

এই রীতি এখন পাশ্চাত্য জগতে সর্বজন সমর্থিত সাধারণ নিয়ম হিসেবে স্বীকৃত। যুবক-যুবতী তাদের প্রেমিক-প্রেমিকা নির্বাচনের পূর্বে পরীক্ষামূলকভাবে অপরাপর যুবক-যুবতীর সঙ্গলাভ করতে পারে। অপ্রত্যাশিতভাবে যুবতীরা যাতে পর্ভবতী না হয়ে পড়ে তজ্জন্য তাদেরকে যথেষ্ট পরিমাণে গর্ভনিরোধের দ্রব্যাদি দেওয়া হয় এবং এই সকল দ্রব্য ব্যবহারের বিষয়ে তাদেরকে যথোপযুক্ত শিক্ষাও প্রদান করা হয়ে থাকে। মাতাগণও কন্যাদেরকে এই সকল দ্রব্য ব্যবহারের কায়দা-কৌশল শিক্ষা দিয়ে থাকে। নবাগতদের অবগতির জন্য গর্ভনিরোধ দ্রব্যাদির ব্যবহার সম্পর্কে স্কুল কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত প্রচার পত্র বের করে এবং বিশেষ শিক্ষা কোর্সের প্রবর্তন করে। এর অর্থ হল, সকলেই নিঃসংকোচে মেনে নিয়েছে যে, যুবক-যুবতীরা অবৈধ যৌন সম্ভোগ করবেই। কোন কোন চার্চ প্রধানও বর্তমানে সর্বজনন সমর্থিত রীতিনীতি অনুসারে নৈতিকতার পুরাতন মূল্যোবোধে পরিবর্তন সাধনের কথা বলে থাকেন।

ড. এলেক্সিস ক্যারেল (Dr. Alesis Carrel) তাঁর Man the unknown গ্রন্থে বলেন-

বর্তমানে সমাজে নৈতিক মূল্যবোধ প্রায় সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষিত হয়েছে। বস্তুত এর বহিঃপ্রকাশ আমরা রুদ্ধ করে রেখেছি। সকলেই দায়িত্ব জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছে। যারা ভাল-মন্দ পার্থক্য করে, যারা অধ্যবসায়ী ও বিচক্ষণ, তারা দরিদ্র থাকে এবং তাদেরকে অনুন্নত বলে গণ্য করা হয়। যে মহিলার কয়েকটি সন্তান আছে, সে যদি স্বীয় জীবনের সুখ-সম্ভোগ পরিত্যাগ করে তাদের শিক্ষা-দীক্ষার প্রতি মনোনিবেশ করে, তবে তাকে দুর্বলচিত্ত বলে আখ্যায়িত করা হয়ে থাকে। .... দস্যুরা পরম শান্তিতে সম্পদ ভোগ করে চলছে। রাজনীতিবিদগণ দুর্বৃত্তদেরকে পোষণ করেন এবং বিচারক তাদেরকে সম্মান করেন। ... সমকাম জাঁকালোভাবে চলছে। যৌন সংক্রান্ত বিধি-বিধান বর্জিত রয়েছে। .... এবং এরূপে বৈজ্ঞানিক সভ্যতার চাকচিক্য বিরাজমান থাকা সত্ত্বেও মানবতার অবসান ঘটছে।[১২]

১২। Thomas J. Cottle : The sexual Revolution and the young. The New york time Magazine, November, 26.1972.

Dhaka University Institutional Repository

জর্জ র‍্যালী স্কট (Gerge Ryley Scott) তাঁর A History of Prostitute গ্রন্থে তাঁর স্বদেশ ইংল্যান্ডের অবস্থা বর্ণনা করে বলেন ঃ

যে সকল নারী দেহভাড়া দেওয়াকেই তাদের জীবিকা অর্জনের একমাত্র পন্থা হিসেবে গ্রহণ করেছে, তাদেরকে বাদ দিলেও আর এক শ্রেণীর নারী আছে এবং তাদের সংখ্যা দৈনন্দিন বেড়ে চলেছে। তারা জীবনের আবশ্যকীয় দ্রব্যসম্ভার লাভের জন্য অন্যান্য পন্থাও অবলম্বন করে এবং যাতে অতিরিক্ত দুই পয়সা অর্জন করতে পারে, এজন্য আনুষঙ্গিকভাবে ব্যভিচারেও লিপ্ত হয়। ব্যবসায়ী পতিতা এবং তাদের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই, পার্থক্য কেবল এই, তাদেরকে পতিতা নামে অভিহিত করা হয় না। আমরা অবশ্য তাদেরকে পেশাহীন পতিতা বলে আখ্যায়িত করতে পারি।

এ সকল কামাতুন পেশাহীন পতিতার সংখ্যা আজকাল যে পরিমাণে দেখা যায়, ইতিপূর্বে কখনও এরূপ দেখা যায়নি। সমাজের উচ্চ-নীচ সকল স্তরেই এই শ্রেণীর রমনী দেখা যায়। এই সমস্ত সম্ভ্রান্ত (?) রমণীকে আকার-ইঙ্গিতেও পতিতা বলা হলে তারা অগ্নিশর্মা হয়ে পড়ে। কিন্তু তাদের ক্রোধ ও অসন্তুষ্টি প্রকাশে, তাদের চাল চলনে বাস্তব ঘটনার কোনরূপ পরিবর্তন হয় না। বস্তুত পিকাডেলীর কুখ্যাত ও নির্লজ্জ পতিতা এবং তাদের মধ্যে বিন্দুমাত্র প্রভেদ নেই। .... অসৎ চাল-চলন এবং এই বিষয়ে নির্ভীকতা, এমনকি বাজারী চাল-চলন পর্যন্ত এখানকার যুবতীদের এক ফ্যাশন হয়ে দাঁড়িয়েছে।

বিবাহের পূর্বে নিঃসংকোচে অপরের সাথে যৌন সম্পর্ক স্থাপন করেছে এমন বালিকা ও রমণীর সংখ্যা দৈনন্দিন বেড়ে চলেছে। যে সকল সত্যিকার লজ্জা-নম্র কুমারী সতী বালিকাকে গির্জার উৎসর্গ বেদীর সম্মুখে শপথ গ্রহণ করতে দেখা যেত, তারা আজকাল একেবারে বিরল হয়ে পড়েছে। এই উচ্ছৃঙ্গলতার কারণ বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি বলেন-সাজ-সজ্জার তীব্র আকাঙ্খা যুবতীদের মধ্যে দুর্দমনীয় লালসার সঞ্চার করে। আর এর বশীভূত হয়েই নতুন নতুন ফ্যাশনের মূল্যবান বেশ-ভূষা ও সৌন্দর্য বর্ধনের বিবিধ দ্রব্য-সামগ্রীর প্রতি তারা মোহাবিষ্ট হয়ে পড়ে। সেই নীতি বিরুদ্ধ পতিতাবৃত্তিরই এটা অন্যতম প্রধান কারণ। মূল্যবান মনোরম বেশভূষায় সজ্জিত শত-সহস্র তরুণী ও যুবতীকে নিত্যই পথে-ঘাটে দেখতে পাওয়া যায়। প্রতিটি বিবেক সম্পন্ন ব্যক্তিই তাদেরকে দেখে বলবেন, সদুপায়ে অর্জিত অর্থ তাদের এমন মূল্যবান বেশভূষার ব্যয়ভার বহন করতে পারে না।

Dhaka University Institutional Repository

সুতরাং এ কথা বললে অত্যুক্তি হবে না, একমাত্র পুরুষই তাদের বেশভূষা খরিদ করে দেয়। আজ হতে পঞ্চাশ বছর পূর্বে এমন উক্ত করা যেমন নির্ভুল ছিল, এখনও তেমনই নির্ভুল আছে। তবে পার্থক্য এতটুকু, তখন যে সকল পুরুষ তাদের বেশভূষা ক্রয় করে দিত, তারা ছিল তাদের স্বামী, পিতা, ভ্রাতা। আর এখন তাদের পরিবর্তে ভিন্ন পুরুষ তা ক্রয় করে দেয়।[১৩]

এরূপ অবস্থার জন্য নারী স্বাধীনতাই বহুলাংশে দায়ী। বিগত কয়েক বছর হতে কন্যাদের প্রতি মাতাপিতার তত্ত্বাবধান ও রক্ষণাবেক্ষণ হ্রাস পেয়েছে, যার ফলে মেয়েরা আজকাল যতটুকু স্বাধীন ও বেপরোয়া হয়ে পড়েছে, ত্রিশ চল্লিশ বছর পূর্বে ছেলেরা এতটা বেপরোয়া হতে পারতো না।

সমাজে যৌন স্বেচ্ছাচারিতা ব্যাপক প্রসারের অপর একটি প্রধান কারণ হচ্ছে মেয়েরা ক্রমবর্ধমান সংখ্যায় ব্যবসা প্রতিষ্ঠান, অফিস ও অপরাপর ক্ষেত্রে চাকুরী গ্রহণ করছে। এই সকল স্থানে পুরুষের সাথে তাদের দিবারাত্র মেলামেশার সুযোগ হচ্ছে। এটা নারী-পুরুষের নৈতিক মানকে অতি নিম্নস্তরে নামিয়ে দিয়েছে। পুরুষ অগ্রবর্তী হয়ে কিছু করতে চাইলে এটা রোধ করবার ক্ষমতা নারীর থাকে না। ফলে উভয়ের মধ্যে যৌন সম্বন্ধ গড়ে ওঠে এবং এটা নৈতিকতার সকল বন্ধন ছিন্ন করে। আজকাল তথাকথিত অভিজাত এলাকার অনেক বিপথগামী যুবতী নারীর মনে বিবাহ ও পবিত্র জীবন-যাপনের ধারণা স্থানই পায় না। কেবল লম্পট শ্রেণীর লোকেই এক সময়ে যে মদান্দন সময়ের সন্ধান করত, এখন প্রায় তরুণই তা কামনা করে থাকে। কুমারীত্ব ও সতীত্বকে এখন প্রাচীন কালের কথা বলে মনে করা হয় এবং বর্তমানে যুগের যুবতীরা এটাকে বিপদ বলে গণ্য ক রে থাকে। যৌবনকালে যৌন সম্ভোগের রঙীন সুরা প্রাণভরে পান করতে হবে। তাদের মতে এটাই জীবনের আন্দ। এই জন্যেই তারা নৃত্যশালা, নৈশক্লাব, হোটেল, পতিতালয় প্রভৃতিকে কেন্দ্র করে ঘুরে বেড়ায়। এই অবস্থায়ই একেবারে অপরিচিত ধনাঢ্য ও ক্ষমতার পুরুষের সঙ্গে তারা আনন্দ অভিযানে বের হতে প্রস্তুত হয়। মোটকথা তারা স্বেচ্ছায় ও স্বজ্ঞানে নিজকে এমন পরিবেশে নিক্ষেপ করে এবং করে আসছে, যা স্বভাবতই পুরুষের মনে কামাগ্নি প্রজ্জ্বলিত করে থাকে। তৎপর এর অবশ্যম্ভাবী ও স্বাভাবিক যে পরিণাম ঘটে, সেটার জন্য তারা মোটেই সংকিত হয় না; বরং এটাকে অভিনন্দন জানায়। এ বেদনাদায়ক বর্ণনা আর দীর্ঘায়িত না করে এখানেই সমাপ্ত করলাম।[১৪]

১৩। আব্দুল খালেক, প্রাগুক্ত, পৃ-৮৬-৮৭।

১৪। আব্দুল খালেক, প্রাগুক্ত, পৃ-৮৭-৮৮।

Dhaka University Institutional Repository

অশ্লীলতার আধিক্য

নারী-প্রগতির করুণ কাহিনী এখানেই শেষ নয়। আরও একটু অগ্রসর হয়ে লক্ষ্য করুন। পেশাহীন পতিতাবৃত্তি দৈনন্দিন বৃদ্ধিই পেয়ে চলছে। এইজন্য পেশাধারী পতিতাবৃত্তি চরম সংকটের সম্মুখীন হয়েছে। কারণ আজকাল যুবকগণ পেশাধারী পতিতাদের অপেক্ষা ভদ্র (?) যুবতীদের সাথে যৌন সম্ভোগে অধিক আনন্দ পায় বলে মনে করে এবং এইজন্য পেশাদারী পতিতাদের গ্রাহক সংখ্যা দিন দিন হ্রাস পাচ্ছে।

বর্তমানে যৌন নীতির পরিবর্তনের ফলে পতিতাদেরকে ব্যবহার করার যে আবশ্যকতা যুবকদের এক সময়ে ছিল, তা এখন আর নেই।[১৫]

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পূর্বে ফ্রান্সের এটর্নি জেনারেল মশিয়ে বুলো এক রিপোর্টে বলেন-

'যে সকল নারী তাদের দেহ খাটিয়ে জীবিকা অর্জন করে, তাদের সংখ্যা পাঁচ লক্ষ। কিন্তু এখানকার দেহ-ব্যবসায়ী নারীদের সাথে ভারত-উপমহাদেশের বার নারীদের তুলনা করলে চলছে না। ফ্রান্স একটি সুসভ্য ও উন্নত দেশ। এখানকার যাবতীয় কার্য ভদ্রতা ও সুব্যবস্থার সাথে ব্যাপক আকারে কথা হয়ে থাকে। এখানে এ দেহ-ব্যবসায়ে বিজ্ঞাপনের সাহায্য নেওয়া হয়। সংবাদপত্র, চিত্র, কার্ড, টেলিফোন, ব্যক্তিগত আমন্ত্রণপত্র ইত্যাদি সর্বপ্রকার শিষ্টাচারসুলভ পন্থায় গ্রাহকের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়ে থাকে। মানুষের বিবেক কখনও এ সমস্ত কার্যের জন্য তিরস্কার করে না; বরং যে সকল নারী এ ব্যবসায়ে অধিকতর ভাগ্য গড়ার সুযোগ পায়, তারাই অধিকাংশ সময়ে দেশের রাজনীতি, অর্থনীতি এবং সম্ভ্রান্ত শ্রেণীতে যথেষ্ট কর্তৃত্ব করতে পারে। গ্রীক সভ্যতার যুগে এই প্রকার নারীর যেরূপ উন্নতি হয়েছিল, তাদেরও তদ্রূপ হয়েছে।'

১৫। Reuter-Dawn, Jan-7, 1952.

Dhaka University Institutional Repository

পল ব্যুরো বলেন-

এটা একটি শক্তিশালী প্রতিষ্ঠান। সুসংগঠিত উপায়ে বেতনভোগী উচ্চপদস্থ অফিসার ও কর্মচারী দ্বারা এটা পরিচালিত হচ্ছে। প্রচারক, লেখক, বক্তা, চিকিৎসক, ধাত্রী ব্যবসায়ী এবং পর্যটক এখানে চাকুরী করে। এতে বিজ্ঞাপনের সাহায্য লওয়া হয় এবং প্রদর্শনীর নতুন নতুন পন্থা অবলম্বন করা হয়ে থাকে।

এতদ্ব্যতীত রাস্তা-ঘাট, চায়ের দোকান, হোটেল, নৃত্যশালা ইত্যাদিতে প্রকাশ্যভাবে যৌন সম্ভোগ চলে।

প্রথম মহাসমরে যে সমস্ত দেশপ্রেমিকা নারী ফরাসী দেশের নিরাপত্তা রক্ষাকারী বীরগণের মহান সেবা করে পিতৃহীন জারজ সন্তান লাভ করেছিল, তারা War God Mothers(যুদ্ধমাতা দেবী) এর সম্মান সূচক উপাধিতে ভূষিত হয়।

আমেরিকায় যে সমস্ত নারী পতিতাবৃত্তিকে তাদের স্থায়ী জীবিকা অর্জনের উপায়রূপে গ্রহণ করেছে, তাদের সংখ্যা চার হতে পাঁচ লক্ষের মধ্যে। কিন্তু আমেরিকার পতিতাদেরকে এদেশের পতিতাদের অনুরূপ মনে করা চলবে না। কারণ তারা বংশানুক্রমে পতিতা নয়। এমনও নারী আমেরিকার পতিতা, যে গতকাল পর্যন্ত কোন স্বাধীন ব্যবসা অবলম্বন করেছিল। অসৎ সংসর্গে পড়ে চরিত্র নষ্ট হয়েছে এবং পতিরালয়ে আশ্রয় নিয়েছে। এখানে সে কিছুকাল কাটাবে। তৎপর পতিতাবৃত্তি ছেড়ে কোন অফিস বা কারখানায় চাকুরী গ্রহণ করবে। জরীপে জানা গেছে, আমেরিকার পতিতাদের শতকরা পঞ্চাশজন গৃহ-চাকরাণীদের মধ্য হতে পতিতাবৃত্তি অবলম্বন করে। বাকী পঞ্চাশজন হাসপাতাল, অফিস ও দোকানের চাকুরী ছেড়ে পতিতালয়ে যায়। সাধারণত পনের বিশ বছর বয়সে এই ব্যবসা শুরু করা হয়ে থাকে এবং পঁচিশ-ত্রিশ বছর বয়সের সময় পতিতালয় ত্যাগ করে আবার তারা স্বাধীন বাবসা আরম্ভ করে।[১৬]

১৬। Prostitution in the U.S.A.P-64-69.

Dhaka University Institutional Repository

পাশ্চাত্য দেশসমূহে পতিতাবৃত্তি এখন আর ব্যক্তিগত ব্যাপার নয় এবং এটা একটি সুসংগঠিত আন্তর্জাতিক ব্যবসায়ে পরিণত হয়েছে। আমেরিকার নিউইয়র্ক, রিউ-ডি জেনিরিও, বুয়েন্সআয়ার্স এ ব্যবসায়ের কেন্দ্রস্থল। এ ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের স্বতন্ত্র ব্যবস্থাপক সংস্থা আছে। এর সভাপতি ও সম্পাদক যথারীতি নির্বাচিত হয়ে থাকে। যুবতীদেরকে ফুসলিয়ে আনার জন্য হাজার-হাজার দালাল নিযুক্ত আছে।

আমেরিকায় নৈতিক সংস্থার সাধনের উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত Committee Fourteen এর রিপোর্টে প্রকাশ, সেখানকার সকল নৃত্যশালা, নৈশক্লাব, সৌন্দর্যশালা, মালিশ কক্ষ, হস্ত কমনীয় করণের দোকান এবং কেশ বিন্যাসের দোকান প্রায় পতিতালয়ে পরিণত হয়েছে। বরং এগুলোকে পতিতালয় হতে নিকৃষ্ঠতর বললেও অত্যুক্তি হবে না। কারণ এগুলোর মধ্যে যে সমস্ত অপকর্ম করা হয়ে থাকে, তা ভাষায় ব্যক্ত করা যায় না।

নারী প্রগতির বদৌলতে পাশ্চাত্য জগতে শান্তিপূর্ণ ও বিবাহিত জীবন একেবারে দুর্লভ হয়ে পড়েছে। জারজ সন্তানের সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধিই পাচ্ছে। ফ্রান্সে প্রতি বছর সাতাত্তর হাজার জারজ সন্তান জন্ম গ্রহণ করে। ১৯৪৬ খ্রিষ্টাব্দে Diocesan Conference-এ উপস্থাপিত রিপোর্ট ইংল্যান্ড সম্পর্কে বলা হয়।

ইংল্যান্ড ও ওয়েলসে যে সকল সন্তান জন্মগ্রহণ করে, বিবাহ বন্ধনের পূর্বে তারে প্রতি আটশনের মম্যে একজনের গর্ভবাস হয়ে থাকে। প্রতি বছর ইংল্যান্ড ও ওয়েল্সের এক লক্ষ নারী বিবাহের পূর্বে গর্ভবতী হয়। বিশ বছরের কম বয়সে যে সব বালিকার বিয়ে হয়, তন্মধ্যে বিয়ের দিন যারা গর্ভবতী থাকে, তাদের সংখ্যা শতকরা চল্লিশের নিচে নয়।[১৭]

গর্ভনিরোধের যে সকল যন্ত্রপাতি ও বটিকা আজকাল পাশ্চাত্যে ব্যবহৃত হয়ে থাকে এবং এ বিষয়ে যে বিশেষ শিক্ষা প্রদান করা হয় এটা সত্ত্বেও গর্ভসঞ্চার হওয়া একমাত্র Accident-দৈব দুর্বিপাক ছাড়া আর কি হতে পারে? এমতাবস্থায় যারা বিয়ের দিনে গর্ভবতী ছিল না, তাদেরকে কি আমরা সে দিন পর্যন্ত সতী-সাধ্বী কুমারী বলে ধরে নিতে পারি।

১৭। আব্দুল খালেক, প্রাগুক্ত, পৃ-৯১-৯২।

Dhaka University Institutional Repository

কিন্তু সে রিপোর্টে প্রকাশ, আমেরিকার পুরুষ অধিবাসীদের শতকরা পঁচানব্বই জন প্রচলিত নৈতিকমান অনুসারে নৈতিক দোষে দুষ্ট। চার-পাঁচ বছরের শিশুদেরকেও যৌন অপরাধে লিপ্ত পাওয়া যায়। বিবাহের পূর্বে যৌন মিলন-দৈনন্দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। ডাক্তারগণ বলেন-

অর্থাৎ-'কলেজগামী পুরুষদের শতকরা ৬৭ জন বিবাহের পূর্বে যৌন সম্ভোগ করে থাকে। হাই স্কুলগামীদের মধ্যে শতকরা প্রায় ৮৪ জন এরূপ সম্ভোগ লাভ করে এবং যে সকল বালক গ্রেড স্কুল ছেড়ে যায় না তাদের সংখ্যা শতকরা ৯৮ জন।'[১৮]

আমেরিকার নারী জনসংখ্যা সম্পর্কে কিন্‌সে রিপোর্টে বলেন-

আমেরিকার নারীদের শতকরা ৫০ জন বিয়ের পূর্বে সতীত্ব নট করে। শতকরা ২৫ জনেরও বেশী বিবাহিত অবস্থায় ভিন্ন পুরুষের সাথে যৌন সম্পর্ক স্থাপন করে এবং বিশ্বাসভঙ্গের জন্য তাদের স্বামীদের নিকট দুঃখও প্রকাশ করে না। শতকরা ২০ সমকাম করে, শতকরা ৬২ জন হস্তমৈথুন করে এবং শতকরা ৯৫ জন আদরে বশীভূত হয়ে পড়ে। যৌন অপরাধ ও অন্যায় প্রবণতা কলেজের ছাত্রী শিক্ষিতা নারীদের মধ্যেই বেশী দেখা যায়।

শতকরা ৪৩ জন নারী যৌন সংক্রান্ত অপকর্মের শিক্ষা সংক্রান্ত ছাপানো পুস্তিকা, প্রচারপত্র এবং তাদের জন্য গৃহীত বিশেষ শিক্ষা কোর্স হাতে পেয়ে থাকে। অথচ এই সমস্ত অপকর্ম হতে বিরত রাখার জন্যই এই সকল পুস্তক-পুস্তিকা প্রচারপত্র এবং শিক্ষা কোর্সের প্রবর্তন করা হয়।

যারা ধর্ম অনুসরণ করে চলে, কেবল তারাই তুলনামূলকভাবে সুন্দর জীবন-যাপন করে থাকে। ধর্মপরায়ণতাই যৌন উচ্ছৃঙ্খলতা দমনের সুসংহত শক্তিশালী উপায়।

রেডবুক ম্যাগাজিনে জরীপে প্রকাশ, আমেরিকার বিবাহিতা নারী শতকরা নব্বইজনই বিয়ের পূর্বে যৌন অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে।

১৮। Sexual Behaviour in Human Male, P.552

Dhaka University Institutional Repository

উপরোক্ত পরিসংখ্যান ও আলোচনা হতে পরিস্কাররূপে প্রমাণিত হয় ধর্ম বিবর্জিত ধনতান্ত্রিক উন্নতি বস্তুতান্ত্রিক প্রাচুর্যে নৈতিক মূল্যবোধের অধঃপতন ঘটে, মানুষের আচার-আচরণ কুলষিত হয়, পাপ ও অপবিত্রতা বৃদ্ধি পায় এবং ইতর ও অমার্জিত রুচিসম্পন্ন গর্হিত কার্যাবলী প্রাধান্য লাভ করে, আর মানুষের হিতাহিত জ্ঞান লোপ পায়।[১৯]

যৌন ব্যাধি

সিফিলিস-প্রমেহ ঃ সৃষ্টিগতভাবেই নারী-পুরুষ উভয়ের প্রতি উভয়ের স্বাভাবিক আকর্ষণ আছে। নারীর দৈহিক গঠন, অঙ্গ-সৌষ্ঠব, লাবণ্য, কণ্ঠস্বর, চলনভঙ্গি যুবকদের আকর্ষণ না করে পারে না। তদুপরি সমাজে নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশা, অশ্লীল সাহিত্য ও প্রচার পত্রের প্রসা, নারীদের উলঙ্গ ছবি, চলচ্ছিত্র, নৃত্য-গীতি ইত্যাদি যুবক-যুবতীদের যৌন উন্মাদনা সীমা অতিক্রান্ত করে দেয়। মানবীয় ইন্দ্রীয়সমূহের প্রবল উত্তেজনা ও পরম তৃষ্ণার সঞ্চার করে। এতে যুবক-যুবতীরা সহজেই অতিরিক্ত যৌ সম্ভোগে প্রবৃত্ত হয় এবং নানাবিধ রতিজ ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে পড়ে। ফলে নৈতিক ও দৈহিক শক্তির দিক দিয়ে বহু যুবক-যুবতী অকালে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়।

বিশেষজ্ঞদের ধারণা, আমেরিকার শতকরা ৯০ জন অধিবাসী রতিজ ব্যাধিতে আক্রান্ত। সেখানকার সরকারী হাসপাতালগুলোতে প্রতি বছর গড়ে ২ লক্ষ সিফিলিস এবং ১ লক্ষ ৬০ হাজার প্রমেহ রোগীর চিকিৎসা করা হয়। ৬৫ টি চিকিৎসালয় অপেক্ষা বেসরকারী চিকিৎসকের নিকট রোগীর ভীড় আরও অনেক বেশী হয়ে থাকে। এই সকল চিকিৎসালয়ে শতকরা ৬১জন সিফিলিস ও ৮৯ জন প্রমেহ রোগীর চিকিৎসা হয়ে থাকে।[২০]

আমেরিকায় প্রতি বছর ৩০-৪০ হাজার শিশু জন্মগত সিফিলিস রোগে মৃত্যুবরণ করে। কঠিন জ্বর ছাড়া অন্যবিধ রোগে যত মৃত্যু ঘটে, তন্মধ্যে সিফিলিস রোগজনিত মৃত্যুর হারই অত্যধিক।

১৯। আব্দুল খালেক, প্রাগুক্ত, পৃ-৯৩-৯৪।

২০। An encyclopaedia of Britarica, part-23, p-45.

Dhaka University Institutional Repository

প্রমেহ রোগে যুবকদের শতকরা ৬০ জনই আক্রান্ত হয় বলে বিশেষজ্ঞদের ধারণা। এতে বিবাহিত অবিবাহিত উভয় প্রকার লোকই রয়েছে। স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞগণ ঐকমত্য পোষণ করেন যে, যে সমস্ত বিবাহিতা নারীদের দেহে অস্ত্রোপচার করা হয়, তাদের শতকরা ৭৫ জনের মধ্যেই সিফিলিস জীবানু পাওয়া যায়।[২১]

ফ্রান্সের বিশেষজ্ঞ ডাক্তার ল্যারেড (Dr. Laredde) বলেন ঃ

ফ্রান্সে প্রতি বছর কেবল সিফিলিস ও তজ্জনিত রোগে ত্রিশ হাজার লোক মারা যায়। জ্বরের পর এটাই হচ্ছে মৃত্যুর সর্ববৃহৎ কারণ। একটি মাত্র রতিজ রোগেরই এই অবস্থা। এতদ্ব্যতীত এই ধরণের আরও অনেক ব্যাধি আছে।

এইড্‌স ঃ অবাধ যৌন মিলনের ফলে 'এইডস' নামক একটি রতিজ রোগ সাম্প্রতিককালে দেখা দিয়েছে। এটা এত মারাত্মক যে, এই রোগে আক্রান্ত রোগীর কোন আরোগ্য নেই।

আমেরিকাতে সমকামে অভ্যস্ত লোকদের মধ্যে এটা সর্বপ্রথম প্রকাশ পায় বলে সমকাম হতেই এর উৎপত্তি বলে ধারণা করা হত। কিন্তু এ ধারণা এখন পরিবর্তিত হয়েছে। সমকাম ছাড়াও নারী-পুরুষের অবাধ যৌন মিলনেই এর উৎপত্তি বলে প্রমাণিত হচ্ছে। এ রোগের জীবানু একবার দেহে সংক্রমিত হলে দেহ একেবারে বিকল হয়ে পড়ে এবং অন্যান্য রোগে অতি সমজেই আক্রান্ত হয়। এর জীবানু অন্যের দেহে সংক্রমিত হয়ে পড়ে।

There is no cure. AIDS is a dead end street এটা AIDS Kill. এইড্‌সের কোন প্রতিষেধক নেই। এটা নিশ্চিত মৃত্যুর পথ; এইড্‌স মেরে ফেলে।

২১। Dr. Lowry, Herself, p-204.

Dhaka University Institutional Repository

Indian Council for Medical Research এর ডিরেক্টর জেনারেল আবতার সিংহ, পেইন্‌টাল বলেন ঃ

we used to think our women were charte. But people would be horrified at the level of promiscuity here. [২২]

আমাদের নারীদেরকে আমরা সতী বলে মনে করতাম। কিন্তু অবৈধ যৌন কর্ম এখানে এত বৃদ্ধি পাচ্ছে যে, লোকে এতে ভীত না হয়ে পারে না।

গবেষকগণ এইড্‌স রোগকে একটা চ্যালেঞ্জ হিসেবেই গ্রহণ করেছেন। কারণ এটা তাঁদের সম্মুখেই সৃষ্টি হয়েছে। অপরাপর ব্যাধি দু'হাজার বছর পূর্ব হতেই চলে আসছে এবং অনেক প্রাণহানি ঘটিয়েছে। এইসব ক্ষেত্রে তাঁদের বিশেষ কিছু করার নেই। কিন্তু এইড্‌সের বেলায় Indian Council for Medical Research-এর অন্যতম প্রধান ডাক্তার প্রেম রাম চন্দন বলেন ঃ

এইড্‌স এর বেলায় আমরা নিতান্ত সুবিধাজনক অবস্থায় রয়েছি। আমরা জানি, যৌন মিলনের রীতি পরিবর্তন দ্বারাই আমরা এর প্রতিরোধ করতে পারি। এর অর্থ হল, এটা ব্যাপক মহামারীর আকারে বিস্তার লাভ করে আমাদের নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাওয়ার পূর্বেই আমাদের সাবধানতা অবলম্বন করা আবশ্যক। ডাক্তার অবতার সিং পেইন্‌টাল বিবাহ বন্ধনের বাইরে যৌন সম্ভোগ নিষিদ্ধ করে আইন প্রণয়ণের দাবী করেছেন, যেন আইনের অধীনে অপরাধীদের শাস্তি, জেল বা জরিমানা হতে পারে। তিনি বলেনঃ Ben sex with forigeners and NRIS. [২৩]

২২। আব্দুল খালেক, প্রাগুক্ত, পৃ-৯৬-৯৮।

২৩। India today, July 31, 1988, p-67-68, International ed.

Dhaka University Institutional Repository

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার ডিরেক্টর জেনারেল ডাক্তার হিরোশি নাকাজিমা বলেন ঃ

জনসাধারণের মধ্যে এইড্‌স বিস্তার লাভ করলে জাতি বিশেষ একেবারে ধ্বংস হয়ে যেতে পারে। এমনকি সমগ্র মানবজাতিরও বিলুপ্তি ঘটতে পারে।[২৪]

২০০৪ সালের ডিসেম্বরে প্রদত্ত বিশ্ব স্বাস্থ্য (WHO) এবং ইউএনএইড (UNAIDS) এর তথ্য অনুযায়ী সারা বিশ্বে মোট ৩ কোটি ৯৪ লক্ষ মানুষ এইচআইভি-তে আক্রান্ত। এদের মধ্যে ১ কোটি ৭৬ লক্ষ জন হচ্ছে নারী এবং ১৫ বছরের বম বয়সী শিশু রয়েছে ২২ লক্ষ।

অঞ্চল ভিত্তিক হিসেবে সাব-সাহারান আফ্রিকায় ২ কোটি ৫৪ লক্ষ মানুষ এইচআইভি আক্রান্ত। এর পরের স্থানটি দক্ষিণ এবং দক্ষিণ পূর্ব-এশিয়া। এখানে প্রায় ৭১ লক্ষ মানুষ এইচআইভি-তে আক্রান্ত। এ ছাড়া পূর্ব ইউরোপ ও মধ্য এশিয়ায় ১৪ লক্ষ, উত্তর আমেরিকায় ১০ লক্ষ এবং ওশেনিয়ায় ৩৫ হাজার এইচআইভি আক্রান্ত মানুষ রয়েছে।[২৫]

বাংলাদেশে সরকারী হিসেব অনুযায়ী ডিসেম্বর ২০০৪ পর্যন্ত এইচ আইভি/এইড্‌স এ আক্রান্ত ৪৬৫ জন মানুষ সনাক্ত করা গেছে।

UN AIDS Report on the global HIV/AIDS epidemic. ২০০২ এর তথ্য অনুযায়ী ২০০১ সালের শেষে বাংলাদেশের ১৩,০০০ জন মানুষ এইচ, আইভি-তে আক্রান্ত বলে অনুমান করা হয়েছে।[২৬]

২৪। The new straits Times, kuala Lumpur, Malaysia, June 23, 1988.
২৫। UN AIDS and WHO: AIDS epidemic update. December, 2004. p-1-3.
২৬। UN AIDS : Report on the global HIV/AIDS epidemic, 2002, p-194
জাতীয় এইডস/এসটিডি কর্মসূচী (NASP) হ্যান্ড অডিট, ডিসেম্বর ১, ২০০৪।

Dhaka University Institutional Repository

যুবক-যুবতীর উপর যৌন প্রভাব

ধর্মহীন পাশ্চাত্য দুনিয়াটাই যৌন প্রবণতা উত্তেজিত করার এক পরিপূর্ণ বারুদ কারখানায় পরিণত হয়েছে এবং এই উত্তেজনা নিঃসংকোচে চরিতার্থ করার যাবতীয় উপায়-উপাদানও এতে প্রচুর পরিমাণে বিদ্যমান রয়েছে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর বিস্ময়কর দ্রুততার সাথে অশ্লীল সাহিত্য ও প্রচার পত্রের মাধ্যমে নির্লজ্জতার যে ব্যাপক প্রচার কার্য চলেছে, চলচ্চিত্রসমূহ কেবল সমকাম প্রেম-প্রবণতাকে উত্তেজিত করেই ক্ষান্ত থাকেনি। বরং এর বাস্তব শিক্ষাও দান করছে এবং নারীদের উলঙ্গ ছবি সর্বত্র প্রদর্শিত হচ্ছে ও নারী পুরুষের অবাধ মেলামেশা অবাধ গতিতে চলছে। এমতাবস্থায় যে সমস্ত যুবক-যুবতীর মধ্যে কণামাত্র উষ্ণ শোণিতও বিদ্যমান আছে, তাদের আবেগ-অনুভূতি আলোড়িত না হয়ে পারে না। আগুনের সংস্পর্কে মোম গলবে না, এমন ধারণা করাই বাতুলতা। সুতরাং কামরিপু জাগ্রত করার যাবতীয় উপায়-উপাদানে পরিপূর্ণ উত্তেজনাব্যঞ্জক পরিবেশ যে সমাজে বিরাজিত, সেখানে অবাধ গতিতে যৌনলীলা চলতে থাকবে, এতে বিস্ময়ের কি থাকতে পারে? আর এইরূপ পরিবেশে অপরিনত বয়সেই যৌন ক্ষুধার তীব্রতা পরিলক্ষিত হয়ে থাকে।

আমেরিকার তরুণ সম্প্রদায়ের অবস্থা বর্ণনা করে জর্জ বেন লিন্ডসে বলেনঃ নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বেই আমেরিকার বালক-বালিকাগণ সাবালক হতে শুরু করেছে। তাদের মধ্যে অতি অল্প বয়সেই যৌন প্রবণতার উন্মেষ ঘটে থাকে। উদাহরণস্বরূপ, তিনি তিনশত বারজন বালিকার অবস্থা পরীক্ষা করেন। এতে তিনি অবগত হন, এগার হতে তের বছর বয়সেই তাদের ২৫০ জন সাবালিকা হয়েছে এবং তাদের মধ্যে এত তীব্র যৌনতৃষ্ণা ও দৈহিক চাহিদার লক্ষণ দেখা দিয়েছে যে, আঠার বছর বয়স্কা বালিকার মধ্যেও এমন হওয়া সম্ভব নয়।[২৭]

২৭। George Lidsey, Revolt of Modern Youth, p-82-87.

Dhaka University Institutional Repository

ডাক্তার ইডিথ হুকার বলেন ঃ

বিশিষ্ট ভদ্র ও ধনীদের মধ্যে অতি সাধারণ ব্যাপার যে, সাত-আট বছর বয়সের বালিকা সম বয়সের বালকের সাথে প্রণয়-সম্পর্ক স্থাপন করে এবং অধিকাংশ সময় তারা যৌনকর্মও করে থাকে।-- সাত বছরের একটি বালিকা তার বড় ভাই ও কতিপয় বন্ধুর সঙ্গে যৌনকর্ম করে এবং অপর দু'টি বালিকা অপরাপর সমবয়সী বালক-বালিকাদেরকেও যৌনকার্যে উস্কানি দেয়। এই দলের সকলের বড় বালিকাটির বয়স ছিল দশ বছর। তথাপি সে বিভিন্ন প্রেমিককে প্রেম-নিবেদনের গৌরব লাভ করে।[২৮]

পাশ্চাত্যের যুবক-যুবতীদের পরিবেশই তাদের মধ্যে অতি অল্প বয়সের যৌন স্পৃহা জাগ্রত করে দেয়। এর পরিণাম অতি ভয়াবহ ও মারাত্মক না হয়েই পারে না। অল্পবয়স্কা বালিকাগণ বন্ধুদের সাথে গৃহ হতে পলায়ন করে এবং প্রেম খেলায় অকৃতকার্য হয়ে আত্মহত্যা করে।

আমেরিকার বিদ্যালয়সমূহে অশ্লীল সাহিত্যের চাহিদাই সর্বাপেক্ষা অধিক। যুবক-যুবতীরা এইসব অধ্যয়ন করে আসল কার্যে অবতীর্ণ হয়। বালকদের বিদ্যালয়সমূহে সমকাম (Homo sexuality) ও হস্ত মৈথুন (Masturbation) অবাধ গতিতে চলে। আর বালক-বালিকাদের সহশিক্ষার বিদ্যালয়গুলোতে কামোদ্দীপনা উত্তেজিত করার উপায়-উপকরণের সাথে তা চরিতার্থ করার সামগ্রীও সঙ্গেই পাওয়া যায়। সুতরাং তারা ভরা যৌবন পরিপূর্ণভাবেই উপভোগ করে।

জর্জ লিন্ডসে বলেন ঃ সোপানসমূহে এর অনুপাত আরও অনেক বেশী। তিনি আরও বলেনঃ হাই স্কুলের বালকগণ বালিকাগণের তুলনায় যৌন তৃষ্ণার দিক দিয়ে বহু পশ্চাতে। বালিকাগণই সাধারণত অগ্রবর্তী হয়ে থাকে। আর বালকগণ তাদের ইঙ্গিতে নাচে।[২৯]

২৮। Dr. Eddit Hooker, Laws of sex. p.328

২৯। George Lindsey, OP-cit, p-86.

Dhaka University Institutional Repository

নারীত্বের বিলোপ সাধন

পোশাক-পরিচ্ছদ, বেশ-ভূষায় ও চাল-চলনে পুরুষের সমপর্যায়ে উপনীত হওয়ার একান্ত বাসনায় নারী তার আসল নারীত্বেরই বিনাশ সাধন করেছে। ডরথি টমসন বলেনঃ পুরুষের সমপর্যায়ে অবস্থান করে নারী তার নারীত্ব হারিয়ে ফেলেছে।[৩০]

পারিবারিক বিশৃঙ্খলা, তালাক ও বিচ্ছেদ

নারী-পুরুষের সুদৃঢ় ও স্থায়ী সম্পর্ক দ্বারাই পারিবারিক শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত হয়ে থাকে। এরই মাধ্যমে মানুষের ব্যক্তিগত জীবন সামাজিক জীবনে রূপান্তরিত হয়। এই সম্পর্কের কারণেই সে জীবনে স্থৈর্য ও স্থায়িত্ব এবং সম্প্রীতি ও শান্তি লাভ করে। নারী পুরুষের এই সুমধুর সম্পর্কের নাম বিবাহ। এই সম্পর্কের অধীনেই ভবিষ্যৎ বংশধরগণ প্রেম-প্রীতি ও ভালবাসার সুখময় পরিবেশে সুশিক্ষিত, চরিত্রবান ও সুনাগরিকরূপে গড়ে উঠতে পারে।

কিন্তু যে সভ্যতায় বিয়ে দূষণীয় এবং পতিতাবৃত্তি উৎকৃষ্ট রীতিতে পরিণত হয়েছে সে সমাজে নারী-পুরুষের হৃদয় হতে বিয়ে ও এর সুমহান উদ্দেশ্যের ধারণাই বিলীন হয়েছে। যে সমাজে কামতার চরিতার্থ করা ছাড়া যৌন মিলনের অপর কোন লক্ষ্যই থাকে না, সেখানে কামাতুর যুবক-যুবতীরা ভ্রমরের ন্যায় এক ফুল হতে অন্য ফুলে কেবল মধু আহরণ করে বেড়ায়, এমন স্থানে পারিবারিক শৃঙ্খলা স্থাপনের কোন সম্ভাবনাই থাকতে পারে না। এমন সমাজের নারী-পুরুষ দাম্পত্য জীবনের মহান কর্তব্য ও দায়িত্ব বহনের যোগ্যতাই হারিয়ে ফেলে। এতে ভবিষ্যত বংশধরগণ নিকৃষ্ট হতে নিকৃষ্টতর হতে থাকে এবং অবশেষে স্বার্থপরতা ও স্বেচ্ছাচারিতা বৃদ্ধি পেয়ে সভ্যতার বন্ধনও ছিন্ন হয়ে পড়ে। আধুনিক সভ্যতায় পাশ্চাত্য জগতে খুব কম সংখ্যক লোকই বিয়ে বন্ধনে আবদ্ধ হয় এবং যে সকল বিয়ে সংঘটিত হয়, সেগুলোর অধিকাংশই ভেঙ্গে যায়।

ফ্রান্সে প্রতি বছর প্রতি হাজারে সাত-আটজন নারী পুরুষের বিয়ে হতে থাকে এবং বিয়ে করে পবিত্র ও সৎভাবে জীবন-যাপনের উদ্দেশ্য তাদের অধিকাংশেরই থাকে না। যে নারী অবৈধ সন্তান প্রসব করেছে, বিয়ে করে স্বামী দ্বারা এই সন্তানকে বৈধ ঘোষণা করে নেওয়ার উদ্দেশ্যেও অনেক নারী বিয়ে করে থাকে এবং এই উদ্দেশ্যে সফল হওয়ার পরই বিবাহ বন্ধন ছিন্ন হয়ে পড়ে।

৩০। আব্দুল খালেক, প্রাগুক্ত, পৃ-১০০।

Dhaka University Institutional Repository

মোটকথা পাশ্চাত্য জগতে বিয়ে খুব কমই হয়ে থাকে এবং বৈবাহিক বন্ধনও অত্যন্ত দূর্বল হয়ে পড়েছে। ফ্রান্সে কয়েকবার মন্ত্রীপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন এমন এক সম্মানিত ব্যক্তি বিয়ের পাঁচ ঘন্টা পরই বিয়ের বিচ্ছেদ ঘটান। সীনের আদালতে একবার একই দিনে ২৯৪টি বিয়ের বিচ্ছেদ ঘটে। ১৮৪৪ সালে বিয়ের নতুন আইন পাশ হওয়ার সময় চার হাজার বিয়ের বিচ্ছেদ ঘটে। ১৯০০ খ্রিষ্টাব্দে এই সংখ্যা সাত হাজারে এবং ১৯১৩ সালে একুশ হাজারে পৌঁছে।[৩১]

উল্লিখিত অবস্থায়, পারিবারিক শৃঙ্খলা ও বৈবাহিক সম্পর্ক অক্ষুন্ন থাকবে এরূপ আশা করাই বৃথা। যে সমস্ত নারী কামভাব চরিতার্থ করা ছাড়া জীবনে পুরুষের আবশ্যকতা অনুভব করে না এবং বিয়ে ছাড়াই অবাধে যৌন সম্ভোগ করতে পারে তাদের জন্য বিয়েই অনাবশ্যক। একমাত্র কারো প্রতি প্রেমাসক্ত হয়ে পড়লেই তারা বিয়েতে বাধ্য হয়। সাময়িক উত্তেজনার কারণেই এরূপ প্রেমাসক্তি জন্মে এবং উত্তেজনা শিথিল হয়ে পড়লেই এটা আর থাকে না। অবশেষে বিচ্ছেদ ও তালাক সংঘটিত হয়। জর্জ লিন্ডসে বলেন ঃ

১৯২২ খ্রিষ্টাব্দে ডেনভারের প্রতিটি বিয়েই বিচ্ছেদে পরিণত হয় এবং প্রতি দু'টি বিয়েতে একটি করে তালাকের মামলা হয়। আমেরিকার প্রায় প্রতিটি শহরেই এরূপ ঘটনা ঘটে। কেবল ডেনভারেই এটা সীমাবদ্ধ নয়। রোজ রোজই তালাক ও বিচ্ছেদ বেড়ে চলছে। এই অবস্থা চলতে থাকলে, আর চলতে থাকার সম্ভাবনাই বেশী, তবে দেশের প্রায় অধিকাংশ অঞ্চলেই বিয়ের জন্য যতগুলো লাইসেন্স দেওয়া হবে তালাকের জন্যও ততগুলো মামলাই দায়ের হবে।[৩২]

তালাকের আধিক্যে আতংকিত হয়ে লিংক বলেনঃ

তালাকের হার কোনকালেই এত বৃদ্ধি পায় নি। প্রতি পাঁচটি বিয়েতে একটি তালাক হচ্ছে এবং এতে নিঃসন্দেহে প্রতীয়মান হয়, আগামী ২০ বছরের মধ্যে বিয়ে ও তালাকের অনুপাত ১ঃ১ হবে।[৩৩]

৩১। Paul Bureau, OP-cit, p-16.
৩২। George Lindsey, OP-cit, p-211-214.
৩৩। Dr. Henri C. Link, The Discovery of Morals. P-17

Dhaka University Institutional Repository

জাতীয় দুর্গতি

কোন জাতির অস্তিত্ব রক্ষার সর্বপ্রধান সম্বল হল জনশক্তি। কোন জাতিই এটা ছাড়া দুনিয়াতে বেঁচে থাকতে পারে না- আজ হোক, কাল হোক, জগতের ইতিহাস হতে এটা মুছে যাবে। সন্তান ধারণ ও প্রতিপালন নারী জাতির স্বাভাবিক নৈতিক দায়িত্ব এবং এটা ব্যতীত মানব-বংশও রক্ষা পায় না। কিন্তু আধুনিক নারী-সমাজ এই মহান দায়িত্ব পালনে নারাজ। এতে জাতি বিশেষ এবং পরিশেষে সমগ্র মানবতার দুর্গতি নেমে আসতে বাধ্য।

পাশ্চাত্যের যৌন উশৃঙ্খলতা মাতৃ প্রকৃতিকে বিকৃত করে দিয়েছে। আধূনিককালে মাতা নিজ সন্তানের প্রতি কেবল বিরাগভাজনই হয়ে ওঠে নি; বরং তার পরম শত্রু হয়ে পড়েছে। গর্ভনিরোধ গর্ভপাতের প্রবল প্রচেষ্টার পরও যে সকল হতভাগা সন্তান জন্ম গ্রহণ করে, তাদের প্রতি তাদের মাতা-পিতার ব্যবহার বর্ণনা করে পল ব্যুরো বলেন ঃ

সে সকল সন্তানের প্রতি তাদের মাতা-পিতা নির্মম ও অমানুষিক আচরণ করে, তাদের করুণ কাহিনী রোজই সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। সংবাদপত্রে কেবল অসাধারণ ঘটনাবলীরই উল্লেখ থাকে। এই হতভাগ্য ও অনভিপ্রেত অতিথিদের প্রতি তাদের মাতা-পিতা কিরূপ নির্মম ব্যবহার করে তা লোকে ভালরূপেই অবগত আছে। এই হতভাগার দল তাদের মাতা-পিতার জীবনের সুখ-সম্ভোগ একেবারে বিনষ্ট করে দিয়েছে। এইজন্যেই তারা তাদের প্রতি বিষন্ন ও উদাসীন। সাহসের কমতির দরুনই গর্ভধারিণী অনেক সময় গর্ভপাত করতে পারে না। আর এই সুযোগে নিরপরাধ শিশু জগতে এসে পদার্পণ করে। কিন্তু ভূমিষ্ঠ হওয়ার পরই তাকে পরিপূর্ণ শাস্তি ভোগ করতে হয়।

একদা চার মাসের একটি শিশুর মৃত্যু হলে তার মাতা মৃতদেহের পার্শ্বে নৃত্য-গীতের আসর জমিয়ে বলতে থাকে, এখন আমার দ্বিতীয় সন্তান হতে দিব না। এই সন্তানের মৃত্যুতে আমার স্বামী ও আমি পরম শান্তি লাভ করেছি। চিন্তা করেন তো সন্তান কী জিনিস! সে সর্বদা ঘ্যান ঘ্যান করে ক্রন্দন করে এবং নোংরামী সৃষ্টি করে। এ থেকে অব্যাহতি পাওয়ার কি কোন উপায় আছে?[৩৪]

৩৪। Paul Bureau, Towards Moral Bankruptcy, p-74-75 OP-cit, p-16.

Dhaka University Institutional Repository

এটা অপেক্ষাও হৃদয় বিদারক বিষয় এই যে, পাশ্চাত্য জগতে নবজাত শিশু হত্যা মারাত্মক সংক্রামক ব্যাধির ন্যায় বিস্তার লাভ করছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ উল্লেখ্য, ফ্রান্সের এক নারী তার শিশু-সন্তানকে পানিতে ডুবিয়ে হত্যা করে। অপর এক নারী তার সন্তানকে গলা টিপে হত্যা করে। এতে তার জীবন-বায়ু একেবারে নিঃশেষ হয়নি মনে করে অবশেষে সে তাকে দেওয়ালে নিক্ষেপ করে তার মস্তক চূর্ণ-বিচূর্ণ করে ফেলে।

উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে নারী-মুক্তির নামে যে আন্দোলন শুরু হয়, এটিই তার বেদনাদায়ক পরিণতি। স্বীয় বংশধরের নিধনে যে জাতি এমন চরমে উপনীত হতে পারে, ধ্বংসের কবল হতে সে কিরূপে রক্ষা পাবে? কারণ নতুন বংশধরের আর্বিভাবে জাতির অস্তিত্ব রক্ষার জন্য নিতান্ত আবশ্যক। কোন বহিঃশত্রু না থাকলেও এমন জাতি নিজে নিজেই ধরাপৃষ্ঠ হতে বিলীন হয়ে যেতে পারে।

জড়বাদী মতবাদ, প্রবৃত্তির দাসত্ব, দাম্পত্য জীবনের দায়িত্ব পালনে নিতৃষ্ণা ও অস্বীকৃতি, পারিবারিক জীবন যাবনে অনীহা এবং বৈবাহিক স্থিতিহীনতা নারীর সহজাত ও স্বাভাবিক মাতৃসুলভ প্রেম-প্রীতি ও আবেগ-অনুরাগ বিনষ্ট করে দিয়েছে। অথচ এই পবিত্র অনুরাগই নারীকে মহীয়সী করে তোলে এবং কেবল সভ্যতাই নয়; বরং গোটা মানবতার অস্তিত্বও এরই উপর একান্তভাবে নির্ভর করে। আর এই অনুরাগ বিনষ্ট হয়েছে বলেই গর্ভনিরোধ, গর্ভপাত ও শিশু হত্যা প্রসার লাভ করেছে।[৩৫]

নারী-মুক্তি আন্দোলনের লজ্জাকর ও ভয়াবহ পরিণাম অতি সংক্ষেপে উপরে বর্ণিত হল। এর উদ্যোক্তাগণ হয়ত নিজেরাই অবগত ছিল না, এই আন্দোলন তাদেরকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছে।

আল্লাহ্ তা'আলার সৃষ্টি কৌশলের অতীব চমৎকার নিদর্শন নারী। তার গোটা দেহ, চলন-ভঙ্গি, কণ্ঠস্বর, কমনীয়তা সকলই নিতান্ত মনোরম, মন-ভোলানো ও আকর্ষণীয়। প্রেম-প্রীতির প্রতিমুর্তি করেই তাকে সৃজন করা হয়েছে। নারী একান্ত আদরের ধন, পুরুষের সহধর্মিণী, বেহেশতে সুখ-সম্ভোগের অপিহার্য অঙ্গ। কিন্তু পরিতাপের বিষয়, ওহীর জ্ঞানবিবর্জিত বিভ্রান্ত মানুষ তার সঠিক মর্যাদা দিতে পারল না। একবার অতি উমের্ধ তুলে দেবীরূপে তাকে পুজা করেছে। আবার তার মধ্যে আত্মা আছে কিনা, সে মানুষ কি-না ইত্যকার সন্দেহ পোষণ করে তাকে কামাতুর পুরুষের যৌন সম্ভোগের সামগ্রীরূপে, অতি তুচ্ছ নির্লজ্জ বারবণিতারূপে দাড় করিয়েছে। পুরুষ কখনই তার সঠিক মর্যাদাপূর্ণ মধ্য পন্থায় তাকে রাখতে পারল না। একমাত্র ইসলামই এই মধ্যপন্থা প্রদর্শন করে।

৩৫। আব্দুল খালেক, প্রাগুক্ত, পৃ-১০১।

Dhaka University Institutional Repository

নারী-স্বাধীনতার অগ্রপথিকদের ধারণা, সমাজের দু'টি ব্যক্তি নিবিড়ভাবে মিলিত হয়ে যদি জীবনের কয়েকটি মুহূর্তে আন্দ-ঘন সম্ভোগে অতিবাহিত করে, তবে এতে অপরের কি ক্ষতি? এমন ব্যক্তিগত ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করার কি অধিকারই বা তার আছে? একজন অপরজনের উপর বল প্রয়োগ করলে, প্রতারণা-প্রবঞ্চনা করলে অথবা সমাজে বিবাদ-বিসম্বাদ ও বিশৃঙ্খলা ঘটালে হস্তক্ষেপ করার অধিকার অবশ্যই সমাজের রয়েছে। কিন্তু যেখানে এর কোনটাই হয় না; বরং দু'টি লোকের নিছক আন্দ-উপভোগের বিষয়, এমন একান্ত ব্যক্তিগত অন্যায় হস্তক্ষেপ করে সমাজ কেন মানুষের নিতান্ত কাম-স্বাধীনতা হরণ করবে?

এই মনোভাবই অতীব সম্মানিত আদম-সন্তান, আমাদের প্রিয় পাশ্চাত্যের ভাই-বোনকে পশুতে পরিণত করেছে, অতি ঘৃণিত কুকুর শূকুরের পর্যায়ে নামিয়ে দিয়েছে। কোন মানুষই নিছক একক সত্তা নয়। একান্ত ব্যক্তিগত বলতে তার কিছুই নেই। সে একান্তই সামাজিক জীব এবং ওতপ্রোতভাবে সমাজের সাথে জড়িত। তার প্রতিটি গতিবিধি, কথাবার্তা, চাল-চলন, হাসি-কান্না, কার্যকলাপের প্রভাব সমাজের উপর না পড়ে পারে না। নিরেট ব্যক্তিগত জীবন-যাপন মানব সমাজে নয়; বরং জন-প্রাণী শূন্য মরুভূমি ও বন জঙ্গলেই সম্ভব।

অতএব, একজন নারী এবং একজন পুরুষ সকলের অগোচলে গোপন প্রকোষ্ঠে ও যে যৌনকার্য সম্পাদন করে, সমাজ জীবনে এর কোনই প্রতিক্রিয়া দেখা দিবে না এমন ধারণা নিতান্ত ভুল। আর এর প্রতিক্রিয়া যে কেবল সমাজ বিশেষের উপরই পড়বে তাও নয়; বরং সমগ্র মানবতার উপর পড়বে। কেবল বর্তমানেই উপরই নয়; ভবিষ্যতের উপরও এর প্রভাব বিস্তার লাভ করবে। কারণ, সমাজতত্ত্ব ও সামাজিক রীতি-নীতির বন্ধনে সমগ্র মানবতা আবদ্ধ। হাটে-বাজারে, পথে-ঘাটে, সভা-সমিতিতে, মসজিদে-উপাসনালয়ে মানুষ যেমন সামাজিক জীবনের সাথে জড়িত থাকে। জনবিহীন গৃহে, প্রাচীন-অন্তরালে এবং অতি নির্জন স্থানেও তদ্রুপ সে সামাজিক জীবনের সাথে জড়িত না থেকে পারে না। সুতরাং যে ব্যক্তি ব্যভিচার করে তার সন্তান উৎপাদন শক্তি সাময়িক আনন্দ উপভোগে অপচয় করে, সে জাতির অধিকার বিনষ্ট করে, সামাজিক জীবনে যৌন উচ্ছৃঙ্খলতার বিস্তার ঘটায় এবং সমাজের অগণিত নৈতিক ও বৈষয়িক অনিষ্ট সাধন করে।

Dhaka University Institutional Repository

ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর হতেই মাতা-পিতা ও আত্মীয়-স্বজনের পরিচর্যা এবং সমাজের যত্ন ও তত্ত্বাবধানে সে মানুষ হয়েছে। উপযুক্ত হয়ে সেও কিছু দান করবে-এই আশায়ই সমাজ তাকে মানুষ হিসেবে গড়ে তুলেছে। অথচ ক্ষণিকের মোহে বশীভূত হয়ে সে সেই আশা নিষ্ফল করে দেয়। অপর দিকে, যে নারীর সাথে সে ব্যভিচার করল, সেও সমাজের এক বিশিষ্ট অঙ্গ। সে অবশ্যই কারোও কন্যা, ভগিণী, ফুফু, খালা বা মাতা হবে। সে তার সতীত্ব নষ্ঠ করে তাকে কুলাঙ্গার বানাল এবং তার ভবিষ্যত জীবনকে ধিকৃত করে দিল। এই অনিষ্ট করার অধিকার সে কোথায় পেল?

অতএব, অবৈধভাবে যৌন সম্ভোগকারীর ন্যায় চোর-ডাকাত, প্রতারক-প্রবঞ্চক এবং বিশ্বাসঘাতক আর কেউ হতে পারে না। ভদ্রলোক বলে সে সমাজে পরিচিত হতে পারে না, সে মানুষ নয়, মানুষরূপী অতি নিকৃষ্ট জন্তু। আর যারা প্রচার-প্রসার কার্য চালিয়ে লোকজনকে যৌন উচ্ছৃঙ্খলতার দিকে আহবান করে, তারা কোন্ শ্রেণীর জন্তু। তারা তদাপেক্ষা নিকৃষ্ট। যে সমাজে এই সমস্ত কার্যের প্রশ্রয় ও সম্মতি দেয়, তারা কেমন জীব? তারাও নিকৃষ্টতম জীবের অন্তর্ভূক্ত। কারণ, মানবের মন ও দেহে প্রদত্ত শক্তি তার একার জন্য নয়; বরং সমগ্র মানবতার জন্য এটা তার নিকট আমানতস্বরূপ রাখা হয়েছে। কিন্তু সন্তান উৎপাদন, মানব-বংশ বৃদ্ধি ও সন্তান প্রতিপালনের দায়িত্ব গ্রহণের ইচ্ছা ব্যতিরেকেই তারা ব্যভিচারীকে উদ্বুদ্ধ ও অনুপ্রাণীত করল।

নারী-পুরুষের যৌন বাসনার পরিতৃপ্তি এবং সামাজিক দায়িত্ব পালন, এই দ্বিবিধ উদ্দেশ্যের পূর্ণতা সাধনের জন্যই বিবাহ প্রথার উদ্ভাবন হয়েছে। কাজেই বিবাহ কেবল যৌনস্পৃহা দমনের পন্থাই নয়; বরং একটি সামাজিক কর্তব্য। কারণ, মানুষের মধ্যে যৌনবোধ ও আকর্ষণ প্রদানের উদ্দেশ্য হল মানব জাতিকে নিয়ে একটি সভ্যতা কায়েম করা। এই জন্যই তার যৌন বাসনা কেবল দৈহিক মিলন এবং বংশ বৃদ্ধি দাবী করে না; বরং এক চিরন্তন সঙ্গলাভ এবং আত্মার সম্পর্ক ও আন্তরিক সংযোগ স্থাপনের দাবী করে। মানুষের ন্যায় অন্যান্য জীব জন্তুর মধ্যেও যৌনবোধ এবং আকর্ষণ দেওয়া হয়েছে। কিন্তু মানুষের মধ্যে এটা অধিক। আবার জীব-জন্তুর যৌন আকর্ষণ সময় ও কালের সাথে সীমাবদ্ধ। কিন্তু মানুষের মধ্যে এটা সীমাবদ্ধ নয়। জীব-জন্তুর অপেক্ষা অধিক যৌনকার্য করার জন্য মানুষকে এই যৌন আধিক্য প্রদান করা হয়নি; বরং নারী-পুরুষকে একত্রে সংযুক্ত রাখা এবং তাদের পারস্পারিক সম্পর্ক মজবুত ও স্থায়ী করাই এর উদ্দেশ্য।

Dhaka University Institutional Repository

যৌন বাসনা চরিতার্থ করতে যেয়ে সীমালঙ্ঘন এবং এটাকে একেবারে ধ্বংস ও দমিত করা, উভয়ই ক্ষতিকর এবং প্রকৃতি বিরুদ্ধ। সুতরাং যৌন কামনাকে সীমাতিক্রম এবং চরম স্বল্পতা হমতে রক্ষা করে এক সামঞ্জস্যপূর্ণ মধ্যপন্থায় আনয়ন করতে হবে। যাতে সমাজে যৌন উন্মাদনার অনাচার সৃষ্টি না হয় এবং অপরদিকে মানব বংশ ও সভ্যতা বিকাশের ক্ষেত্রে কোন বিঘ্ন না ঘটে।

সুখের বিষয়, অধুনা পাশ্চাত্যের পন্ডিতগণই স্বদেশের যৌন উচ্ছৃঙ্খলতার প্রতি প্রতিক্রিয়াশীল হয়ে উঠেছেন এবং জ্ঞাতসারেই হোক বা অজ্ঞাতসারে, ইসলামের দিকেই তাঁরা ক্রমশ অগ্রসর হয়ে আসছেন।[৩৬]

প্রতিক্রিয়া ঃ বার্ট্রান্ড রাসেল (Bertrand Russel) তাঁর The principles of Social Reconstruction গ্রন্থে বলেনঃ

"সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে যা উত্তম, তা অতি দ্রুত ক্ষয় প্রাপ্ত হচ্ছে। এটা প্রশ্নাতীত বলেই মনে হয় যদি আমাদের অর্থনৈতিক পদ্ধতি ও আমাদের নৈতিক মান অপরিবর্তিত থাকে। তবে পরবর্তী দুই বা তিন পুরুষের মধ্যে সমস্ত সভ্যদেশের জনগণের চরিত্র দ্রুতগতিতে নিকৃষ্ঠ হয়ে পড়বে। এই কথা সকল পাশ্চাত্য সভ্যদেশের জন্যই সমভাবে প্রযোজ্য।"

যৌন উচ্ছৃঙ্খলতা ও যৌন সমস্যা সমাধানের প্রকৃষ্ট উপায় ইসলামের বিবাহ প্রথা। পাশ্চাত্যের যৌন উন্মাদনা ও উচ্ছৃঙ্খলতা নিরসনের জন্য পাশ্চাত্যের বিশিষ্ট চিকিৎসা বিজ্ঞানী মিসেস হাডসন শ' (Mrs. Hudson Shaw) ,পাশ্চাত্যকে উপদেশ দিয়ে বলেনঃ

" এই দীর্ঘ আলোচনায় আমি মানব প্রকৃতির সেই সকল সত্যে উপনীত হওয়ার চেষ্টা করেছি, যার উপর মানুষের নৈতিক মূল্যবোধের ভিত্তি স্থাপিত হওয়া আবশ্যক। আমি বিশ্বাস করি যে, মৌল বিষয়ের প্রতি আমাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ করা আবশ্যক, তা হল প্রথমত, মানুষের জটিল প্রকৃতি। তার দেহ, আত্মা, ও তেজ-বীর্ষ রয়েছে এবং এগুলোর কোনটির দাবিই সে সরলতার সাথে অস্বীকার করতে পারে না।

৩৬। আব্দুল খালেক, প্রাগুক্ত, পৃ-১০৬-৯।

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয়ত, সমগ্র মানবতার ঐক্য ও সংহতি। এই কারণেই কারো পক্ষে নৈতিকতাবোধকে তার একান্ত নিজস্ব ব্যক্তিগত ব্যাপার বলে ধারণা করা এবং এই ধারণার বশীভূত হয়ে স্বেচ্ছাচারিতা অবলম্বন করা একেবারে নিরর্থক হয়ে পড়ে। মানব জাতির এই সংহতির কারণেই বিয়ে সর্বকালেই সামাজিক ব্যাপারে পরিগণিত। আইন দ্বারা এটা স্বীকৃত হতে হবে, সামাজিকভাবে বিবাহ উৎসব উদ্‌যাপন করতে হবে এবং আইনানুগ চুক্তিদ্বারা এর সংরক্ষণ করতেই হবে।"

পাশ্চাত্যের লাগামহীন যৌন উচ্ছৃঙ্খলতা দূরীকরণে এই মহিয়সী মহিলার উপদেশ কত চমৎকার ও প্রাকৃতিক বিধানসম্মত। এই উপদেশ মেনে চললে বিবাহপূর্ব যৌন মিলন, পরীক্ষামূলক বিবাহ, গর্ভনিরোধ, ভ্রূণ-হত্যা এবং যাবতীয় যৌন অনাচার বিদূরীত হয় ও পারিবারিক শান্তি-শৃঙ্খলা ফিরে আসে। আমাদের বিশ্বাস, পাশ্চাত্যের শুভবুদ্ধি অচিরেই ফিরে আসবে। আল্লাহ্ তা'আলার প্রিয়মত ও সুন্দরতম সৃষ্টি আর কতকাল অনাচারে বিনষ্ট থাকবে?

যৌন অনাচারের কারণে প্রিয় স্বদেশের সভ্যতা একেবারে ধ্বংসের মুখে নিপতিত। সুতরাং এই ধ্বংসের কবল হতে রক্ষার সন্ধান প্রদানে গভীর পরিতাপের সাথে তিনি আরও বলেনঃ

" বর্তমানে আমাদের সভ্যতা ধ্বংসের মুখে দোদুল্যমান। আমরা প্রত্যক্ষ করছি, গত কয়েক দশক ধরে আমাদের নর-নারীর মধ্যে চরম যৌন উচ্ছৃঙ্খলতা চলে আসছে এবং এতে কোন বাধা-বিঘ্নই নেই। ফলে প্রচুর সৃজনী শক্তি বিনষ্ট হচ্ছে। পতিতা বৃত্তি, অবৈধ যৌনকর্ম ও তৎসহ গর্ভনিরোধ, নারীতে-নারীতে এবং পুরুষে-পুরুষে সমকাম যাতে সন্তান উৎপাদনের কোন আশাই থাকে না এবং আরও বহুবিধ অস্বাভাবিক রতিকর্মে শক্তির নির্যাস অযথা অপচয় হচ্ছে। এই সমস্তই আমাদের সম্মুখে উদ্ভাসিত হয়ে উঠছে। এটা কি আমাদের ধ্বংসের লক্ষণ বা কারণ নয়? আমার মনে হয়, উভয়ই।[৩৭]

ঐতিহাসিক, বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক, সমাজ সংস্কারক, সাংবাদিক নির্বিশেষে সকল চিন্তাশীল ব্যক্তি পাশ্চাত্য নারীর দুঃখজনক জীবন সম্পর্কে সোচ্চার হয়ে ওঠেছেন। তাঁদের মতে বর্তমানে পাশ্চাত্য সমাজ বসবাসের অনুপযোগী ও ভয়ংকর হয়ে পড়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

নারী প্রগতির ধূয়া তুলে পাশ্চাত্য উচ্ছন্নে যাচ্ছে। এতে দুঃখ ভারাক্রান্ত হৃদয়ে নারীদের গৃহে প্রত্যাবর্তন কামনা করে প্রফেসর ফুলটন-জে-শীন বলেনঃ

" আজকাল আমেরিকায় পারিবারিক জীবনে বিশৃঙ্খলা ও অশান্তি যেরূপ প্রচন্ড আকারে দেখা দিয়েছে, ইতিপূর্বে আমেরিকার ইতিহাসে কোনকালেই এইরূপ পরিলক্ষিত হয়নি। পরিবার জাতির আবহমান মন্ত্রস্বরূপ। সর্বসাধারণ পরিবার যেমন জীবন যাপন করে গোটা আমেরিকাও তদ্রূপই থাকবে। সাধারণ পরিবার যদি ঋণ করে অমিতব্যয়ের জীবন-যাপন করে, তবে আমেরিকাও এমন এক জাতিতে পরিণত হবে যে, কিয়ামত পর্যন্ত এটা কেবল ঋণের পর ঋণের স্তুপ পুঞ্জীভূত করতে থাকবে। স্বামী-স্ত্রী যদি তাদের বিবাহ বন্ধনের প্রতি বিশ্বস্ত না থাকে, তাতে সমগ্র আমেরিকা ও আটলান্টিক চার্টার এবং তার স্বাধীনতার প্রতিও বিশ্বস্ত থাকবে না।

প্রবল প্রেমানুরাগও যদি স্বেচ্ছাকৃতভাবে ব্যর্থতার পর্যবসিত হয়, তবে অতিরিক্ত তুলা কপি সমুদ্রে নিক্ষেপকরণ এবং হতাশাব্যঞ্জক মানব প্রকৃতির ও অর্থনৈতিক মূল্যের প্রয়াসে জাতিকে অর্থনৈতিক কর্মপন্থা অবলম্বন করতে হবে। স্বামী-স্ত্রী যদি পরস্পরে উদ্দেশ্য নয়; বরং প্রত্যেকেই কেবল নিজের জন্যই জীবন যাপন করে, তাদের ব্যক্তিগত সুখ যে তাদের একে অন্যের উপরই একান্তভাবে নির্ভর করে, এটা যদি তারা বুঝতে না পারে তাতে আমাদের দেশ এমন এক স্থানে পরিণত হবে যেখানে পুঁজি ও শ্রম স্বামী-স্ত্রীর ন্যায় সংগ্রামে রত হবে। আর এর ফলে তারা উভয়ে সামাজিক জীবন নিষ্ফল করে তুলবে এবং অর্থনৈতিক শান্তি অসম্ভব হয়ে উঠবে।

স্বামী-স্ত্রী যদি তাদের ছাড়া অন্যত্র প্রেম নিবেদন করে, তবে আমাদের জাতি এমন এক জাতিতে পরিণত হবে যাতে বিদেশী দর্শন অনুপ্রবেশ করে কমিউনিজমের ন্যায় দেশ-প্রেম একেবারে মুছে ফেলবে। কোন আল্লাহ্ নেই এই মনোভাব নিয়ে যদি স্বামী-স্ত্রী জীবন যাপন করে, তবে আমেরিকা ক্ষমতাসীন আমলাদের অধীন হয়ে পড়বে- যারা স্বাধীনতার ঘোষণা প্রত্যাখ্যান করবে এবং আমাদের সকল অধিকার ও স্বাধীনতা যে আল্লাহর নিকট হতে প্রাপ্ত, তা অস্বীকার করে নাস্তিকতাকে আমাদের জাতীয় জীবনের আদর্শ হিসেবে উপস্থাপন করবে। গৃহই জাতিকে নিশ্চিত করে। পরিবারে যা সংঘটিত হয়, তাই পরে জাতীয় কংগ্রেস, হোয়াইট হাউজ ও পরিশেষে সুপ্রীম কোর্টে সংঘটিত হয়ে থাকে। প্রত্যেক দেশ এর উপযোগী সরকারই লাভ করে। গৃহে আমরা যেরূপ জীবন যাবন করি, বৃহত্তর জাতীয় জীবনেও আমরা তদ্রূপ জীবন-যাপন করব।"

Dhaka University Institutional Repository

কত সারগর্ভ উপদেশ। যৌন উচ্ছৃঙ্খলতা পরিহার করে নারীদেরকে গৃহে প্রত্যাবর্তন এবং স্বামী স্ত্রীরূপে বিবাহ বন্ধনের বিশ্বস্ততা রক্ষা করে পবিত্র জীবন যাপনের জন্য কত জোরালো আহবান। বিশ্বপ্রভু আল্লাহ্‌তে বিশ্বাস স্থাপন এবং সকল অধিকার ও স্বামীনতা একমাত্র তাঁরই অবারিত দানরূপে স্বীকার করে নেওয়ার কি চমৎকার পরামর্শ।

নারীর অপহৃত অধিকার পুনরুদ্ধারের মহান উদ্দেশ্যে অনুপ্রাণিত হয়েই হয়ত নারী-আন্দোলনের উদ্যোক্তাগণ এজর সূচনা করে। কিন্তু এর অনাচনার যে কতটা সীমা লঙ্ঘন করে যাবে, এটা সম্ভবত তারা উপলব্দি করতে পারে নাই। এর যে পরিণাম দাঁড়িয়েছে এতে চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রই অনুতপ্ত না হয়ে পারে না।

৩৮। Prof. Fulton. J. Sheen Communism and Conscience of the went;
আব্দুল খালেক, প্রাগুক্ত, পৃ-১১৬-১১৭।

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চম অধ্যায়

বাংলাদেশের সামাজিক প্রেক্ষাপটে নারীর অবস্থান ও ইসলাম

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশের সামাজিক প্রেক্ষাপটে নারীর অবস্থান ও ইসলাম

বাংলাদেশের পরিবার ব্যবস্থা ঃ

সূচনা ঃ পরিবার বলতে সাধারণত বুঝায় এমন একটি ক্ষুদ্র সামাজিক সংগঠনকে যেখানে বৈবাহিক এবং রক্ত সম্পর্কের সূত্রে স্বামী-স্ত্রী তাদের অবিবাহিত সন্তানসহ এবং কোন কোন ক্ষেত্রে সন্তানাদি স্ত্রী-পরিজনসহ বসবাস করে। তাই পরিবার হল সমাজের একটি মৌলিক ও ক্ষুদ্রতম সংগঠন। এটা সমাজের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত। পরিবারের সঙ্গেই আমাদের সবচেয়ে বেশী নিবিড় যোগাযোগ। পরিবারের সঙ্গেই মানুষের অতি আন্তরিক এবং অনেকটা অকৃত্রিম সামাজিক মিথস্ক্রিয়া অনুষ্ঠিত হয়। এজন্যই বলা হয়, পরিবার কোন কৃত্রিম সংগঠন নয়। এ ব্যবস্থা মানব প্রকৃতির পক্ষে স্বাভাবিক। সমাজ জীবনের যত রকম বৈশিষ্ট্য বা রূপ আছে, পরিবার হল সংঘবদ্ধ জীবনের সবচেয়ে বিশ্বজনীন রূপ। সব সমাজেই এবং সমাজ বিকাশের প্রত্যেক স্তরেই পরিবারের অস্তিত্ব রয়েছে। এমনকি বহু মনুষ্যের জীবের মধ্যেও পারিবারিক জীবনের নিদর্শন পাওয়া যায়। এর ভিত্তি হচ্ছে মানুষের কতগুলো যৌন আবেগ, যেমন রোমান্টিক প্রেম, বংশগৌরব, গৃহের অর্থনৈতিক নিরাপত্তা, ব্যক্তিগত মালিকানার ঈর্ষা, বংশের ধারাবাহিকতা রক্ষার জন্য নিভৃত আকাঙ্খা। বস্তুতঃ মানুষের জটিল বাসনা এবং সচেতন প্রয়োজন বিভিন্ন পরিবেশে বিভিন্নভাবে প্রকাশিত হয়ে কোন না কোন এক ধরনের পারিবারিক ব্যবস্থা সৃষ্টি করেছে।

প্রাচীন ও মধ্য যুগের সভ্য জাতিসমূহের মধ্যে ধর্ম নিয়ন্ত্রিত পারিবারিক প্রথা প্রচলিত ছিল। আমাদের বাংলাদেশেও পারিবারিক চিত্র তার চেয়ে আলাদা ছিল না। বাংলাদেশ মুসলিম প্রধান দেশ হলেও এদেশে ধর্ম, এলাকা(শহর ও গ্রাম), সমতলবাসী, পাহাড়বাসী উপজাতি এবং অর্থনৈতিক শ্রেণী মর্যাদা ভেদে পরিবারের মধ্যে বিভিন্নতা লক্ষ্য করা যায়। তাই বাংলাদেশের পরিবারের নির্দিষ্ট এবং স্থায়ী কোন কাঠামো নেই। তবে সমতল ভূমি অঞ্চলের গ্রাম ও শহর এবং মুসলিম, হিন্দু ও বৌদ্ধ সমাজের দিকে লক্ষ্য রাখলে বাংলাদেশের পরিবারের যে কাঠামো দেখা যায়, তাতে যৌথ পরিবার, বিস্তৃত পরিবার ও একক পরিবার রয়েছে। কতিপয় ব্যতিক্রম বাদে বাংলাদেশের শহর অঞ্চলের পরিবারগুলো মূলতঃ অণু পরিবার।

Dhaka University Institutional Repository

গ্রামের পরিবারগুলো ঐতিহ্যগতভাবে যৌথ পরিবার। তবে আর্থিক দূরাবস্থা, পেশাগত পরিবর্তন, সম্পত্তি বন্টননীতি, মেজাজ ও ব্যক্তিত্বের সংঘাত ইত্যাদি কারণে যৌথ পরিবার ব্যবস্থায় ভাঙ্গন দেখা দিলেও বৃটিশ আমল (১৭৫৭-১৯৪৭খ্রিঃ) হতে এ দেশে শিক্ষা ও শিল্পের প্রসারতা বৃদ্ধি পেলেও এখনও আমাদের সমাজে যৌথ পরিবারের সংখ্যা বিরাজমান রয়েছে এবং যৌথ পরিবার আমাদের দেশে পরিবার ব্যবস্থার একটি প্রধান বৈশিষ্ট।[১]

বর্তমানে শিক্ষা ও শিল্পের প্রসারতার সাথে সাথে বিস্তৃত।[২] পরিবার তথা যৌথ পরিবার ব্যবস্থা অনেকটা হুমকির সম্মুখীন। এর অন্যতম কারণ হচ্ছে, শিল্প কারখানায় চাকুরী করাতে শ্রমিক ঘরছাড়া হতে বাধ্য হয়েছে। গ্রাম ছেড়ে শহরে তাদের জীবিকার জন্য আসার ফলে যৌথ পরিবার হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে নিজের স্ত্রী-সন্তান নিয়ে কর্মস্থলে নতুন করে সংসার করতে হচ্ছে। ব্যক্তি স্বাতন্ত্রের ফলেও আমাদের দেশের অনেক পল্লী এলাকাতেও একক পরিবার গড়ে উঠেছে। যদিও দেখা যায় শিক্ষিত লোক, চাকুরীজীবি ও শ্রমিকগণ গ্রাম ছেড়ে শহরে এসে বসবাস করলেও গ্রামের সাথে তাদের সম্পর্ক বিদ্যমান রয়েছে এবং যৌথ পরিবারের ন্যায় তাদের কাজ সম্পাদন করছে। আমাদের দেশে এখনও যৌথ পরিবারের বন্ধন দৃঢ়। তাই যৌথ পরিবারের ভাঙ্গন আমাদের দেশে ততটা আলোড়ন সৃষ্টি করতে পারেনি। শহরের তুলনায় পল্লী এলাকাতে যৌথ পরিবার অনেক বেশী লক্ষ্য করা যায়। তার কারণ, পরিবারের সদস্যগণ পরিবার প্রধানের বিষয় সম্পত্তি ভোগ করতে পারছে এবং উত্তরাধিকার সূত্রে পৈতৃক সম্পত্তি পাবার উদ্দেশ্যে। কেননা, পরিবার প্রধান যতদিন জীবিত থাকে ততদিন পরিবারের কর্তার অধীনে থাকলে বিষয় সম্পত্তি সুষ্ঠুভাবে বন্টন করা যায়।[৩] আমাদের সমাজ কৃষিভিত্তিক। এখানে সামাজিক মর্যাদা ও কার্যকলাপ ভূ-সম্পত্তির মালিকানার উপর বেশ নির্ভরশীল। সে কারণে কোন পরিবারের সন্তান পরিবার হতে পৃথক হয়ে আপন ভবিষ্যত নষ্ট করতে চায় না। আবার অনেক সময় পৃথক হলে অর্থনৈতিক দৈন্য অবস্থায় পড়তে হয়। সে জন্যই আমাদের দেশে এখনো যৌথ পরিবার একেবারে বিলীন হয়ে যায়নি।

১। মোহাম্মদ আমীর হোসেন, সমাজ বিজ্ঞান, গ্লোব লাইব্রেরী, ঢাকা-১৯৮২, পৃ-১৭৭।

২। বিস্তৃত পরিবার যৌথ পরিবারেরই একটি প্রকারভেদ। এ পরিবারের অন্তর্গত হল স্বামী-স্ত্রী, বিবাহিত পুত্রগণ ও তাদের পরিবার, অবিবাহিত পুত্র ও কন্যা, পৌত্র ও পৌত্রী। অনেকে মনে করেন, প্রকৃতপক্ষে যৌথ পরিবার সংজ্ঞাটি ভারত-বাংলাদেশের পরিবার প্রথা সম্পর্কে প্রয়োগ করা হয়। অন্যত্র এটাকে বিস্তৃত পরিবার বলা হয়। কারণ ভারতীয় প্রথায় সম্পত্তির উত্তরাধিকার ও পরিবার বিভাগ সম্পর্কে কয়েকটি বৈশিষ্ট্য ও বিধি-নিষেধ আছে যা অন্যত্র নেই।

৩। মোহাম্মদ আমীন হোসেন, প্রাগুক্ত, পৃ-১৭৮।

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশে পল্লী এলাকাতে যৌথ পরিবারের সংখ্যা অধিক রয়েছে। তবে শহরেও দু'চারটি যৌথ পরিবার যে দেখা যায় না তা নয়; বরং শহরের অনেক অণু পরিবার কার্যত যৌথ পরিবারের রূপই নেয়। বিশেষ করে যখন নানা আত্মীয়-স্বজন এনে স্থানীয়ভাবে বসবাস শুরু করে।[৪]

বাংলাদেশে পরিবারের ধরণ ও প্রকৃতি ঃ

আমাদের দেশে পরিবারের মধ্যে তিনটি বিশেষ শ্রেণী লক্ষ্য করা যায়। যেমন-উচ্চবিত্ত, মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত পরিবার। উচ্চবিত্ত পরিবারগুলোতে শিক্ষার প্রসারতা ও আর্থিক স্বচ্ছলতার দরুন পরিবারের সদস্যগণ ভিন্ন ভিন্ন স্থানে চাকুরী ও আর্থিক সামর্থের ফলে যৌথ পরিবার নিয়ে থাকা সম্ভব হচ্ছে না। এজন্য উচ্চবিত্ত পরিবারে যৌথ পরিবারগুলোর ভাঙ্গন অধিক লক্ষ্য করা যায়। মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্তদের মাঝে এখনো যৌথ পরিবার থাকতে দেখা যায়। মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্তদের মাঝে এখনো যৌথ পরিবার থাকতে দেখা যায়। আবার অনেক সময় পারিবারিক অসন্তোষের দরুন এসব পরিবারেও ভাঙ্গন কিছুটা লক্ষ্য করা যায়। তাই বলা যায়, আমাদের দেশে যৌথ পরিবার যেমন বিলীন হয়ে যায়নি, তেমনি আবার একক পরিবারও পুরো মাত্রায় গড়ে উঠেনি। কারণ, যৌথ পরিবারে যে সকল একক পরিবার (স্বামী ও স্ত্রী-সন্তান) থাকে তারা নামেই একক কিন্তু বিস্তৃত পরিবারে তাদের কতকটা স্বাতন্ত্র রয়েছে। বাংলাদেশে পরিবার কাঠামো মূলতঃ পিতৃতান্ত্রিক। কেননা, বাংলাদেশে পরিবার ব্যবস্থায় বংশ পরিচয় নির্ধারণ করা হয় পুরুষের মাধ্যমে। পুরুষ শাসিত পরিবার বলেই পরিবারে সকল দায়িত্ব পুরুষের হাতে ন্যস্ত থাকে। পরিবারের ভরণ-পোষণ এবং নিরাপত্তার জন্য মূলতঃ পুরুষই দায়ী। তবে শহরের কিছু উচ্চ শিক্ষিত ও উদার দৃষ্টিসম্পন্ন পরিবারে সমতার নীতি লক্ষ্য করা যায়। এক্ষেত্রে স্বামী তার স্ত্রীর মতামত নিয়ে সংসার যাত্রা নির্বাহ করেন। বাংলাদেশে ইদানীং নারী-মুক্তি আন্দোলনের যে কর্মসূচী নিয়েছে তাতে পিতৃ-প্রধান পরিবারে স্ত্রীর মর্যাদা বৃদ্ধিতে সহায়ক হবে বলে মনে হয়। অবশ্য এটাও ঠিক যে, পিতৃ প্রধান পরিবার হলেই যে পরিবারে নারীর মর্যাদা স্বীকার করা হয় না, এটা পুরোপুরি ঠিক নয়। তবে পরিবার পরিচালনার ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা আজও পুরুষের উপরই ন্যস্ত। তাই বলে যে এখানে স্ত্রীর মর্যাদা কম এটা বলা যাবে না। কেননা, ক্ষমতা ও মর্যাদা বেশ কিছুটা ভিন্নধর্মী তো বটেই। সব ক্ষমতাবানই মর্যাদার অধিকারী। তবে সব মর্যাদার অধিকারী যে ক্ষমতাবান হবেন এমন নয়।[৫]

৪। ড. মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান, সমাজ বিজ্ঞান পরিচিতি, হাসান বুক হাউস, ঢাকা-২০০০, পৃ-৭৭।

৫। ড. মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ-৭৭।

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশের পরিবার পিতৃপ্রধান পরিবার বলেই এতে মূলত পিতৃবাস নীতি অনুসরণ করা হয়। সাধারণত কোন পরিবারের পুরুষ সন্তান না থাকলে পরিবার প্রধান তার কোন এক কন্যার স্বামীকে নিজ গৃহে বসবাস করার আমন্ত্রণ জানায়। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায়, এ পরিবারে যদি কখনও পুত্র সন্তান জন্মে বা কোন মনোমালিন্য হয় তবে জামাতা তার স্ত্রীসহ ঐ পরিবার ত্যাগ করে চলে যেতে বাধ্য হয়। শিল্পায়ণ এবং নগরায়ণের ফলে অনেকেই শহর এবং শিল্প এলাকায় বিবাহোত্তর নয়াবাস কাটায়। এ অবস্থায় তারা না স্বামীর বাবার গৃহে, না স্ত্রীর বাবার গৃহে বসবাস করে। ফলে নয়াবাস পরিবার দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। কেননা, গ্রামেও ভিটাবাড়ীতে জায়গা সংকুলান না হওয়ায় বিয়ের পর অনেকে পৃথক আবাস গড়ে তুলে।

আবার বাংলাদেশে এক বিবাহ ভিত্তিক পরিবারই বেশী। তবে গ্রামীণ ধনী মুসলিম পরিবারে এমনকি দরিদ্র ও নিম্নবিত্ত পরিবারে একাধিক স্ত্রী বিবাহভিত্তিক পরিবারের অস্তিত্বও কিছুটা রয়েছে। অবশ্য ইদানীং এটার পরিমাণ কমে এসেছে। শহরে বহুস্ত্রী ভিত্তিক পরিবার কালেভদ্রে দেখা গেলেও তার সংখ্যা নেহায়েত নগণ্য। তবে ইদানীং বস্তি এলাকায় হতদরিদ্র পরিবারেও বহুবিবাহ ভিত্তিক পরিবার দেখা যায়। বাংলাদেশে যে সব স্বামী অল্প বয়সে স্ত্রী হারায় বা তালাক দেয় তারা প্রায় ক্ষেত্রেই দ্বিতীয় বিবাহ করে। মুসলিম সমাজে বিধবা বিবাহেরও বেশ প্রচলন রয়েছে। তবে ইদানীং বিধবা বিবাহ এবং স্বামী পরিত্যক্তা বা তালাক প্রাপ্তাদের বিবাহ ক্রমেই একটি কঠিন সামাজিক সমস্যা হয়ে দাঁড়াচ্ছে।[৬]

বাংলাদেশের পরিবার মূলতঃ আমেরিকান সমাজের ন্যায়ই দ্বি-সূত্রীয় নীতি অনুসরণ করে। পিতৃ এবং মাতৃ উভয়কুলের আত্মীয়দের প্রায় সমান গুরুত্ব দেয়। তবে নানা-নানীর চেয়ে দাদা-দাদী, মামা-মামী খালার চেয়ে চাচা-ফুফুর গুরুত্ব বেশী দেবার প্রবণতা লক্ষণীয়। অবশ্য পরিবার থেকে পরিবারে ভিন্ন রীতি থাকতে পারে। যেমন বাবা-চাচা, দাদা, মামা-নানার চেয়ে দরিদ্র এবং অল্প শিক্ষিত হলে মামা-নানা-কুলের প্রতি বেশী সম্পর্কযুক্ত হবার প্রবণতা দেখা দেয়।[৭]

৬। ড. মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ-৭৭।
৭। ড. মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ-৭৭।

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশের অধিকাংশ জনসংখ্যাই ইসলাম ধর্মাবম্বী হওয়ায় কুর'আন ও সুন্নাহ্‌র প্রভাব কম বেশী প্রতি পরিবারেই অনুসৃত হত। অবশ্য অশিক্ষিত গ্রাম্য মুসলমানদের মাঝে পারিবারিক ক্ষেত্রে অনেক হিন্দু ধর্মীয় প্রভাব লক্ষণীয় ছিল। সুফী দরবেশদের প্রচারে সত্য উপলব্দি করতে পেরে হিন্দু সমাজের বিপুল সংখ্যক লোক ইসলামকে মুক্তির পথ মনে করে এবং হিন্দু ব্রাক্ষণদের অত্যাচার হতে মুক্তির জন্য ইসলামকে তারা আল্লাহর তরফ থেকে এক বিশেষ রহমত বলে ধরে নেয় ও দলে দলে মুসলমান হয়। কিন্তু তারা সকল ক্ষেত্রে ইসলামের প্রকৃত ও পুর্ণাঙ্গ শিক্ষা না পাওয়ায় তাদের পরিবারে অনৈসলামিক মূসলিম সমাজে দারুন কু-প্রভাব পেলে এবং তাদের পারিবারিক কাঠামো দূর্বল করে তুলে। বর্তমানে বাংলাদেশেসহ গোটা বিশ্ব পরিবারেই পাশ্চাত্যের প্রভাব কম-বেশী চালু রয়েছে। সে সবের কয়েকটি দিক এখানে তুলে ধরা যেতে পারে। যেমন,

প্রথমতঃ পাশ্চাত্য পরিবার ব্যবস্থায় বংশধারা রক্ষা ও রাষ্ট্রের জনসংখ্যার জন্য পরিবারে উপার্জনকারীর আয়ের সাথে সংগতি ও রাষ্ট্রের আয়-ব্যয়ের দিকে লক্ষ্য রেখেই স্বামী-স্ত্রী সন্তান সংখ্যা নির্ধারণ করেন। বর্তমানে বাংলাদেশে জনসংখ্যাধিক্যের প্রবণতা থাকায় দু'টি সন্তানের বেশী জন্ম দানে আধুনিক স্বামী-স্ত্রী রাযী নহেন। তবে এটা এখনো অনেক ক্ষেত্রে ব্যাপকতা লাভ করেনি। আজ বিশ্বের সর্বত্র ব্যক্তি স্বাধীনতা ব্যাপকভাবে স্বীকৃত। এই ব্যক্তি স্বাধীনতা স্বীকৃত হওয়ার ফলে পরিবারে প্রত্যেকেই তার নিজ মতামত প্রকাশ করে এবং সে মতামত প্রয়োগ করতেও বদ্ধপরিকর। আগের যুগের তুলনায় বর্তমান যুগের মানুষ অনেক বেশী রাজনৈতিক সচেতন। বাংলাদেশের অশিক্ষিত জনসমাজও রাজনীতি সচেতন। আর শিক্ষিত সচেতন পরিবারগুলোতে দেশীয় রাজনৈতিক দলের ভালমন্দসহ আন্তর্জাতিক রাজনীতি, শিক্ষা ও আলোচনা নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার। আগের যুগে পরিবারগুলোতে শিক্ষার কদর তেমন একটা ছিল না। তবে আধুনিক পরিবারগুলো শিক্ষার ক্ষেত্রে আগের তুলনায় অনেক বেশী সক্রিয়। শহরের আধুনিক শিক্ষিত মায়েরা শিশুর শিক্ষার প্রতি ব্যাপক যত্ন নিয়ে থাকেন। তারা শিশুকে নিজেরা আধুনিকতা শিক্ষা দেন এবং আধুনিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নিজেরা আনা-নেয়া করেন বা এজন্য অন্য ব্যবস্থা করেন।[৮]

৮। অধ্যাপক আবদুল খালেক, ইসলামের আলোকে পৌর বিজ্ঞান, আরাফাত পাবলিকেশন্স, ঢাকা-১৯৯৩, পৃ-৪৭।

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয়তঃ আজকাল নারীরা বেশ অধিকার সচেতন। বর্তমান পরিবারগুলোতে নারীরা পূর্বের ন্যায় শুধু স্বামীর অর্থোপার্জনের উপর নির্ভরশীল নয়। পারিবারিক স্বাচ্ছন্দ্য আনয়নের জন্য নারীরা পুরুষের পাশাপাশি বাইরের জগতে কাজ-কর্মে ব্যাপৃত থাকেন। এ প্রবণতা শুধু শহরাঞ্চলেই নয়, গ্রামাঞ্চলেও ধনী-দরিদ্র সকল পবিারে লক্ষ্য করা যায়। ফলে আগের যুগে নারীরা যেমন রক্ষণশীল ও ঘরমুখো ছিলেন বর্তমান যুগের পরিবারগুলোতে নারীরা ক্রমশঃ উদার ও অতিমাত্রায় বহির্মুখী। অর্থনৈতিক কারণে, প্রাতিষ্ঠানিক তথা দাপ্তরিক কাজে নারীর যে সময়টা ব্যয় হয় বা কাটে তার বাকী সময়টা কেটে যায় বিভিন্ন সামাজিক সংগঠনের সদস্য হিসেবে। এতে করে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাদের পারিবারিক সংগঠনটি শিথিল হয়ে পড়েছে, পারিবারিক মূল্যবোধ নষ্ট হচ্ছে। স্বামী অর্থনৈতিক দিক দিয়ে কর্মজীবনে প্রতিষ্ঠা লাভের কামনায়, এমনকি সামাজিক সিঁড়ির সর্বোচ্চ ধাপে উঠতে অত্যন্ত প্রতিযোগিতাপরায়ন হয়ে উঠেছে। স্বামীর এ প্রবণতা স্ত্রীর মাঝেও দেখা দেয়। ফলে পরিবারের সন্ত ানের সংখ্যা এমনিতে কমে আসে। স্বামী-স্ত্রীর কেহই তাদের সন্তানদেরকে যথার্থ সময় দিতে পারে না। তাদের সন্তান-সন্ততির লালন-পালনের ভার পরে চাকর-চাকরানীর উপরে। মা-বাবার সান্নিধ্য-বঞ্চিত শিশুরা চাকর-চাকরানীর তত্ত্বাবধানে থাকায় তাদের মেজাজ ও নৈতিক চরিত্রের অধঃপতন ঘটেছে।

তৃতীয়তঃ আমোদ-প্রমোদ তথা চিত্তবিনোদনের জন্য আগের লোকজনে সিনেমা, থিয়েটার, সার্কাস, যাত্রা ও জারীগান প্রভৃতিতে যেতেন। এখনও আগের মতই এগুলো চালু আছে। এর সাথে রেডিও, কেসেট রেকর্ডার, টেলিভিশন, ভিডিও কেসেট রেকর্ডার ইত্যাদি অবসর যাপনে এবং চিত্তবিনোদনের অন্যতম সুযোগ সৃষ্টি করেছে। চিত্তবিনোদনের মাধ্যমগুলো নৈতিকতা ও মূল্যবোধ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত না হওয়ায় এবং বাণিজ্যিক মনোভাব দ্বারা পরিচালিত হওয়ায় শিশুরা অপরাধ প্রবণ হয়ে উঠেছে, পারিবারিক অশান্তি বেড়েই চলছে। সামাজিক নিরাপত্তা হচ্ছে হুমকির সম্মুখীন।

চতুর্থতঃ বর্তমান যুগে কর্মজীবি মহিলারা সন্তানকে 'দিবাযত্ন কেন্দ্র' বা নার্সারিতে রেখে কর্মস্থলে যান। আবার দিনের শেষে নিয়ে আসেন। বাংলাদেশেও এমনটি সীমিত পরিসরে লক্ষ্য করা যাচ্ছে। এর ফলে ইসলামী মূল্যবোধ যেটুকু বাংলাদেশে বর্তমান আছে ভবিষ্যত বংশধরেরা আর পাবে না। কারণ ডে-কেয়ার সেন্টারের কর্তৃপক্ষের ইসলামী মূল্যবোধ শিক্ষা দেয়ার কোন দায়-দায়িত্ব নেই। তাছাড়া নার্সারিগুলো পরিবারের কিছুটা মনস্তাত্ত্বিক কাজ করার দায়িত্ব নিচ্ছে, কিন্তু পাশ্চাত্যে ইতোমধ্যে গবেষণার ফলে দেখা গিয়েছে যে নার্সারিতে রাখা শিশুদের সুষ্ঠ ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটছেনা। তারা কেউবা পরবর্তীতে হীনমন্যতায় ভোগে, কেউবা কিশোর অপরাধী হিসেবে গড়ে উঠে। বস্তুতঃ পরিবারের স্নেহ-শাসনের কোন বিকল্প নেই।

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চমতঃ আবার কর্মজীবি মহিলারা অধিকতর সুযোগ-সুবিধা তথা স্বাধীনতা লাভের আশায় অনেকেই কর্মজীবি মহিলা হোস্টেলে অবস্থান করেন। অনেকে ইচ্ছা থাকলেও স্বামীর সঙ্গে থাকতে পারছে না। কারণ বদলীযোগ্য চাকুরীতে একত্রে থাকার সুযোগ একেবারেই সীমিত। যেসব মহিলা ম্যাজিস্ট্রেট কিংবা পুলিশ কিংবা অনুরূপ কোন পদের অধিকারিনী কিংবা যে সব মহিলার জন্য সর্বত্র ভ্রমন করা চাকুরীর অঙ্গ তাদের পক্ষে স্বামীর সংসার করার সুযোগ আরো সীমিত। এ ধরণের কর্মজীবি মহিলাদের পারিবারিক জীবন যাপন অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত। স্বামীর কাছে তার শ্বশুর বাড়ীর যেরূপ সম্পর্ক স্ত্রীর কাছেও স্বামীও তার পিতৃগৃহের সম্পর্ক অনেকটা সেরূপ।[৯]

বর্তমান যুগের পরিবারগুলোতে স্বামী-স্ত্রী আগের যুগের তুলনায় বেশী আত্মকেন্দ্রিক ও স্বার্থপর। কর্মজীবন পিতৃ পরিবারের বাইরে হওয়ায় এ অবস্থা দেখা দিয়েছে। পিতা-মাতা থেকে দূরে অবস্থানরত ও কর্মরত সন্তান বাবা-মার খোঁজ-খবর নেয়ার প্রয়োজনও অনেক সময় মনে করেন না। পশ্চিমা জগতে বয়োঃপ্রাপ্ত হওয়ার পর ছেলেদের ন্যায় মেয়েরাও বাবা-মা থেকে আলাদা হয়ে যায়। মা-বাবা ও তার বয়োঃপ্রাপ্ত সন্তানাদির ভাল-মন্দের দায়িত্ব গ্রহণ করেন না। সন্তানেরাও তাই মা-বাবার দায়িত্ব গ্রহণে উৎসুক হয় না। বাংলাদেশেও দিনে দিনে এ মনোভাব বেড়েই চলছে। আগে মানুষের ভিতরে আত্মকেন্দ্রিকতা ও স্বার্থপরতা তেমন একটা ছিল না বিধায় অনেকেই ভাই-বোনসহ নিকটাত্মীয়জনদের খাদ্য, বস্ত্র ও শিক্ষার ভার নিত। এখন এ ব্যাপারে কোন কর্তব্য বড় ভাই বা চাচা-মামা হিসেবে আছে বলে অনেকে মনে করতে চান না। স্ত্রীগণ অনেক সময় শাশুড়ীর সাথে একত্রে বাস করা পছন্দ করে না। তবে আরেকটা মর্মান্তিক দিক হল বর্তমান পরিবারে পিতা-মাতার লালন-পালন ও সেবা-যত্ন। পাশ্চাত্য জগতে এ বিষয়ে সন্তানের কোন দায়িত্ব নেই। সেখানে বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের সেবা-যত্নের জন্য অনেক সমাজ কল্যাণমূলক সংগঠন রয়েছে সেখানেই তারা থাকেন। কিন্তু পারিবারিক পরিমন্ডলের আপনজনদের মত আন্তরিক স্নেহ, ভালবাসা, ভক্তি ও শ্রদ্ধার সেখানে লেশমাত্রও নেই।

হাসপাতালে রোগী দেখতে যাওয়ার মতই সন্তানেরা বৃদ্ধ মা-বাবাকে মাঝে মাঝে দেখতে যান। এতে বৃদ্ধদের যে মানসিক যাতনা অসম্ভব বৃদ্ধি পায়, একটু স্নেহ ও মমতার পরশ পাওয়ার জন্য তারা যে অস্থির থাকেন, সে দিকে দৃষ্টিপাত করা পাশ্চাত্য সমাজ প্রয়োজন মনে করে না।[১০]

৯। অধ্যাপক আবদুল খালেক, প্রাগুক্ত, পৃ-৪৮।

১০। অধ্যাপক আবদুল খালেক, প্রাগুক্ত, পৃ-৪৯।

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশেও এর ছোঁয়া লক্ষ্য করা যাচ্ছে। এখানে এখনও বৃদ্ধ পিতা-মাতা অনেক সময় নিজ গৃহে একাকী নিঃসঙ্গ জীবন যাপন করছেন। সন্তানেরা, পুত্রবধুরা, নাতী-নাতনীরা মাঝে মাঝে তাদের দেখতে যান। এতেই তাদের কর্তব্য সমাধা হয়। তবে আমাদের বর্তমান পারিবারিক অবস্থায় পাশ্চাত্য প্রভাবে জাতীয় মূল্যবোধ ও ঐতিহ্য ব্যাপকতর হুমকীর সম্মুখীন হলে ঐতিহ্যগতভাবে পাশ্চাত্যের তুলনায় বাংলাদেশের পরিবার কাঠামো খুবই মজবুত। এখানে পরিবারে সদস্যদের মধ্যে আজও আবেগ, ভালবাসা এবং মানসিক মন্ধন অতি দৃঢ়। পরিবার ও অনুবর্ধিত বা যৌথ যাই হউক না কেন এতে জ্ঞাতিসম্পর্কের বন্ধন এতই প্রবল যে অনেক সময়ই তা যুক্তিকে উপেক্ষা করে। জ্ঞাতিপ্রথা, তা সে রক্ত সম্পর্কীয় হউক, বৈবাহিক সম্পর্ক ভিত্তিক হউক, হউক তা কৃত্রিম বা দত্তক গ্রহণ জ্ঞাতিসম্পর্ক আমাদের সমাজ এবং জাতীয় জীবনে এতই প্রবল যে, এ না হলে যেন চলে না। বাংলাদেশে যুক্তিসিদ্ধ কোন নীতি ও আইন এ কারণেও ব্যহত হয়, স্বজনপ্রীতির এটা একটা অন্যতম কারণ।[১১]

তবে শিক্ষার প্রসারতা, ব্যক্তিস্বাতন্ত্রের ধারণা, আর্থিক দূরাবস্থা, ব্যক্তিত্বের সংঘাত এবং ভুল বুঝাবুঝির কারণে পরিবারের জ্ঞাতিসম্পর্কের যে অবনতি দেখা দিয়েছে তা তো ইতোমধ্যে আলোচনা হল। তবে এটা অনিবার্য সত্য ও অনস্বীকার্য যে, এ অবনতি পরিবারের কাঠামোকে আজও তেমন একটা দূর্বল করতে পারেনি। তবে এই অবনতি প্রবণতা রোধের জন্য পারিবারিক জীবন ব্যবস্থায় ইসলামী আদর্শ ও মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠার বিকল্প নেই।

১১। ড. মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ-৭৭।

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশের সমাজ ব্যবস্থায় নারীর অবস্থান ঃ

আমাদের বর্তমান সমাজ সম্পূর্ণ পুরুষ শাসিত। দেশে মহিলা প্রধান সম্বলিত পরিবারের সংখ্যা খুবই কম। অর্থাৎ মোট পরিবারের ১০% এর কম। এ জাতীয় পরিবারগুলোর অধিকাংশই আবার কর্মক্ষম পুরুষ নেই বা মহিলারা নামমাত্র পরিবার প্রধান। পরিবারে কর্মক্ষম পুরুষ থাকা সত্বেও মহিলা প্রকৃতপক্ষে প্রধান এরূপ পরিবারের সংখ্যা খুবই কম। এর পিছনে গ্রহণযোগ্য বহুবিধ কারণ রয়েছে। সমাজে পুরুষ ও মহিলাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার বিভিন্ন দিকগুলোর তুলনায় মহিলাদের অবস্থান তেমন একটা উন্নত নয়। পারিবারিক ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণে মহিলাদের ভূমিকা এতটা জোরালো নয়। এতে পুরুষের মতামতই প্রাধান্য পায়। অন্যদিকে আবার গ্রাম সমীক্ষাগুলোতে দেখা যায়, মহিলাদের দৈনিক গড় কাজের সময় পুরুষদের চেয়ে বেশী এবং মহিলারা অপেক্ষাকৃত বেশী অপুষ্টির স্বীকার। মহিলাগণ অপুষ্টিতে ভোগেন তার প্রধান কারণ শতশত বছরের সামাজিক মূল্যবোধ, যা শিক্ষা ও আর্থিক কারণে পারিবারিক জীবনের সাথে মিশে রয়েছে। বাংলাদেশের অধিকাংশ মহিলা বিশেষ করে গ্রামীণ নারী সমাজ ত্রুটিপূর্ণ সামাজিক মূল্যবোধ ও কুসংস্কারে বিশ্বাসী। এ ব্যবস্থায় নারী সমাজ বরাবরই পুরুষের মুখাপেক্ষী। তাই পুরুষ শাসিত সমাজ ব্যবস্থায় গৃহস্থালী কর্মসম্পাদন, সন্তান গর্ভধারণ, জন্মদান, ও লালন-পালন এটাই ছিল নারীর কর্মধারা। নারী সমাজের এ কর্মধারাকে অব্যাহত রাখার জন্য সমাজ ব্যবহার করে আসছে নারীর দূর্বতলা, অজ্ঞতা ও অসহায়ত্বকে। বাঙ্গালী মুসলিম সমাজ নারীকে চিরকালই অন্দর মহলের বাসিন্দা বলে গণ্য করেছে। মহিলাদের একমাত্র ভূমিকা ছিল গৃহিনী ও জননী হিসেবে। চল্লিশের দশকে মুসলিম অভিজাত শ্রেণী নারীর উচ্চ শিক্ষাকে সমর্থন জানালেও সমাজ জীবনে এ মৌলি মূল্যবোধটুকু হারিয়ে ফেলেন। যে সমস্ত কারণে তারা মেয়েদের শিক্ষিত করা লাভজনক বলে বিবেচনা করেছিলেন তাহল যথাক্রমে জাতীয়তাবাদী অহংকার, পরিবর্তনশীল পরিবার ব্যবস্থা ও চাকুরীর পরিস্থিতি, নগরায়ন সমাজে উচ্চ মর্যাদা লাভের সুযোগ ও পাশ্চাত্য প্রভাব। কিন্তু মেয়েদের সামাজিক মর্যাদা পুরুষের সমান-এরূপ স্বীকৃতি পুরুষরা কোনদিন দেননি। নারী শিক্ষার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল গৃহিনী ও জননী হিসেবে তাদের উৎকর্ষ সাধন করা।[১২]

বাংলাদেশের পিতৃতান্ত্রিক পরিবার ব্যবস্থায় বাবা সব সময় মেয়েদের শিক্ষা ও আচরণকে নিয়ন্ত্রিত ও নির্দিষ্ট করে রাখছেন। অন্যদিকে মায়েরা আনুষ্ঠানিক শিক্ষার ক্ষেত্রে সমাজের সনাতনী মেয়েলী আদর্শ বজায় রাখা এবং নারী সুলভ গুণাবলী অর্জন করার ব্যাপারে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখেন। অবশ্য এ ক্ষেত্রে বাংলাদেশ একক নয়, সকল পিতৃশাসিত সমাজেই এ অবস্থা বিরাজমান।

১২। নারী ও শিক্ষা ঃ উইমেন ফর উইমেন রিসার্চ এন্ড স্টাডি গ্রুপ, ৮/৫, লালমাটিয়া, ঢাকা, পৃ-২৩।

Dhaka University Institutional Repository

গ্রামীণ সমাজের দিকে দৃষ্টিপাত করলে দেখা যায় লোকগাঁথা, ধর্মীয় অনুষ্ঠান ইত্যাদির মাধ্যমে স্বামীর জন্য আত্মোৎসর্গীত নারীদের আদর্শ নারী হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। স্বামী-সন্তানদের জন্য আত্মত্যাগ করাকে গৌরবজনক বলে নারীদেরকে শিক্ষা দেয়া হয়। তার জন্য কুর'আন পাঠ ও ধর্মীয় শিক্ষাকেই যথেষ্ট মনে করা হয়। বয়োঃসন্ধির সাথে সাথে তাকে পর্দা মেনে চলতে হয়। স্কুলে পড়লে এ সময় তাকে স্কুল ছাড়তে হয় পর্দা মানার জন্য। পর্দা প্রথার দরুন বাড়ীর বাইরে তার যাতায়াত ও মেলামেশা অত্যন্ত সীমিত। তাকে গৃহাভ্যন্তরেই থাকতে হয়। বাইরে যেতে বোরকা পড়ে অথবা মাথায় গোমটা দিয়ে শাড়ীতে দেহ ভালভাবে ঢাকতে হয়। একান্ত ঘনিষ্ট আত্মীয়-স্বজন ব্যতীত পুরুষ মানুষের সঙ্গ তাকে এড়িয়ে চলতে হয়। গৃহভ্যন্তরে অবস্থান করে যে সব কাজ করা যায় তাই সে করে। যে সব কাজে পুরুষের সংস্পর্শে আসার সম্ভাবনা থাকে যেমন বাজার করা বা ক্ষেতে কাজ করা সেগুলো পুরুষরা বা বয়স্ক মহিলারা করে থাকে। অবশ্য এ প্রবণতা সাধারণতঃ কমে আসছে।

গ্রামীণ সমাজে সাধারণতঃ মেয়েদের অল্প বয়সে বিয়ে হয়। বিয়ে পিতা-মাতা ও অভিভাবকরা ঠিক করেন এবং তাকে তাদের সিদ্ধান্ত মেনে নিতে হয়। বিয়ের পর সে পিত্রালয় ছেড়ে স্বামীর গৃহে গমন করে। স্বামী গৃহে তাকে সব কিছু মানিয়ে নিতে হয়।[১৩]

স্বামীর গৃহে একজন নারীর জীবন কঠোর অনুশাসন দিয়ে নিয়ন্ত্রিত। সে শাশুড়ী ও স্বামীর অন্যান্য আত্মীয়-স্বজনের অধীন। পরিবার ও নিজের ব্যাপারে তার নিজস্ব কোন মতামতের মূল্য দেয়া হয় না। স্বামীর পরিবারে তার মর্যাদা নির্ভর করে পরিবারে তার স্বামীর আর্থিক সাহায্যের পরিমাণের উপর এবং কোন কোন সময় কি পরিবাণ যৌতুক সে আনতে পেরেছে তার উপর।[১৪]

স্থান ও কালভেদে অবশ্য তার অধীনতার মাত্রায় ভিন্নতা দেখা যায়। মধ্যবিত্ত পরিবারের বয়স্কা মা হিসেবে সে বিশেষ সম্মান ও ক্ষমতার অধিকারী এবং তার মতামতের মূল্য দেয়া হয়। তথাপি অর্থ উপার্জনের জন্য সে গৃহের বাইরে যাবে তা আশা করা হয় না। আদর্শগতভাবে বাঞ্চনীয় যে, সে পিতা, ভাই, স্বামী বা পুত্র যে কোন পুরুষের অভিভাবকত্বে থাকবে এবং তার সব কিছুর প্রয়োজনে তাদের উপর নির্ভর করবে।[১৫]

১৩। Ayesha Noman, Status of women, University press lemited-1983, p.5.

১৪। নাজমির নূর বেগম, উপার্জন ও সামাজিক অবস্থান ঃ নীলগঞ্জের মহিলা, নারী গ্রন্থ প্রবর্তনা, ঢাকা-১৯৮২, পৃ-৮।

১৫। Ayesha Noman, Op-cit., PP. 6-7.

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশের বিবাহ ব্যবস্থায় নারী ঃ

বয়স্ক দু'জন নর-নারীর মধ্যে মিলনের এক চূড়ান্ত আদর্শ বা রীতিই হল বিয়ে। বয়স্ক পুরুষ ও মহিলাদের প্রায় সবাই বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়। পূর্বের বাল্যবিবাহ প্রথা আজকাল নিয়মের ব্যতিক্রম হিসেবেই কেবল টিকে আছে। অর্থনৈতিক ও সামাজিক কারণ এবং রাষ্ট্রীয়ভাবে আইন পাসের কারণে বিবাহের বয়স এখন বৃদ্ধি পেয়েছে। গ্রামে অল্প শিক্ষিত বা অশিক্ষিত কৃষক পরিবারে পুরুষের গড় বিবাহের বয়স ২০ বছর এবং মেয়েদের ১৫ বছর। শহরে শিক্ষিত পরিবারে তা যথাক্রমে ২৭ এবং ২২ বছরের মত। ইদানীং প্রধানতঃ অর্থনৈতিক কারণে এবং যৌতুক প্রথা উদ্ভব ও প্রসারের কারণে অনেক মা-বাবাই তাদের কন্যা সন্তানের বিয়ে দিতে বেগ পাচ্ছেন এবং পাত্রীর বয়স বেড়ে যাচ্ছে। অপরপক্ষে পাত্র জীবন যাত্রার ব্যয় নির্বাহ করতে পারবেনা এই দুশ্চিন্তায় বিয়ের বয়স বাড়িয়ে ফেলেছে। অবশ্য পাত্র-পাত্রী উভয় পক্ষেই আজকাল অর্থনৈতিকভাবে প্রতিষ্ঠিত হওয়াটাকে গুরুত্ব দিচ্ছে বলেও বিয়ের গড় বয়স একটু বৃদ্ধি পাচ্ছে। বাংলাদেশে অদ্যাবধি বিবাহ অভিভাবক কর্তৃক আয়োজিত ও সম্পন্ন হয়ে থাকে। প্রেম-পরিণয়ের মাধ্যমে বিয়ের সংখ্যা খুবই কম। সামাজিক ও ধর্মীয় মূল্যবোধ এটাকে তেমন সমর্থন করে না। তবে শিক্ষিত ছেলে মেয়েদের একটি অরুচিকর নগণ্য অংশ প্রেম-পরিণয়ে আবদ্ধ হয়। অশিক্ষিত গ্রামীণ পরিবার জীবনে এটার নজীর বা উদাহরণ নেই বললেই চলে। সাধারণত পাত্র-পাত্রীর অভিভাবকবৃন্দ নিজেরা অথবা মধ্যস্থতা রক্ষাকারী ঘটকের সাহায্যে বিবাহের কথা-বার্তা এবং চুক্তি সম্পাদন করেন। তবে পাত্র-পাত্রীর মতামতে গুরুত্ব দেবার প্রবণতা ইদানীং বৃদ্ধি পেয়েছে। পারিবারিক বংশ মর্যাদা, চেহারা, বয়স আর্থ-সামাজিক ও শিক্ষাগত মান ইত্যাদি পাত্র-পাত্রী নির্বাচনে আজও প্রধান বিবেচ্য বিষয়। অর্থ, ক্ষমতা প্রতিপত্তির বলয় বৃদ্ধির কারণেও কিছু পিতা-মাতা বিশেষ বিশেষ পরিবারে পাত্র-পাত্রীর বিয়ে দিয়ে থাকেন। পূর্বে মুসলিম সমাজে পাত্রপত্র কন্যাকে শুধু যে মাহর দিত তাই নয়, কন্যার মা-বাবাকে মোটা অংকের পণও দিতে হত।

হিন্দু সমাজে পিতার সম্পত্তিতে কন্যার উত্তরাধিকার স্বীকৃত নয় বিধায় গতানুগতিকভাবে সেখানে পাত্রকে যৌতুক দেয়ার রেওয়াজ প্রচলিত।[১৬]

১৬। ড. মোহাম্মদ হাবিবুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ-৭৮।

Dhaka University Institutional Repository

বেশ কয়েক দশক যাবত মুসলিম সমাজে যৌতুক প্রথা অনুপ্রবেশ করেছে যদিও মুসলিম পাত্র কন্যাকে আজও মাহর দিয়ে থাকে বা প্রতিশ্রুতি দেয়। যৌতুকের ফলে যে সামাজিক সমস্যা সৃষ্টি হয়েছে এবং অপরাধ সংঘটিত হচ্ছে তা নিরসনে দেশে যৌতুক বিরোধী আইন পাস হয়েছে।[১৭] এবং কিছু কিছু সুফল পাওয়া যাচ্ছে বটে, তবে তা মূল সমস্যা সমাধানে তেমন ভূমিকা রাখতে পারছেনা। কেননা সমাজের কাঠামোর মধ্যে পরিবর্তন না আনলে বা মেয়েদের কাজের অর্থনৈতিক মূল্য স্বীকৃত না হলে অথবা মেয়েদের আত্মপ্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা না থাকলে কন্যাদায়গ্রস্থ মা-বাবা ও কন্যা যৌতুকের শিকার হবেনই। অবশ্য সামাজিক সচেতনতা না থাকায় সমস্যাটি অহেতুক সবার উপর জেঁকে বসে আছে। মনে রাখা প্রয়োজন যে, যে ব্যক্তি যৌতুক চাগেছ তাকেও তার বোন বা মেয়ের বিয়েতে যৌতুক দিতে হবে। তাই এ বাস্তবতাটি সবাই অনুধাবন করলে এ সমস্যাটি আর বড় আকারে অনুভূত হয় না। উল্লেখ্য যে, যৌতুক প্রথা নিম্নবিত্ত ও উচ্চবিত্ত পরিবারেই বেশী লক্ষ্য করা যায়। ধনী পরিবারের যৌতুক লেন-দেন অনেক ক্ষেত্রে গর্বের ও সখের বিষয়। নিম্নবিত্তের ক্ষেত্রে আর্থিক দুরবস্থায় পাত্র পক্ষ যৌতুকের নামে কিছু সম্পদ ও সম্পত্তি করে নিতে চায়। শিক্ষিত মধ্যবিত্ত পরিবারেও যৌতুকের প্রভাব পড়েছে, যা মধ্যবিত্তের জীবনে এনে দিয়েছে দুশ্চিন্তা।[১৮]

মুসলিম সমাজে বিয়ের ক্ষেত্রে আন্তর্গোত্র বা বহির্গোত্রে বিবাহ মোটেই বিবেচনার বিষয় নয়। তবে নির্দিষ্ট চৌদ্দ রকমের ঘনিষ্ট মহিলা আত্মীয়ের সঙ্গে বিবাহ নিষিদ্ধ।[১৯] এছাড়া যে কোন মুসলিম পাত্র যে কোন মুসলিম পাত্রীকে বিয়ে করতে পারে। হিন্দু সমাজে মূলতঃ অন্তর্গোত্রে বিবাহ সম্পন্ন হয়। শিক্ষা ও সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধির কারণে বহু স্ত্রী গ্রহণ প্রথা সীমিত হয়ে এসেছে। মাহর ছাড়া সাধারণতঃ বিয়ে হয় না বা বিয়ের সময় মাহর উল্লেখ না করলেও পরে মাহর দিতে হয়। মাহর সাধারণত দুই প্রকার, যথা নির্ধারিত ও উপযুক্ত দেনমোহর। চুক্তিতে যে দেনমোহর নির্ধারিত হয় তা হল নির্ধারিত দেনমোহর এবং বিবাহে কোন মাহরের পরিমাণ ধার্য না হলে সেটা হল উপযুক্ত দেনমোহর। উপযুক্ত দেনমোহরের সময় স্ত্রীর সৌন্দর্য, পারিবারিক অবস্থান, স্বামীর সম্পদ ও যোগ্যতা ইত্যাদি দেখা হয়।

১৭। গাজী শামছুর রহমান, নারী, বাংলাদেশের আইনের ভাষ্য, এসোসিয়েশন ফর সোশ্যাল এডভান্সমেন্ট, ঢাকা-১৯৯০ দ্রষ্টব্য।

১৮। ড. মোহাম্মদ হাবিবুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ-৭৮।

১৯। আল কুর-আন, ৪ ঃ ২৩।

Dhaka University Institutional Repository

বিবাহের আগে বা পরে দেনমোহর নির্ধারিত হয় এবং পরিমাণ হানাফি মাযহাব অনুসারে কমপক্ষে দশ দেরহাম। মাহরের বিষয়ে একবার চুক্তিতে আসলে তা পরিশোধ করা বাধ্যতামূলক। অর্থাৎ মাহরের টাকা স্ত্রী যে কোন সময় দাবী করতে পারে এবং স্বামী তা পরিশোধ করতে বাধ্য। অথচ বাস্তব ক্ষেত্রে দেখা যায় বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই মাহর যথাযথভাবে পরিশোধ করা হয় না এবং আজও বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে বিয়ের রেজিস্ট্রেশন হয় না বলে মাহরের পরিমাণের সত্যাসত্য যাচাই করা সম্ভব হয় না।

বৈধ বিবাহের পর পরই উত্তরাধিকার বিষয়ে পারস্পারিক অধিকার সৃষ্টি হয়। তাতে পিতামাতা ও স্বামীর সম্পত্তির উপর সন্তান-সন্ততি ও স্ত্রী ওয়ারিশসূত্রে অধিকার পায়। সে সূত্রে স্ত্রী স্বামীর মৃত্যুর পর সন্তান থাকতে $^{১}/_{৮}$ অংশ পায় এবং সন্তান না থাকলে $^{১}/_{৪}$ অংশ লাভ করে। অন্যদিকে বিয়ে হওয়ার কারণে একজন স্ত্রীলোকের পদমর্যাদার কোন পরিবর্তন হয় না। গ্রামীণ সমাজে ভূমির মালিকদের হাতে থাকে সমাজের ক্ষমতা এবং তারাই সমাজের যে কোন ব্যাপারে এককভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে থাকেন। ফলে ওয়ারিশসূত্রে প্রাপ্ত অংশটুকু নারী সঠিকভাবে ভোগ করতে পারে না। বিভিন্ন গ্রাম সমীক্ষায় দেখা গেছে যে, মাত্র এক চতুর্থাংশ কন্যা তাদের পৈত্রিক জমিজমার ন্যায্য ভাগ পেয়েছে। পৈত্রিক বাস্তু ভিটার অংশ সাধারণত কন্যারা দাবী করেনা এবং টাকা-পয়সা জাতীয় সম্পদ থেকে বঞ্চিত করতে চায় এ কথা যেমন সত্য তেমনি ভাইদের প্রতি অধিক সহানুভূতিশীল হয়ে বোনেরা অনেক সময় পৈত্রিক সম্পত্তির পুরো অংশ নেয় না- এ সত্যকেও নাকচ করে দেয়া যায় না।

ইসলামে সর্বপ্রকারা বৈধ কাজের মধ্যে সর্বাপেক্ষা ঘৃণ্য কাজ হল তালাক বা বিবাহ বিচ্ছেদ ব্যবস্থা। তবুও স্বামী-স্ত্রীণ মধ্যকার মনোমালিন্য কিংবা অন্যকোন সঙ্গত কারণে উভয়েরই বিবাহ-বিচ্ছেদ ঘটাবার অধিকার আছে। বাংলাদেশে বিবাহ বিচ্ছেদ সমস্যা ক্রমেই চরম ও জটিল আকার ধারণ করছে। পরিবারে রক্তের বন্ধন যদি শক্ত বা মজবুত থাকে এবং সামাজিক ও ধর্মীয় মূল্যবোধ যদি সে বন্ধনকে দৃঢ় রাখে তাহলে বিবাহ বিচ্ছেদ কমই দেখা দেয়।

Dhaka University Institutional Repository

তবে নিম্নবিত্তের মধ্যে অর্থনৈতিক দূরাবস্থার কারণে এবং যৌতুক অনাদায়ে বিবাহ বিচ্ছেদের মাত্রা ক্রমেই ভয়াবহ রূপ নিচ্ছে। এমনকি বাংবার বিয়ে করছে এবং স্ত্রীকে তালাক দিচ্ছে এমন নিম্নবিত্তের অধিকারী পুরুষের সংখ্যা অনেক। শিক্ষিত মধ্যবিত্তের মধ্যে বিবাহ বিচ্ছেদের কারণ ব্যক্তিত্বের সংঘাত ও সাংস্কৃতিক দ্বন্দ্ব। উচ্চবিত্তের মধ্যে বিবাহ বিচ্ছেদের কারণ প্রধানত ব্যক্তিত্বের সংঘাত, সাংস্কৃতিক দ্বন্দ্ব এবং জীবনদর্শন ও মূল্যবোধের সংঘাত। তবে সব শ্রেণীতেই মেজাজ, আচরণ ও জৈবিক কারণ বিবাহ বিচ্ছেদে অন্যতম কারণ।[২০]

নিম্নবিত্ত পরিবারে সাধারণতঃ স্ত্রীকে স্বামী তালাক দেয়। শিক্ষিত মধ্যবিত্ত ও উচ্চবিত্তেও মূলতঃ একই রীতি। তবে তুলনামূলকভাবে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত ও উচ্চবিত্তদের মধ্যে স্ত্রীরাও স্বামীকে তালাক দেয়। উল্লেখ্য যে, মুসলিম সমাজে তালাক দেয়ার ক্ষমতা স্ত্রীকে দেয়া হবে কিনা তা বিবাহ কাবিন নামায় উল্লেখ থাকতে হবে।

বাংলাদেশের মত একটি উন্নয়নশীল দেশে আত্মনির্ভরশীলতা অর্জনের ক্ষেত্রে মহিলাদের ভূমিকা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। তা যেমন জাতীয়ভাবে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির ক্ষেত্রে অনস্বীকার্য তেমনি তা সামাজিক উন্নয়নের ক্ষেত্রেও তাৎপর্যপূর্ণ। কারণ মহিলাদের অর্থনৈতিক পশ্চাদপদতাই বৈষম্যমূলক সামাজিক ও পারিবারিক মর্যাদা বা সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা সৃষ্টিতে সহায়ক। তবে এটাও সত্য যে, অধিকাংশ জনশক্তিকে পশ্চাদমুখী ও উন্নয়নবিমুখ রেখে কোন স্থায়ী উন্নয়ন সাফল্যমন্ডিত হতে পারে না। তাই বাংলাদেশের নারী সমাজের উন্নয়নের জন্য সংবিধানে তাদের কর্মের ব্যবস্থাকরণ ও সমান সুযোগ-সুবিধার কথা উল্লেখ রয়েছে।[২১]

২০। ড. মোহাম্মদ হাবিবুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ-৭৯।

২১। The Constitution of the people's Republic of Bangladesh (as modified upto May-2000),p.8

Dhaka University Institutional Repository

নারীদের কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে ধর্ম, বর্ণ, লিঙ্গ নির্বিশেষে সকল নাগরিক তার ক্ষমতা ও যোগ্যতা অনুযায়ী আর্থিক মজুরী পাবে বলে বাংলাদেশের সংবিধানে উল্লেখ করা হলেও বাস্তবে সম্পূর্ণ ভিন্নরূপ পরিলক্ষিত হয়। বর্তমান সমাজ ব্যবস্থায় লিঙ্গভিত্তিক শ্রম বিভাজন, সামাজিক কুসংস্কার, শিক্ষার অভাব, প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের অপর্যাপ্ততা, বৈষম্যমূলক দৃষ্টিভঙ্গি, ধর্মীয় মূল্যবোধ, সম্পত্তির মালিকানা, কর্মসংস্থানগত সমস্যা ইত্যাদি কারণসমূহ বাংলাদেশের নারীসমাজকে অর্থনৈতিক উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডে অংশগ্রহণের ক্ষেত্রকে করেছে সংকুচিত। দেশের আদম শুমারীর তথ্য অনুযায়ী প্রত্যক্ষ উপার্জনক্ষম শ্রমশক্তির শতকরা ৫ ভাগের কম হল মহিলা। এ মহিলা শ্রমশক্তির শতকরা ৭০ ভাগ কৃষিখাত ও বাকী ৩০ ভাগ অকৃষিখাতে নিয়োজিত। আমাদের দেশে কৃষিখাতে নিয়োজিত মোট শ্রমশক্তির শতকরা ৪০ ভাগের কম হল মহিলা। পক্ষান্তরে, কৃষিখাতে এর পরিমাণ প্রায় ৬ ভাগের কাছাকাছি। গত তিন দশকের আদমশুমারীর তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায় ১৯৬৯ সালে মোট মহিলা শ্রমশক্তির শতকরা যত ভাগ প্রত্যক্ষ উপার্জনের সাথে জড়িত ছিলেন বর্তমানের ভাগ তার চেয়ে অনেক কম। এ অবস্থা কৃষি-অকৃষি উভয় ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। বিধির মাধ্যমে বিভিন্ন ধরণের চাকুরীতে মহিলাদের জন্য শতকরা ১০/১৫ ভাগ পদ পূরণের চেষ্টা করলেও পুরুষের মত বেকার মহিলার সংখ্যাও দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে।[২২]

সাধারণভাবে দেখা যায় যে, পুরুষ ও মহিলাদের শুধু কর্মক্ষেত্রেই বৈষম্য নয়, মজুরী গত বৈষম্যও প্রকট। কর্মক্ষেত্রের বৈষম্যও সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি ও মূল্যবোধের কারণে নারীরা অনেক কম মজুরী পেয়ে থাকে। যেহেতু গ্রামের মহিলাদের সিংহভাগ ধান ও শস্য প্রক্রিয়াজাত কারণে ও গৃহভিত্তিক কর্মকান্ডে নিয়োজিত যা অনেকাংশেই মজুরীহীন নগদ আয়শূন্য বা নগণ্য মজুরী সম্পন্ন।[২৩]

আবার বাংলাদেশের মেয়েদের কর্মকালীন সময়কে পরিসংখ্যানগত পরিমাপে আনা অত্যন্ত কঠিন। কারণ, বাংলাদেশের প্রত্যেকটি মহিলাকে কম-বেশী আয়শূন্য গৃহজাত উৎপাদন কাজে বেশীর ভাগ সময় ব্যয় করতে হয়। এছাড়া শস্য প্রক্রিয়া জাতকরণ, সংরক্ষণ, গৃহভিত্তিক পশুপালন, রক্ষণা-বেক্ষণ, শাক-সজি উৎপাদন ইত্যাদি কাজও মহিলাদের করতে হয়, যা অর্থনৈতিক মানদন্ডে মূল্যহীন এবং জাতীয়ভাবে জি.ডি.পিতে ধারা হয় না। ফলে এসব কাজে মহিলাদের শ্রমের সময়কে মূল্যায়ন করা হচ্ছে না।[২৪]

২২। মোহাম্মদ রেজাউল করীম, "পরিবার গঠনে আর্থ-সামাজিক অবদানসমূহের ভূমিকা" সমবায়ের পরিকল্পনা প্রশিক্ষণ নির্দেশিকা, বাংলাদেশে পল্লী উন্নয়ন বোর্ড, ঢাকা-১৯৮৭, পৃ-২৬-২৭।

২৩। See, Ayesha Noman, Op. cit.,P. 18-26.

২৪। তাহমিনা আখতার, মহিলা উন্নয়ন ও পরিকল্পনা, বাংলাদেশ প্রেক্ষাপট, বাংলা একাডেমী, ঢাকা-১৯৯৫, পৃ- ১৪-১৯ দ্রষ্টব্য।

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় নারী ঃ

১৯৭১ সাল থেকে বাংলাদেশ সরকার সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা ও সাক্ষরতা নীতির উচ্চ প্রাধিকার আরোপ করে আসছে। দেশের পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাসমূহে নারী শিক্ষাকে এগিয়ে নেবার লক্ষ্যে কার্যকর পদক্ষেপসমূহ দৃশ্যমান। 'সবার জন্য শিক্ষা' মূলনীতির ভিত্তিতে চতুর্থ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় এগারটি লক্ষমাত্রা চিহ্নিত করা হয়েছে। "শিক্ষার প্রতি ক্ষেত্রে নারীদের অংশীদারিত্ব নিশ্চিতকরণ' --এগুলোর অন্যতম।

১৯৮১ সালে নারী সাক্ষরতার হার ১৬ শতাংশ। ১৯৯১ সালে তা বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে ২০.৩ শতাংশ। এই বছরগুলোতে নারী সাক্ষরতা ছিল পুরুষ স্বাক্ষরতার অর্ধেক। শহরভিত্তিক নারী সাক্ষরতা গ্রামীম নারী সাক্ষরতার প্রায় দ্বিগুন বিধায় এক্ষেত্রে আঞ্চলিক বৈষম্যও দৃশ্যমান।[২৫]

২৫। বেইজিং এনজিও ফোরাম'৯৫ সংক্রান্ত জাতীয় প্রস্তুতি কমিটি, বাংলাদেশ (খসড়া), ১৯৯৫,পৃ-৬।

Dhaka University Institutional Repository

সকল বয়সে, শহরে গ্রামে উভয়ক্ষেত্রে নারী ও পুরুষের মধ্যে সাক্ষরতার হারের ব্যাপক ভারসাম্য রয়েছে। ১৯৯৩ সালে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তিত হওয়ায় শিক্ষার্থী তালিকাভূক্তি সার্বিকভাবে উল্লেখযোগ্য পর্যায়ে উন্নীত হয়েছে। ইউনিসেফের পরিসংখ্যান অনুযায়ী ১৯৯৩ সালে শিক্ষার্থী তালিকাভূক্তি ছিল ৭৯ শতাংশ যা মধ্য দশকের লক্ষ্যমাত্রা ৮২ শতাংশের কাছাকাছি। ১৯৮১ সালে বালিকাদের ক্ষেত্রে এই তালিকাভূক্তির হার ছিল ৪০ শতাংশ। কিন্তু ঝরে পড়ার হার আশংকাজনকভাবে এখনও অনেক বেশী। সেটি তালিকাভূক্ত ছাত্রীর প্রায় ৫৫ শতাংশ প্রাথমিক স্তরে (১ম থেকে ৫ম শ্রেণী) শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে ঝড়ে পড়ে। নারী শিক্ষার প্রয়োজনীয়তার প্রতি বিরূপ সামাজিক মনোভাব, মেয়েদের সামাজিক নিরাপত্তাহীনতা, বিদ্যালয় পাঠ্যসূচীর আপাত অপ্রাসঙ্গিকতা প্রয়োজনীয় সুবিধাদি এবং ধারাবাহিক কার্যকর কর্মসূচীর অভাব ইত্যাদি এই প্রবণতার জন্য দায়ী বলে বিবেচনা করা হয়ে থাকে।[২৬]

মাধ্যমিক স্তরে (ষষ্ঠ থেকে দশম শ্রেণী) মেয়েদের তালিকাভূক্তির পর আরো হ্রাস পায় এবং বৃদ্ধি পায় ঝড়ে পড়ার পর। ১৯৯১ সালে মেয়েদের তালিকাভূক্তি ও ঝড়ে পড়ার হার ছিল যথাক্রমে ৩৩.৯ শতাংশ ও ৬০.৯ শতাংশ।[২৭]

২৬। উৎঃ উইমেন ইন বাংলাদেশ ঃ এ সিচুয়েশন এন্যালিসিস, ডাটা ইন্টার ন্যাশনাল, জুন-১৯৯০।

২৭। বেইজিং এনজিও ফোরাম'৯৫ সংক্রান্ত জাতীয় প্রস্তুতি কমিটি, বাংলাদেশ (খসড়া), ১৯৯৫,পৃ-৬।

Dhaka University Institutional Repository

শিক্ষায় নারীর অংশ গ্রহণের হার অধিকতর নিম্নগামী হয় উচ্চ মাধ্যমিক (২.৪৮%) ও উচ্চতর শিক্ষা (২.৫০%) স্তরসমূহে। বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে মহিলা শিক্ষার্থীর সংখ্যা মোট শিক্ষার্থী সংখ্যার ২৩ শতাংশ। মেডিকেল কলেজসমূহে এবং প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের যথাক্রমে ২৯ শতাংশ এবং ৯ শতাংশ মহিলা। কারিগরী ও বৃত্তিমূলক প্রতিষ্ঠানসমূহে মহিলা শিক্ষার্থী অত্যন্ত নগন্য, মাত্র ৫ শতাংশ। কৃষি ও অন্যান্য পেশাভিত্তিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মোট শিক্ষার্থীর ১৪ শতাংশ নারী।[২৮]

সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কেবল ৩% মহিলাদের জন্য নির্দিষ্ট প্রাথমিক স্তরে মোট বিদ্যালয়ের ৫৬ শতাংশ বালিকা বিদ্যালয়। মাধ্যমিক স্তরে ২০ শতাংশ বালিকা বিদ্যালয় এবং উচ্চতর পর্যায়ে উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ১০ শতাংশ মহিলাদের ব্যক্তি মালিকাধীন কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনা সংক্রান্ত সাম্প্রতিক নীতির কারণে এর পরিস্থিতির কিছুটা উন্নতি আশা করা যায়।[২৯]

শিক্ষাদান পর্যায়ে লিঙ্গ বৈষম্য বিরাজমান। প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহে ৬০ শতাংশ মহিলা শিক্ষক নিয়োগের লক্ষ্যে সরকারের ঘোষিত নীতি সত্ত্বেও এ সংখ্যা বর্তমানে প্রায় ৩০ শতাংশ। সব পর্যায়ের ক্ষেত্রেই পুরুষ শিক্ষকগণ সংখ্যা গরিষ্ঠ অংশে রয়েছেন।[৩০]

তুলনামূলকভাবে মহিলাদের জন্য শিক্ষা খরচত পুরুষদের শিক্ষা খরচের (৬৯%) অর্ধেকের কম (৩১%)। যেখানে মোট শিক্ষা খরচের প্রায় তিন-চতুর্থাংশ পুরুষের জন্য খরচ হয় সেখানে নারী শিক্ষার প্রতি গুরুত্বদানে জেন্ডার বৈষম্য দূরীকরণ সর্বাগ্রে প্রয়োজন।[৩১]

২৮। বেইজিং এনজিও ফোরাম'৯৫ সংক্রান্ত জাতীয় প্রস্তুতি কমিটি, বাংলাদেশ (খসড়া), ১৯৯৫,পৃ-৭।
২৯। বেইজিং এনজিও ফোরাম'৯৫ সংক্রান্ত জাতীয় প্রস্তুতি কমিটি, বাংলাদেশ (খসড়া), ১৯৯৫,পৃ-৭।
৩০। বেইজিং এনজিও ফোরাম'৯৫ সংক্রান্ত জাতীয় প্রস্তুতি কমিটি, বাংলাদেশ (খসড়া), ১৯৯৫,পৃ-৭।
৩১। বেইজিং এনজিও ফোরাম'৯৫ সংক্রান্ত জাতীয় প্রস্তুতি কমিটি, বাংলাদেশ (খসড়া), ১৯৯৫,পৃ-৭।

Dhaka University Institutional Repository

নব্বই দশকের প্রথম দিকে দেশের ৪৬০টি থানার ৬ষ্ঠ হতে ১০ম শ্রেণী পর্যন্ত সকল মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও মাদ্রাসাযস অধ্যয়নরত ছাত্রীদের শতকতা ৭৫ ভাগে ক্লাসে উপস্থিতি, শতকরা ৪৫ ভাগ নম্বর পেয়ে পাশ এবং এস.এস.সি. অথবা দাখিল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবার আগে বিয়ে না করার শর্তে বিনা বেতনে পড়ার সুযোগ দেবার ব্যবস্থা গৃহীত হয়েছে। সেই সাথে রয়েছে উপবৃত্তি কর্মসূচী। ১৯৯৭ সালে পৌরসভার বাইরের এলাকাতে শর্তসাপেক্ষে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত ছাত্রীদের বেতন মওকুফের এবং উপবৃত্তি কর্মসূচীর সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। ১৯৯৮ সাল থেকে দেশের ২৬০টি গ্রামীন থানায় পাঁচ বছরের জন্য উপবৃত্তি কর্মসূচী শুরু হয়েছে।

বাংলাদেশের সামাজিক অবস্থা ও তাতে নারীর অবস্থান সম্পর্কে যে পর্যালোচনা করা হল তাতে দেখা যায়, নারীর অবস্থান এতে যথার্থ অর্থেই নেতিবাচক। যুগ যুগ ধরেই নারীরা পুরুষ সমাজের চিরাচরিত দৃষ্টিভঙ্গি ও সমাজের সার্বিক স্থিতিশীলতার অভাবের জন্য অবজ্ঞা, অবহেলা ও নির্যাতনের শিকার হয়ে আসছে। বর্তমান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উন্নতির এ চূড়ান্ত যুগে নারী সমাজ বিশেষ করে বাংলাদেশের নারী সমাজ তাদের ব্যক্তিত্ব ও অধিকার সম্পর্কে বেশ সচেতন হয়ে উঠছেন। এটা বেশ উৎসাহজনক ব্যাপার। নারী সমাজ তাদের অধিকার সচেতনতার কারণে এখন শিক্ষায়, রাজনীতিতে, রাষ্ট্র পরিচালনায়, সরকারী-বেসরকারী চাকুরীসহ বিভিন্ন পেশায় এবং অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে ব্যাপক সংখ্যায় এগিয়ে আসছে। তথাপি তারা বিভিন্ন ক্ষেত্রে নির্যাতিত হচ্ছে। তারা ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত। যৌতুক, বাল্যবিবাহ, ধর্ষণ, বহুবিবাহ, তালাক, নারী পাচার, অকালে গর্ভধারণ ইত্যাদি মানবসৃষ্ট সামাজিক অভিশাপকে বয়ে বেড়াতে হচ্ছে নারী সমাজকেই। সমাজ ব্যবস্থা ও পরিবেশগত কারণে যুগ যুগ ধরে আমাদের দেশে নারীদের প্রতি বৈষম্য চলে আসছে। দৈহিক কারণ তো রয়েছেই। নিত্যদিনকার পত্রিকার পাতা খুললেই আমরা দেখতে পাই নারী নির্যাতনের ও নারী বৈষম্যের করুণ চিত্র, অধিকার হারানো নারীর করুণ হাহাকার, বৈষম্যের শিকার কন্যা শিশুর সকরুণ আহাজারি।

গ্রাম-গঞ্জে নারী নির্যাতনের হার অনেক বেশী। গ্রাম-গঞ্জের অধিকাংশ নারী গরীব এবং চরম দরিদ্র। তাদের শিক্ষা ও সচেতনার অভাব রয়েছে। তারা ভোগছে নিরাপত্তাহীনতায়। কোন অর্থনৈতিক নির্ভরশীলতা তাদের নেই বললেই চলে। পুরুষের তুলনায় আর্থ-সামাজিক মর্যাদা তাদের খুবই কম।

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশের সমাজে ইসলাম ঃ

সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে বাংলাদেশের নারী সমাজের এই পশ্চাদপদতা পুরুষ সমাজের দৃষ্টিভঙ্গি ও নারী পুরুষ সমতাবিষয়ে অনেকেই ধর্ম বিশেষতঃ ইসলামকে প্রধান প্রতিবন্ধক হিসেবে মনে করছে। নারী নির্যাতন, উৎপীড়ন ও অধঃস্তনের জন্য দায়ী করা হচ্ছে ইসলামের বিবাহ, বৈবাহিক সম্পর্ক ও মাতৃত্বকে। অর্থাৎ বাংলাদেশে মহিলাদের সামাজিক মর্যাদার স্বল্পতার পিছনে ক্রিয়াশীল একটি সাংস্কৃতিক উপাদান হল বিবাহ প্রথা, বৈবাহিক সম্পর্ক ও মাতৃত্ব।[৩২] বলা হয়েছে ইসলামে বিয়ে চুক্তি হিসেবে গণ্য হলেও বাস্তবে দেখা যায় তা দুই অসম পক্ষের মধ্যে চুক্তি। এখানে নারীর অধিকার অসম। পুরুষের তালাক দেবার, একসঙ্গে চার স্ত্রী রাখার, সন্তানের অভিভাকত্বের, স্ত্রীর শরীরের উপর পুরোপুরি অধিকার বিদ্যমান, অন্য পক্ষে নারীর অধিকার শুধু মাহর ভরণ পোষণের। এরও নিশ্চয়তা বিধান নেই। ফলে নারী এখানে অধঃস্তন। দেখা যাচ্ছে বিয়ের মাধ্যমে নারী-পুরুষের পারস্পারিক যে সম্পর্ক তা অসম। এ অসম সম্পর্ক বৈবাহিক জীবনে, মাতৃত্ব তথা নারীর সমস্ত জীবনে প্রভাব ফেলে। অসম সম্পর্ক শুধু ধর্মীয় দিক দিয়েই নয় সামাজিক কারণেও ঘটে থাকে। কারণ ধর্ম সমাজকে ভিত্তি করেই প্রতিষ্ঠিত।[৩৩]

ইসলাম নারী-পুরুষের সমতা, নারীদের সম্পত্তি ও উত্তরাধিকার সূত্রে সম্পদ প্রাপ্তির অধিকার, নাবালক সন্তানদের তত্ত্বাবধানের অধিকার, মাহরের অধিকার ইত্যাদি যা কিছু দিয়েছে অর্থাৎ ইসলাম সামাজিক বিন্যাসে নারীর উপযুক্ত অবস্থান তাদের ভূমিকা, কর্তব্য ও দায়িত্ব সহজাত গুণাবলী তাদের অধিকার এবং এরূপ অন্যান্য বিষয়াদি যে সুনির্দিষ্ট করে দিয়েছে ইসলামের সেসব মতাদর্শগত ধ্যান-ধারণাকে নারী বিরোধী বলে অনেকে মন্তব্য করে থাকেন।[৩৪] ইসলাম সম্পর্কে এসব বিশেষজ্ঞদের অভিমত ও চিন্তা-চেতনা একপেশে ও পক্ষপাত দোষে দুষ্ট। ইসলামে নারীর অবস্থান নিয়ে পর্যালোচনা করতে গিয়ে তারা নিরপেক্ষতা, উদারতা ও সুস্থ মন-মানসিকতার পরিচয় দিতে পারেন নি। অর্থাৎ ইসলামের যথার্থ অবস্থান ও সৌন্দর্যকে তুল ধরতে পারেননি।

৩২। সুরাইয়া বেগম, নারী নির্যাতনের একটি দিক, বাংলাদেশের নারীর নির্যাতন, সম্পাদনা-বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীর ও জরিনা রহমান খান সমাজ নিরীক্ষণ কেন্দ্র, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়-১৯৮৭, পৃ-৩৩-৪৮।

৩৩। সুরাইয়া বেগম, প্রাগুক্ত, পৃ-৩৮-৩৯।

৩৪। রেহনুমা আহমেদ, ধর্মীয় মতাদর্শ ও বাংলাদেশে নারী আন্দোলন, বাংলাদেশ নারী নির্যাতন, পৃ-৯৭-১১০ দ্রষ্টব্য।

Dhaka University Institutional Repository

ইসলাম দৈহিক গঠন ব্যতীত অন্যান্য মৌলিক মানবাধিকারসহ সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক প্রশ্নে নারী-পুরুষের কোন প্রকার বৈষম্যকে স্বীকার করে না।[৩৫] কেননা নারী-পুরুষ একই উপাদান হতে একই রকম আবেগ-অনুভূতি নিয়ে সৃষ্ট। সামাজিক ক্ষেত্রে উভয়েই একে অপরের সহযোগী। সুতরাং নারীরা সমাজের কোন বিচ্ছিন্ন অংশ নয়। নারীরা মানব সমাজেরই অতি প্রয়োজনীয় একটি বিরাট অংশ। তাই ইসলাম মনে করে এদের বাদ দিয়ে হয়তো সমাজ হতে পারে, মানব সমাজ হয় না। তাই যে সমাজে নারীর বসবাস সে সমাজ ব্যবস্থার মর্যাদা ও উন্নয়নকে নিশ্চিত করতে পারলেই নারী-পুরুষ উভয়ে তার ফল ভোগ করতে পারবে।

আমাদের বর্তমান জনসংখ্যার প্রগতিশীল মানব জাতির একটি অংশ হল নারী সমাজ। ইসলামে নারী-পুরুষের অধিকার সমান, কিন্তু কাজের দায়িত্ব পরিপূরক। ইসলাম নারীকে পূর্ণ মর্যাদা ও সম্মান দিয়েছে। মহান আল্লাহ নারীদেরকে যে মর্যাদা দিয়েছেন এবং যে সব অধিকার তাদের প্রাপ্য প্রত্যেক নারী তা কুর'আন ও সুন্নাহর আইন-বিধানে অর্জন করে নিতে পারেন। প্রথাগতভাবে ইসলামী সমাজে নারীরা সাধারণত গৃহে থাকে এবং স্বামীরা তাদের সম্পত্তির দেখাশুনা করেন। এ বিষয়টি বর্তমানে এমন একটা ধারণা জন্ম দিয়েছে যে, ইসলামে নারীর স্থান পুরুষের নীচে এবং পুরুষের তুলনায় তাদের অধিকার ও মর্যাদা খুবই কম। এ ভ্রান্ত ধারণা দূর করা এবং নারীর মর্যাদা সংরক্ষণের জন্য ইসলামী বিধিমালা পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, দৈনন্দিন কাজে নারীদেরকে ইসলাম ঘরের বাইরে আসার ব্যাপারে স্বাধীনতা প্রদান করেছে। তবে শর্ত এই সময়ে তাদের শালীন পোশাক ও হিজাবের মাধ্যমে শারীরিক সৌন্দর্য ঢেকে রাখতে হবে। ইসলাম নারী জাতিকে কন্যার স্থানে কন্যার মর্যাদা, বোনের স্থানে বোনের মর্যাদা, স্ত্রীর স্থানে স্ত্রীর মর্যাদা এবং মায়ের স্থানে মায়ের মর্যাদা দিয়েছে। আজ সভ্যতার চরম উৎকর্ষে কোন কোন গোষ্ঠী বা সম্প্রদায় মনে করে ইসলাম নারীদেরকে উপহাস ও হেয় প্রতিপন্ন করছে। শুধু তাই নয়, তার বলে ইসলাম নারীকে ঘরবন্দী করে তাদের মর্যাদাকে বিনষ্ট করছে। দেখা যায় যে, ইসলাম নারী প্রগতি ও নারী মর্যাদার যে অধিকার দিয়েছে আর কোন ধর্ম ও সমাজ ব্যবস্থায় তা দেখা হয়নি।

৩৫। দ্রষ্টব্য, আল কুরআন, ২০ঃ১৮৭, ৩ঃ৯৫, ৪ঃ১, ৪৯ঃ১৩, ৯ঃ৭১
ও
৩৫। রেহনুমা আহমেদ, প্রাগুক্ত, পৃ-১০২-১০৫।

Dhaka University Institutional Repository

নারী জাতি পুরুষদেহ হতে নির্গত বা সৃষ্ট। ফলে উপাদানগত দিক থেকে পুরুষের চেয়ে নারীর মর্যাদা কম; ইসলাম এ ভুল ধারণা মিটিয়ে দিয়েছে এবং আল কুর'আন নারী ও পুরুষের মর্যাদা সমান বলে গণ্য করে বলেছে- " তাহারা তোমাদের পরিচ্ছদ এবং তোমরা তাহাদের পরিচ্ছদ"।[৩৬]

পোশাকের কাজ হল লজ্জাঅঙ্গ বা ছতর ঢাকা, সৌন্দর্য বৃদ্ধি করা এবং ময়লা হতে দেহকে রক্ষা করা। এখানে পুরুষের লেবাস বলে গণ্য করার অর্থ হল, যেভাবে পুরুষ নারীকে অনিষ্ট হতে রক্ষা করে এবং সেসব গুণ নারীর মধ্যে পাওয়া যায় না, তার পূর্ণতা বিধান করে তেমনিভাবে নারীও পুরুষকে অশ্লীল কর্ম থেকে ফিরে থাকতে সহায়তা ও পুরুষের মধ্যে যে গুণের ঘাটতি আছে তা পূর্ণ করে। এতে প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহর দৃষ্টিতে নারী ও পুরুষ মর্যাদায় সমান।

তিনি বলেন, "যে ব্যক্তি তিনটি কন্যা কিংবা তিনজন বোনকে লালন-পালন করে তাদেরকে শিষ্টাচার শিক্ষা দিয়েছে এবং নিজ পায়ে না দাঁড়ানো পর্যন্ত তাদের সাথে সদ্ব্যবহার করেছে আল্লাহ তারই জন্য জান্নাত ওয়জিব করে দিয়েছেন।"[৩৭] তিনি আরো বলেছেন, "যদি কোন ব্যক্তির কন্যা সন্তান ভূমিষ্ঠ হয় এবং সে তাকে কষ্ঠ দেয় না, ঘৃণা করে না এবং পুত্র সন্তানকে তার উপর প্রাধান্য দেয় না; তাহলে আল্লাহ তাকে জান্নাতবাসী করবেন।"[৩৮]

এভাবেই ইসলাম কন্যা বা নারী জাতির প্রতি জন্মলগ্ন থেকেই সুবিচার ও সুন্দর আচরণ করেছে, বিশ্বে যার দ্বিতীয় কোন নজীর নেই। কেননা নারী শিক্ষার উপর গোটা জগতে সুখ-শান্তি, উন্নতি ও কল্যাণ নির্ভরশীল। বিশ্বমানব সমাজকে প্রকৃত মানুষ করতে যার অবদান সর্বাধিক সে মা অর্থাৎ নারী সমাজকে সুশিক্ষিত না করলে সবই বরবাদ হবে। তার জন্য মহানবী (সঃ) নারী সমাজের শিক্ষার উপর এত বেশী জোর দিয়েছেন। অথচ আজ গোটা সমাজের অধিকাংশ নারীই অশিক্ষিত। যারা যথাকথিত শিক্ষিত তারাও সুবাসহীন পাপড়ী নিয়ে ব্যস্ত। কেননা তাদের মধ্যে আল-কুর'আন ভিত্তিক বাস্তব শিক্ষা নেই।

৩৬। আল কুরআন, ২:১৮৭।
৩৭। অলি আল-দীন মুহাম্মদ, প্রাগুক্ত, বাব-আল শাফকাত ওয়া-আল রাহমাত আল খলকী, পৃ-৪২৩।
৩৮। অলি আল-দীন মুহাম্মদ, প্রাগুক্ত, পৃ-৪২৩।

Dhaka University Institutional Repository

আমাদের সমাজে অনেকে নারী শিক্ষার ব্যাপারে অবচেতন। অনেকে মনে করেন মেয়ের জন্য শিক্ষা নয়। আবার অনেকের ধারণা মেয়েরা তার বাবা কিংবা স্বামীর কাছ থেকে ঘরে বসে শিখবে। কিন্তু আমাদের দেশে প্রত্যেক ঘরেই একজন শিক্ষিত বাবা পাওয়া যাবে এর নিশ্চয়তা আছে কি? আর বাবাও যে সব বিষয়ে পুরোপুরি জ্ঞানের অধিকারী হবেন তাও কি সম্ভব? শুধু ঘরে বসেই যদি শিখা যেত তাহলে অনেক মহিলা সাহাবী তাঁর স্বামীর কাছে না শিখে কেন মহানবী (সঃ) এর কাছে; কখনও হযরত আয়েশা (রঃ) এর নিকট আসতেন। তাই যথোপযুক্ত শিক্ষা গ্রহণ করতে ঘরের বাইরে আসতে হবে এ কথা বলাই বাহুল্য। এজন্য ইসলাম সমাজের প্রতিটি নর-নারীর প্রতি শিক্ষাকে ফরজ করেছে। তাই কোন জাতি যদি সমাজের নারী ও পুরুষ উভয় অংশকে শিক্ষিত না করে তুলে তাহলে সমাজের পূর্ণাঙ্গ বিকাশ হয় না। তবে শিক্ষা ক্ষেত্রে সমাজকে সব সময় লক্ষ্য রাখতে হবে মেয়েদের জন্য বেধে দেয়া নির্দিষ্ট চলার পথ থেকে সরে যাওয়া চলবে না।

আমাদের দেশে মেয়েদের উচ্চ শিক্ষা গ্রহণের সুস্থ পরিবেশ নেই। পুরুষ শাসিত সমাজ মেয়েদের দমিয়ে রাখার উদ্দেশ্যে তাদের শিক্ষার সুবিধাদি হতে বঞ্চিত করা হচ্ছে। দেশে প্রতিষ্ঠিত বয়েজ স্কুল-কলেজের সমান সংখ্যক গার্লস স্কুল-কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়নি। এখানে সহশিক্ষার কালচার বিদ্যমান। সহশিক্ষা ব্যবস্থায় নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশার কুফল সমাজে ভয়ঙ্কর রূপে দেখা দিচ্ছে। মেয়েদের জন্য একটি বিষয়ে বিশেষ করে উচ্চতর ডিগ্রী নেয়া অপরিহার্য আর তা হচ্ছে চিকিৎসা শাস্ত্র। নারীদের স্বাস্থ্যগত অনেক বিষয় রয়েছে যা শুধু একজন নারীর কাছেই খুলে বলা যায়। সে ক্ষেত্রে মেয়েদের জন্য স্বতন্ত্র মহিলা মেডিকেল কলেজ, মহিলা মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা অতি জরুরী। মুসলিম দেশ হিসেবে যা অনেক আগেই করা উচিত ছিল, কিন্তু তা হয়নি। মেডিকেলে ছেলে-মেয়ে সমানভাবে প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে, অনেক মেয়েই ভর্তির সুযোগ পায় না। অথচ একজন সুস্থ মা-ই কেবল পারেন সুস্থ ও পূর্ণাঙ্গ শিশু উপহার দিতে। আর সুস্থতা অর্জনে মাকে অবশ্যই প্রয়োজনীয় চিকিৎসা সেবা নিশ্চিত করতে হবে। কিন্তু আমাদের সমাজে এর কোনটাই হয়নি। সমাজের এক অর্ধাংশকে শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত রেখে আমরা কি পাচ্ছি? আমরা পাচ্ছি বিকলাঙ্গ, মেধাহীন, মানসিক ভারসাম্যহীন অপূর্ণাঙ্গ শিশু। যদিও সে সুস্থ হয়ে জন্মায়; তবে বেড়ে উঠে একজন শিক্ষাবঞ্চিত আদর্শহীন মায়ের ক্রোড়ে। ফলে বড় হয়ে তারা সামাজিক মূল্যবোধ অর্জনে ব্যর্থ হয়। তাই নারী-পুরুষ উভয়ের জন্য সমান শিক্ষার সুযোগ দেয়া শুধু সময়ের দাবীই নয়, বরং ইসলামের এক অপরিহার্য কর্তব্য। যার প্রতি অবহেলা অমার্জনীয় অপরাধ।

Dhaka University Institutional Repository

ইসলামের পর্দা প্রথা সম্পর্কে আজকাল বিভিন্ন অযুহাতে কোন কোন মহল থেকে ব্যাপক সমালোচনা করা হচ্ছে। নারী প্রগতি তথা নারী জীবনের সার্বিক উন্নতি ও অগ্রগতির ক্ষেত্রে পশ্চাদপদতাকে এবং নারী-পুরুষের বৈষম্যের জন্য দায়ী করা হয় পর্দা প্রথাকে। তবে এ কথা জোরের সাথেই বলা যায় যে, তাদের এ চিন্তা-চেতনা সম্পূর্ণ অজ্ঞতা প্রসূত। ইসলাম সম্পর্কে অজ্ঞতা হেতুই তারা এমনটি চিন্তা করে থাকে। সভ্যতার এ যুগেও প্রাক-ইসলাম যুগের মতই নারী সমাজ অবহেলিত ও নিপীড়িত। এখনও নারীরা ক্ষেত্র বিশেষে চরিত্রহীন পুরুষদের সহজ ভোগ্য হয়েছে- হয়েছে সর্বকাজের সহসঙ্গিণী। আজও সে দিনের মতই বিয়ে কষ্টসাধ্য হয়েছে। ভ্রুণ ও অবৈধ সন্তান হত্যার হার ক্রমেই বেড়ে চলেছে। তালাক, হত্যা, ধর্ষণ, এসিড নিক্ষেপ ইত্যাদি সমাজে অহরহ ঘটছে। একবারও কি আমরা ভেবে দেখেছি এর পেছনে কারণ কি? এর একটি মাত্র কারণ হচ্ছে শালীনতা তথা পর্দা ব্যবস্থার অনুপস্থিতি। এ বিপদ থেকে নারী সমাজকে পুরুষ সমাজের সমপর্যায়ে অর্থাৎ পারস্পারিক শ্রদ্ধাপূর্ণ অবস্থানে নিয়ে আসার জন্য ইসলাম পর্দা ও সুশৃংখল বিয়ের ব্যবস্থা জারী করে। নিষিদ্ধ করে দেয় অবৈধ যৌনাচার এবং এ জন্য ক্ষেত্র বিশেষে মৃত্যুদন্ডের মত কঠিন শাস্তির ব্যবস্থা করেছে। কেননা অবৈধ যৌনাচার ও বিবাহবহির্ভূত তথাকথিত গোপন প্রেম নারী জাতিকে পুরুষের নিকট বেওয়ারিশ জানোয়ার বিশেষের মত অপাংক্তেয় ও ঘৃণিত করে তুলে। সাথে সাথে সমাজ জীবনকে করে ধ্বংস ও কুলষিত। আল-কুর'আনে তাই বলা হয়েছে, "সুতরাং তাহাদিগকে বিবাহ করিবে তাহাদের অভিভাবকের অনুমতিক্রমে এবং যাহারা সচ্চরিত্রা, ব্যভিচারিণী নহে ও উপপতি গ্রহণকারিণীও নহে তাহাদিগকে তাহাদের 'মাহর' ন্যায়সংগতভাবে দিবে।"[৩৯] আবার বলা হয়েছে, "তোমরা যিনার ধারে কাছেও যেওনা অর্থাৎ যিনার পরিবেশ তৈরী কর না।"[৪০] অপরদিকে নারীকে সতর ঢাকা ও পর্দা করার জন্য বলা হয় "হে বণী আদম! তোমাদিগের লজ্জাস্থান ঢাকিবার ও বেশভূষার জন্য আমি তোমাদিগকে পরিচ্ছদ দিয়াছি এবং তাকওয়ার পরিচ্ছদই সর্বোৎকৃষ্ট।"[৪১]

৩৯। আল কুর'আন-৪ঃ২৫।

৪০। আল কুর'আন-১৭ঃ৩২।

৪১। আল কুর'আন-৭ঃ১৬।

Dhaka University Institutional Repository

"মু'মিন নারীদিগকে বল, তাহারা যেন তাহাদিগের দৃষ্টিকে সংযত করে ও তাহাদিগের লজ্জাস্থানের হিফাজত করে; তাহারা যেন যাহা সাধারণ প্রকাশ থাকে তাহা ব্যতীত তাহাদিগের আভরণ প্রদর্শন না করে। তাহাদিগের গ্রীবা ও বক্ষদেশ যেন মাথার কাপড় দ্বারা আবৃত করে।"[৪২]

অন্যদিকে মু'মিন পুরুষদেরকেও একই নির্দেশ আল্লাহ দিয়েছেন। যেমন, "মু'মিনদিগকে বল, তাহারা যেন তাহাদিগের দৃষ্টিকে সংযত করে এবং তাহাদিগের লজ্জাস্থানের হিফাযত করে ইহাই তাহাদিগের জন্য উত্তম।"[৪৩]

এভাবেই ইসলাম পর্দাপ্রথা ও ব্যক্তিসত্তার পবিত্রতার দিক দিয়েও নারী ও পুরুষের সমতা বিধান করেছে। পারিবারিক কল্যাণের স্বার্থে নারী-পুরুষের সমতা বিধানের ক্ষেত্রে এর চেয়ে সুন্দর বিধান আর কিইবা হতে পারে? পর্দাটা এমন একটি প্রথা যার মাধ্যমে নারী জাতিকে দুষ্প্রাপ্য মূল্যবান সম্পদে পরিণত করে। মাঠে ময়দানে, হোটেলে-বারে, পার্লারে, গণিকালয়ে তাদেরকে সস্তায় না পেলে পুরুষ সমাজ তার স্বাভাবিক চাহিদার কারণেই পবিত্র কামনায় তাদের বিয়ে করে সুখী-সুন্দর সংসার করতে বাধ্য হবে। ফলে চিন্তা-চেতনার শালীনতার দিক দিয়ে স্বামী স্ত্রী হবে সমতার বন্ধনে আবদ্ধ এক মূল্যবান সম্পদ।

পর্দার মাধ্যমে সংরক্ষিত নারীর ছতরাঙ্গ যে মূল্যবান সম্পদে পরিণত হয় নারী যদি বেপর্দা হয়ে তা হারিয়ে ফেলে তখন সে সমাজ ও ধর্মীয় দৃষ্টিতে হয়ে উঠে ঘৃণিত ও অপাংক্তেয়। এজন্যই মহান আল্লাহ বেপর্দা হতে কঠোর ভাষায় নিষেধ করেছেন-"হে বণী আদম! শয়তান যেন তোমাদিগকে কিছুতেই প্রলুব্দ না করে-যেভাবে তোমাদের পিতা-মাতাকে সে জান্নাত হইতে বহিস্কৃত করিয়াছিল। তাহাদিগের লজ্জাস্থান দেখাইবার জন্য বিবস্ত্র করিয়াছিল।"[৪৪]

৪২। আল কুর'আন-২৪ঃ৩১।

৪৩। আল কুর'আন-২৪ঃ৩০।

৪৪। আল কুর'আন-৭ঃ২৭।

Dhaka University Institutional Repository

এভাবেই ইসলাম পর্দা প্রথার মাধ্যমে নারী-পুরুষের সমতা দান করে নারী জাতিকে সকল প্রকারের পাপাচার, অশ্লীলতা, মূল্যহীনতা, ক্ষতি, বদনাম, ধ্বংস, অসম্মান, স্বামীর অনাদর ও জাহান্নাম থেকে মুক্তি করেছে এবং তাকে সম্মান, মর্যাদা ও নিরাপত্তার সর্বোচ্চ আসনে সমাসীন করেছে।

ইসলামের দৃষ্টিতে কারো কন্যা সন্তান জন্ম হওয়ার পর থেকে শুরু হয়ে যায় পিতার কাছ থেকে মেয়ের অধিকার আদায়ের পালা। প্রথমতঃ মেয়েকে যত্নের সাথে লালন-পালন করে যথার্থ শিক্ষায় শিক্ষিত করে সৎপাত্রে বিয়ে দেখা হল পিতার দায়িত্ব। তবে মনে রাখতে হবে যে, বিয়ের পূর্বে মেয়ে অবশ্যই ছেলেকে পছন্দ করতে হবে। মেয়ের যদি ছেলে পছন্দ না হয় তাহলে জোরপূর্বক কোন জায়গায় বিয়ে দিতে পারবে না।"[৪৫] আর বিয়ের প্রথম শর্ত হল মাহর আদায় করা।[৪৬] যদি কোন মেয়ে ছেলেকে পছন্দ করে ইসলামের এ বিধানকে পাশ কাটার উদ্দেশ্যে দেনমোহন ছাড়াই বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে চায় সেক্ষেত্রে ইসলাম বলে দিয়েছে যে, দশ দিরহামের কম মাহরে বিবাহ সিদ্ধ হবে না।[৪৭] এমনকি পূর্ণ দেনমোহর হাতে না পেয়ে মেয়ে স্বামীর ঘরে যেতে অস্বীকৃতি জানাতে পারে, তার জন্য মেয়েকে কোন প্রকার জোর জবরদস্তি কেউ করতে পারবে না। এ অধিকার নারীকে ইসলাম আজ থেকে দেড় হাজার বছর পূর্বেই দিয়েছে।

বাংলাদেশের বর্তমান সামাজিক প্রেক্ষাপটে মুসলিম বিবাহে উচ্চ হারে দেনমোহর নির্ধারণ একটি পারিবারিক মর্যাদা বৃদ্ধির বিষয় বলে অনেকে মনে করেন। যদিও এ ক্ষেত্রে তারা দেনমোহরের বাস্তব উপযোগীতাকে অবমূল্যায়নই করেন। ব্যবহারিক ক্ষেত্রে যেহেতু দেনমোহর পরিশোধ না করাটাই অনেকটা নিয়ম হয়ে দাঁড়িয়েছে তাই দেনমোহরের মত সামাজিক নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থাটি বর্তমানে নিছক একটি সামাজিক রীতিতে পরিণত হয়েছে। যেই মাহর ব্যবস্থা প্রবর্তন করে ইসলাম বৈবাহিক ক্ষেত্রে পুরুষের অদম্য ক্ষমতা ও প্রভাবকে নিয়ন্ত্রণ করে স্বামী-স্ত্রীর ক্ষমতার ভারসাম্য আনয়ন করেছে বাংলাদেশে বস্তুতঃ সেই দেনমোহর ব্যবস্থাটি বাংলাদেশী মুসলিম নারীর অসহায়ত্বের একটি প্রতিচ্ছবি বিশেষে পর্যবসিত হয়েছে।[৪৮]

৪৫। ইমাম বুখারী, প্রাগুক্ত, ১১শ খন্ড, পৃ-৯৬।

৪৬। আল কুর'আন-৪ঃ৪।

৪৭। ওবায়েদুল্লাহ ইবনে মাসউদ শরাহ বেকায়া, (অনু-মাওঃ রফিকুল ইসলাম) ইসলামিয়া কুতুবখানা, ঢাকা-১৯৯৯, পৃ-১৫৫।

৪৮। Ayesha Naman, op.cit, p-11

Dhaka University Institutional Repository

নিম্নবিত্ত শ্রেণীর মধ্যে দেনমোহর পরিশোধ সচেতনতা নেই বললেই চলে। বিয়ের পর স্বামী দেনমোহর পরিশোধের বিষয়টি সবাংশে ভুলে যান এবং দেনমোহরের অর্থ দাবী না করে বা মাফ করে দেয়াই কর্তব্য বলে স্ত্রী মনে করেন।[৪৯] বাংলাদেশী মধ্যবিত্ত মুসলিম নারী বিবাহিত জীবনে দেনমোহরের টাকা দাবী না করাটাকেই অধিক মর্যাদাপূর্ণ বিষয় বলে মনে করেন। তবে প্রায় সব মহিলারই ধারণা যে দেনমোহর স্বামী পরিশোধীয় কোন ঋণ বা প্রতিশ্রুতি নয়। সত্যিকার অর্থে, বাংলাদেশের প্রচলিত বৈবাহিক পরিমন্ডলের খুব সামান্য ক্ষেত্রেই দেনমোহর পরিশোধিত হয়। ইসলাম দেনমোহরকে এতটা গুরুত্ব দেয়া সত্ত্বেও বাংলাদেশের সমাজে এ ব্যবস্থাটির প্রতি নারীর মতই অবহেলা করা হয়। অথচ দেন মোহর মূলতঃ একটি বৈবাহিক চুক্তি। দেনমোহর পরিশোধ না হওয়া বৈবাহিক চুক্তি ভঙ্গের নামান্তর। তাই সুষ্ঠু দেনমোহর ব্যবস্থার অনুশীলন সুনিশ্চিত করে নিজেদের পবিত্রতা ও সংহতি রক্ষা করা আজ আমাদেরই দায়িত্ব ও কর্তব্য। এ জন্য দরকার ব্যাপক সমাজ ও গণচেতনা এবং সামাজিক আন্দোলন।

ইসলাম বৈবাহিক ক্ষেত্রে যে জিনিসটির উপর সবচেয়ে বেশী গুরুত্ব প্রদান করেছে তাহল স্বামী কর্তৃক স্ত্রীকে দেয় দেনমোহর। কেননা, আল-কুর'আনের ভাষায় দেখা যায়, বৈবাহিক বন্ধন সিদ্ধ হওয়ার প্রধান শর্তই হল মাহর বা দেনমোহর। অর্থাৎ মাহর আদায় করলেই কেবল স্ত্রীঅঙ্গ হালাল হয়।[৫০] এভাবে ইসলাম বিয়ের শুভলগ্নেই নারীকে অর্থ সমস্যার গ্যারান্টি স্বরূপ দিল সঞ্চয়ী তহবিলরূপ দেনমোহর। এতে তার পিতা-মাতা, ভাই, স্বামী বা অন্য কেউ হাত দিতে পারবে না। এ অর্থ সে নিজ দায়িত্বে ব্যবসা-বাণিজ্যে ব্যবহার করে অতিসত্বর যাকাত প্রদানকারিনী হতে পারবে। অথচ আজ আমাদের সমাজে দেখা যাচ্ছে উল্টো মেয়েদের পক্ষ থেকে স্বামী বা স্বামীর পরিবারকে অর্থ দিয়ে বৈবাহিক বন্ধনে আবদ্ধ হতে হয়। যাকে বলা হয় যৌতুক। অধুনা দেখা যায় মুসলিম সমাজ অন্যান্য জাতি ও সম্প্রদায়ের মত যৌতুককে বিয়ের প্রধান শর্ত করে নিচ্ছে।

৪৯। Gazi shamsur Rahman, Islamic Law, Islamic Foundetion Bangladesh, Dhaka-1981, p-196-197.

৫০। আল-কুর'আন, ৪ঃ২৪

Dhaka University Institutional Repository

বর পক্ষ কনে পক্ষের অবস্থা ও চারিত্রিক গুণাবলী না দেখে, বরং কনের পরিবারের ধন-সম্পদের পরিমাণটাকেই বেশী করে দেখছে এবং মোটা অংকের যৌতুক শুধু দাবীই করে না। তা যথার্থভাবে প্রদান না করলে বিয়েও সম্পাদিত করে না। প্রতিদিন আমাদের সমাজে এই যৌতুকের কারণে ঘটে চলেছে নানা প্রকার অনাকাঙ্খিত ও মারাত্মক ঘটনা। এমনকি আমাদের দেশে এমন অসংখ্য মা-বাবা রয়েছেন যাদের আর্থিক অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়। যার ফলে তাদের উপযুক্ত মেয়ের বিয়ে দেয়া সম্ভব হচ্ছে না। কেননা, বিয়ের সূচনাতেই হবু স্বামীর পক্ষ থেকে এমনি সব জিনিসপত্র ও টাকার অংকের দাবী তাদের সামনে আসতে থাকে যা মেটানো তাদের পক্ষে সম্ভব নয়ই, এমনকি তারা তা চিন্তাও করতে পারে না।

কোন আইন রচনা করে এর যতটুকু না রোধ করা সম্ভব তার চেয়ে বেশী রোধ করা সম্ভব এ সম্পর্কীয় ইসলামী নীতিমালার যথাযথ বাস্তবায়নের মাধ্যমে। যৌতুক রোধের জন্য বরপক্ষকে যেমন পরিহার করার মানসিকতায় তৈরী হতে হবে তেমনি কনে পক্ষকেও যৌতুক দেয়ার প্রতিযোগিতা থেকে মুক্ত থাকতে হবে। সকলের ঐকান্তিক উদ্যোগেই এটা সম্ভব।

যৌতুক আদান-প্রদান শুধু ইসলামী আইন ও মূল্যবোধের পরিপন্থীই নয়, এটা আমাদের দেশীয় আইনেও নিষিদ্ধ। ১৯৮০ সালে পাশ হওয়া যৌতুক বিরোধী আইনে যৌতুক দেয়া ও নেয়া দন্ডনীয় অপরাধ বলে ঘোষিত হয়েছে। তথাপি যৌতুকের কবল থেকে আমাদের মেয়েরা রেহাই পাচ্ছেনা। যৌতুক আদান-প্রদান ও যৌতুককে কেন্দ্র করে নারী নির্যাতন, বিবাহ বিচ্ছেদ ও গৃহবধু হত্যা যেন দেশে বেড়ে চলেছে গাণিতিক হারে। যে দেশের ৮০% মানুষ মুসলিম সে দেশে আর যে সমস্যাই থাকুকনা কেন যৌতুক সমস্যা থাকার কথা নয়, বরং ইসলামী আইনে বিবাহের সময় স্বামীকেই বাধ্যতামূলকভাবে যৌতুক (মাহর) দিতে হয় স্ত্রীকে। মুসলমানদের মধ্যে এ ব্যাপারে সচেতনতার অভাব বা অজ্ঞতাই কি যৌতুক সমস্যার জন্য দায়ী, না কি ধর্মের নামে অজ্ঞতা, কুপমন্ডুকতা ও ক্ষুদ্র স্বার্থ-চিন্তা এ সমস্যা সৃষ্টির মূলে কাজ করছে সে বিষয়ে সরকারী ও বেসরকারী পর্যায়ে ব্যাপক পর্যালোচনা ও তদানুযায়ী কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা অতীব জরুরী।[৫১]

৫১। সম্পাদকীয়, ৬ জুলাই, ২০০২ দৈনিক ইত্তেফাক, পৃ-৪ (উল্লেখ্য যে, Statistical Year Book,B.B.S.2000- এ বাংলাদেশে মুসলমানদের হার শতকরা ৮৮.৩% বলা হয়েছে-যা অভিসন্দর্ভের ভূমিকায় ও ২৭৭ নং পৃষ্ঠায় উল্লেখ করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

দেশে যৌতুক বিরোধী আইন আছে, দেশের রাষ্ট্রীয় ধর্ম ইসলামেও যৌতুক আদান-প্রদান ঘৃণা ও নিষিদ্ধ একটি কর্ম। এ দুই অস্ত্রকে মূলধন করে একটি যৌতুক বিরোধী সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলা প্রয়োজন। সম্ভাব্য সে আন্দোলনে তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে দেশের সম্মানিত ইমাম সমাজ। ইমামগণের নেতৃত্বে মসজিদ ভিত্তিক যৌতুক-বিরোধী একটি সামাজিক আন্দোলন গড়ে তুলতে পারলে, যৌতুক বিষয়ে বিদ্যমান আইনকে যুগোপযোগী করে কার্যকরভাবে প্রয়োগ করতে পারলে এবং ব্যক্তি ও সামাজিক জীবনে যৌতুক-বিরোধী মনোভাব সম্পন্ন লোকজনের সংখ্যা বৃদ্ধি করা গেলেই কেবল এক্ষেত্রে অভীষ্ট লক্ষে পৌঁছাতে পারবে। সুতরাং এ ব্যাপারে চাই ব্যাপক সামাজিক আন্দোলন নতুবা যৌতুকের কবল থেকে আমাদের কন্যা-জায়া-জননীরা কখনই নিরাপদ হতে পারবে না।

তালাক একটি নিকৃষ্ট কাজ সন্দেহ নেই। নীতিবাদীরা ইসলামের তালাক ব্যবস্থার যে সমালোচনা করে থাকেন তা মোটেই সঠিক নয়। কেননা, তারা সমাজে তালাক ব্যবস্থার অস্তিত্বই মেনে নিতে চান না। জীবন যেখানে আছে মৃত্যুও সেখানে থাকবে, মিলনের উল্টো পিঠেই থাকবে বিরহের সুর এবং বন্ধন যেখানে আছে সেখানে বিচ্ছেদ থাকবে। এটাই স্বাভাবিক। এমনিভাবে বিবাহ যেহেতু একটি বন্ধন সেহেতু এ বন্ধনের উল্টো দিক বিচ্ছেদ থাকবে, এটাও স্বাভাবিক। ইসলাম অতি স্বাভাবিক কারণেই এবং একান্ত অপরিহার্য কারণেই এটাকে বিধি সম্মত করেছে। স্বামী-স্ত্রীর মনোমালিন্যে দাম্পত্য জীবন তথা পারিবারিক জীবন দুর্বিসহ হয়ে উঠলে, পারিবারিক সুখ-শান্তি ফিরিয়ে আনার অন্য কোন উপায় না থাকলে ইসলাম অগত্যা শেষ অস্ত্ররূপে তালাকের ব্যবস্থা প্রবর্তন করেছে।

কুর'আনে তালাকের বিধান প্রণিধান পূর্বক পাঠ করলে দেখা যায় যেখানে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বারবার মিলন সংস্থাপন চেষ্টা করেও মিলন কিছুতেই সম্ভবপর বলে মনে হয় না সেখানেই তালাক বৈধ, অন্যথায় এটা পাপ কাজ। মোটের উপর ইসলামে তালাক ব্যবস্থা হচ্ছে চিকিৎসা শাস্ত্রে অঙ্গচ্ছেদের ন্যায় সাধারণ নিয়ম বহির্ভূত একটি ব্যবস্থা। আবার তালাক প্রদানের ক্ষেত্রে ইসলাম পুরুষকে একচেটিয়া অধিকার দিয়েছে বলে যারা অভিযোগ তুলেন এটা ইসলামের জীবন ব্যবস্থা সম্পর্কে তাদের অজ্ঞতাই প্রমাণিত হয়। কেননা ইসলাম পুরুষের ন্যায় নারীকেও তালাকের অধিকার প্রদান করেছে। নারী তালাকের প্রয়োজন বোধ করলে স্বামীকে বলে সে খুলা নামক তালাক দ্বারা বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটাতে পারে। এতে দেখা যায় তালাকের অধিকার স্বামী-স্ত্রীর উভয়ের রয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

এ অধিকার ক্ষুন্ন হয়েছে বলে কেউই মনে করতে পারবে না। সুদর্শন পুরুষের সন্ধান পেলেই স্ত্রীর স্বামী পরিবর্তনের অবাধ অধিকার যা আজ পাশ্চাত্য সমাজের নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার ইসলাম কখনও এমন অমানবিক কুপ্রথার অনুমতি দিতে পারে না। ইসলাম পক্ষপাতমূলক নীতির বহু উর্ধ্বে। ইসলাম সর্বক্ষেত্রেই সকলের প্রতি ভারসাম্যমূলক নীতি নির্ধারণ করে এসেছে। এক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হয়নি।

অন্ধকার যুগে নারীগণ ছিল মৃত ব্যক্তির উত্তরাধিকার হওয়ার সম্পূর্ণ অযোগ্য। এরূপ সমাজ গর্হিত ব্যবস্থা হিন্দু ও খ্রীষ্টান সমাজে আজও বিদ্যমান। নীতিবাদীরা অবশ্যই এটাকে নারীর প্রতি সুবিচার বলবেন না। ইসলাম নারীকে উত্তরাধিকারী হওয়ার যোগ্যতা দিয়ে তাদেরকে ন্যায্য অধিকার প্রদান করেছে। অর্থাৎ ইসলাম উত্তরাধিকার নীতিতে সকল সন্তান ও ঘনিষ্ট আত্মীয়-স্বজন, নর-নারী সকলকেই উত্তরাধিকারী হিসেবে ঘোষণা প্রদান করেছে। নারীকে মানব জাতির ধারাক্রম রক্ষায় সমানভাবে অপরিহার্য এক স্বামীন ও স্বতন্ত্র মানব সত্তারূপে স্বীকৃতি দান ছাড়াও ইসলাম তাকে উত্তরাধিকারের এক সুনির্দিষ্ট অংশ দিয়েছে। সুতরাং দেখা যায়, মহানবী (সঃ) এর প্রাক-নবুয়ত যুগে কোন সভ্যতা ও সংস্কৃতি নারী সমাজকে সমাজে প্রতিষ্ঠিত করেনি। ইসলামই সর্বপ্রথম নারীকে সসম্মানে পূর্ণ অধিকার ও মর্যাদাসহ প্রতিষ্ঠিত করেছে।[৫২] ইসলামেরই সেই পথ ও মত ব্যতীত নারী সমাজ কোন দিন সমাজ ও রাষ্ট্রে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না, এটা নিশ্চিত। মহানবী (সঃ) নারী সমাজকে পুরুষের সমান নয়, তাদের থেকেও অধিক মর্যাদা ও অধিকার দান করেছে। এমন অধিকার, সম্মান, মর্যাদা ও নিরাপত্তা নারী জাতিকে দুনিয়াতে অদ্যাবধি আর কেউ দেয়নি এবং দিতে পারে না। নারী জাতির জন্য এর চেয়ে উত্তম কোন ইহসান নেই।

ঐতিহ্যগতভাবে বাংলাদেশ মুসলিম প্রধান একটি দেশ। এর শতকরা ৮৮.৩ ভাগ জনগণই ইসলাম ধর্মের অনুসারী মসুলমান। তথাপি দেখা যায় এ বিষয়ে ইসলামের নীতিমালাগুলো পূর্ণাঙ্গভাবে অনুসরণ করা হচ্ছে না। যাও কিছু অনুসরণ করা হচ্ছে তা নিতান্তই ইসলামের একটি খন্ডিত কিংবা বিকৃত রূপ মাত্র।

৫২। Hammuda Abdalati, op.cit. p-187.

Dhaka University Institutional Repository

এক্ষেত্রে ইসলামের নীতিমালা অনুসরণ না করার অনিবার্য পরিণতি হিসেবেই অব্যাহত গতিতে আমাদের দেশে বেড়ে চলেছে নারী নির্যাতন, যৌতুক প্রথা, যৌতুকের জন্য দৈহিক ও মানসিকভাবে চাপ প্রয়োগ, অপহরণ, জোরপূর্বক পতিতা বৃত্তিতে নিয়োগ, ধর্ষণ, ইচ্ছার বিরুদ্ধে বিয়ে, এসিড নিক্ষেপ, বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ, বিদেশে পাচার, তালাক, ধর্ষণ করতে গিয়ে মৃত্যুর ঘটনা বা জখম করা ইত্যাদি অপরাধগুলো ব্যাপক আকার ধারণ করছে। বাংলাদেশরে আর্থ সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটে ইসলামী মূল্যবোধের অনুপস্থিতি কিংবা অবমূল্যায়নই আমাদের দেশে নারী নির্যাতনকে আরো তরান্বিত করছে। এতে দেখা যায় পুরুষ শাসিত সমাজ ব্যবস্থায় বাংলাদেশে নারীদেরকে পুরুষদের অপেক্ষা হীন মনে করা হয়। এখানে নারীর সঠিক মূল্যায়ন হয় না বলেই তাদের দূর্বলতার সুযোগ নিয়ে পুরুষরা নির্যাতন চালায়। নারী নির্যাতনে নিরক্ষরতা ও অজ্ঞতা অনেকাংশে দায়ী। ইসলাম ধর্ম ও বাংলাদেশের সংবিধানে নারী-পুরুষের সমান অধিকার থাকলেও নিরক্ষর জনগোষ্ঠী এ সত্য কথাটি জানে না। আবার নারীরাও তাদের অধিকার সম্পর্কে তেমন একটা সচেতন নয়। তাই তারা অহরহ নির্যাতনের শিকার হচ্ছে।

বর্তমান প্রেক্ষাপটে বহুবিবাহ ও বাল্যবিবাহ একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে দেখা দিয়েছে। নিম্ন আয়ের লোকেরা বহুবিবাহ করে স্ত্রীদের মর্যাদা তো দিচ্ছেই ন, বরং তাদের উপর বিভিন্নভাবে পাশবিক ও মানসিক নির্যাচন করা হচ্ছে। বাংলাদেশের গ্রামে-গঞ্জে এখনও বাল্যবিবাহ প্রথা প্রচলিত আছে। আবার যৌতুক প্রথা বাংলাদেশে বিদ্যমান থাকায় এ সমস্যা আরো প্রকট রূপে দেখা দিয়েছে দরিদ্র অভিভাবকগণ তাদের কন্যার বিয়েতে যৌতুকের দাবী পুরণ করতে ব্যর্থ হলে বরের পক্ষ থেকে স্ত্রীর উপর অমানসিক নির্যাতন নেমে আসে। এমনকি, স্বামীপুত্র সন্তানের লোভে স্ত্রীদের উপর নির্যাতন চালায়। অন্যদিকে পতিতাবৃত্তি প্রথা বহুলাংশে বৃদ্ধি পাওয়ায় আমাদের দেশে পতিতাবৃত্তির আইনগত বৈধতার সুযোগে নারীদেহ ব্যবসায়ীরা মেয়েদের অপহরণ করে পতিতাবৃত্তিতে নিয়োগ করে।

মানসিক নিপীড়ন নারী নির্যাতনের একটি বিশেষ দিক। মানসিকভাবে নির্যাতিত নারীরা অত্যাচারের সকল প্রকার ধকল সইতে না পেরে আত্মহত্যার পথ বেছে নেয়। বাংলাদেশে শহরে গ্রামাঞ্চলে অহরহ নারী আত্মহত্যার ঘটনা ঘটেছে। আর এ সব ঘটনার প্রকৃত কারণ হল, পারিবারিক অশান্তি, দাম্পত্য কলহ, যৌতুক প্রথা ইত্যাদি।

Dhaka University Institutional Repository

সুতরাং বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে নারী নির্যাতন মারাত্মক প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছে। এদেশে নারী নির্যাতন যে হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে তাতে সমাজে শুধু নারীদের নিরাপত্তাই বিঘ্নিত হচ্ছে না, বরং সামাজিক সংহতি এবং পারিবারিক সৌহার্দ্য মারাত্মকভাবে ব্যাহত হচ্ছে। নারী নির্যাতনের প্রভাবে পারিবারিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে বহুমুখী সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে।

বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটে ধর্মীয় মূল্যবোধের প্রতি উদাসীনতা বা এড়িয়ে চলার প্রবণতাই এহেন সামাজিক দূরাবস্থার বিশেষতঃ নারী নির্যাতনের অন্যতম কারণ। ধর্মীয় মূল্যবোধের অভাবে মানবিক চিন্তা-চেতনার অনুপস্থিতির কারণেই বর্তমানে বাংলাদেশে নারীদের উপর এসিড নিক্ষেপ, হত্যা, ধর্ষণ, অপহরণ, পাচার এবং নানাভাবে দৈহিক ও মানসিক নির্যাতন ও নিপীড়নের হার অতিমাত্রায় বেড়ে গেছে। ফলে নারীদের সামাজিক নিরাপত্তা মারাত্মক হুমকির সম্মুখীন হয়ে পড়েছে।[৫৩]

প্রতিবছর বিপুল সংখ্যক বিবাহ বিচ্ছেদ এবং গৃহত্যাগের মূলেও ক্রিয়াশীল ঐ সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি। পাশ্চাত্যে বিবাহ বিচ্ছেদের সিংহভাগই ঘটে পারস্পারিক নিষ্ঠা এবং বিশ্বস্ততার অভাবে। যেহেতু তাদের সামনে দৈহিক মিলনের উর্ধ্বে কোন লক্ষ্য থাকে না- সেহেতু কিছুদিনের মধ্যেই তাদের মধ্যে বৈচিত্রহীনতা একঘেঁয়েমির বোধ সৃষ্টি হয়। তারপর শুরু হয় বৈচিত্র বিলাস। এতে করে স্বামী-স্ত্রী উভয়ের নিকটই এটা স্পষ্ট হয়ে যায় যে, তাদের একের নিকট অন্যের দাবী এবং অধিকার নিরংকুশ নয়। এই বোধ বিস্তার মানসিক ব্যবধান রচনা করে যা কালে বিবাহ-বিচ্ছেদের মধ্য দিয়ে শেষ হয়। দৃষ্টিভঙ্গির সংকীর্ণতার কারণেই তারা অবলীলাক্রমে সন্তানদের পরিত্যক্ত অবস্থায় ফেলে হারিয়ে যায় নতুন সাথীর সংগে।

এক সমীক্ষায় দেখা গেছে, শতকরা ৪৫ ভাগ ধর্ষণের ক্ষেত্রে মহিলারা তাদের বর্তমান সংগীদের দ্বারা ধর্ষিতা হচ্ছেন। ৮ ভাগ ধর্ষিতা হচ্ছেন নবাগতদের দ্বারা। ৭ হাজার মহিলার সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে এ তথ্য পাওয়া গেছে।

৫৩। Statistical year Book of Bangladesh-2000, Banglade3sh Bureau of statistics, 21st ed. P-20-30.

Dhaka University Institutional Repository

বৃটিশ দৈনিক "দি ইনডিপেন্ডেন্ট" পত্রিকার ২৩ জুলাই-২০০২ এর এক রিপোর্টে বলা হয়, ইংল্যান্ড ও ওয়েলসের ১৬ বছর বয়স থেকেই ধর্ষণের শিকার হয়েছেন এমন মহিলার সংখ্যা ৭ লাখ ৫৪ হাজার। হোম অফিস মিনিষ্টার জন দিনহাম বলেছেন, এই নয়া সমীক্ষায় ধর্ষণ ও যৌন নিপীড়নের বিভিন্ন দিক উঠে এসেছে, যাতে দেখা যায় বেশীর ভাগ ধর্ষণ ঘটে প্রকাশ্য জায়গায় নবাগতদের দ্বারা। পত্রিকায় রিপোর্টে বলা হয়েছে, অপেক্ষাকৃত অস্বচ্ছল মহিলা এবং ১৬ থেকে ১৯ বছরের মধ্যকার তরুণীরাই ধর্ষণের ঝুঁকির মধ্যে থাকে বেশী। সরকারী পরিসংখ্যান মতে, ইংল্যান্ড ও ওয়েলসে বর্তমানে প্রতি ১৩টির মধ্যে একটি ধর্ষণের সাজা হয়।[৫৪]

আধুনিক পাশ্চাত্য জীবন দর্শন নারী সমাজকে শুনিয়েছে 'নারী স্বাধীনতা' ও 'সমানাধিকার' নামক শ্রুতিমধুর ও মনমাতানো শ্লোগান। আবেগ তাড়িত হয়ে নারীরাও তাদের স্বাভাবিক কর্মক্ষেত্র ছেড়ে পুরুষের কর্মক্ষেত্রে ছুটে এসেছে তাদের সহকর্মী হয়ে। নারীদের স্বার্থ, অধিকার ও নিরাপত্তার লক্ষে তারা কত নীতিমালা ও আইন তৈরী করেছে। তা সত্ত্বেও সহশিক্ষা ও সহকর্মস্থলে নারীদের ইজ্জতের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে পারেনি। করতে পারেনি নারীদের প্রতি সুবিচার। তাদেরকে হিজাবমুক্ত করে ও তাদের স্বাভাবিক কর্মক্ষেত্র থেকে টেনে এনে তাদেরকে লাঞ্ছনার শিকারে পরিণত করা হয়েছে।

এ প্রবণতা অন্যান্য দেশের ন্যায় বাংলাদেশেও প্রভাব বিস্তার করছে। ইংরেজ আমলে প্রবর্তিত পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সভ্যতা এদেশের মুসলিম সমাজে দারুন কুপ্রভাব ফেলে এবং তাদের পারিবারিক কাঠামোকে দুর্বল করে তুলে। এদেশে মুসলমানের ধর্মীয় আবেগ ও অনুভূতি যদিও খুবই তীব্র ও প্রবল, কিন্তু প্রকৃত দ্বীনী শিক্ষার অভাবে এ অনুভূতি বহুলাংশে আবেগবহুল এবং ইসলামের বহিরাঙ্গ নিয়ে তৃপ্ত হওয়ার মানসিকতা বিদ্যমান। ঐশী জীবন বিধানের বাস্তব প্রয়োগ করে জীবন ও সমাজকে কুর'আন ও সুন্নাহর আলোকে ঢেলে সাজানোর লক্ষ্য তাদের কাছে গৌণ। বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর এ চেতনার অভাবে তাদের ইসলামের প্রতি আবেগ তাড়িত অনুভূতিকে সুসংহতভাবে কাজে লাগানো যাচ্ছে না। অথচ পরিবার কল্যাণ ও নারী সমতাবিষয়ক ইসলামী নীতিমালা চর্চার জন্য সেটাই সবচেয়ে বেশী কাংখিত।

বাংলাদেশের ইসলাম প্রিয় জনগোষ্ঠীকে ইসলামী জীবন যাপনের জন্য স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে প্রয়োজনীয় তৎপরতা গ্রহণ ও ক্ষেত্র বিশেষে ত্যাগ স্বীকারের দীক্ষায় উজ্জীবিত করতে এবং সুসংহত করে সুগঠিত শক্তিতে রূপান্তর করতে যে উদ্যোগ ও তৎপরতা প্রয়োজন এই মুহূর্তে তার বড়ই অভাব। এই প্রয়োজন পূরণই বর্তমান সময়ে এদেশে পরিবার কল্যাণ ও নারী সমতাবিষয়ক ইসলামী নীতিমালা চর্চার সবচেয়ে বড় সমস্যা ও বিরাট চ্যালেঞ্জ। যথাযথ ধর্মীয় আবেগ, অনুভূতি ও আদর্শের যথার্থ বাস্তবায়নের মাধ্যমে এর যথোচিত মুকাবিলা করতে পারলে কাঙ্খিত লক্ষে পৌঁছানো সম্ভব। এই উদ্দেশ্যে দেশের নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলেরই তৎপর হওয়া বাঞ্ছনীয়।

৫৪। দৈনিক ইত্তেফাক, ২৪ জুলাই, ২০০২

৫৫। মাসিক মদিনা, মার্চ-১৯৯৮, পৃ-২৪।

Dhaka University Institutional Repository

ষষ্ঠ অধ্যায়

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে নারীমুক্তি আন্দোলনের গতিধারা

(১৯০০-২০০০)

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে নারীমুক্তি আন্দোলনের গতিধারা

(১৯০০-২০০০)

উপমহাদেশে নারীর অবস্থা ঃ

রাঢ়, পুন্ড্র, বঙ্গ, সমতট নিয়ে গড়ে উঠা বাংলাদেশের প্রাচীনকাল থেকে নানা জাতি ও সংস্কৃতির মিশ্রণ ঘটেছে, যার প্রচ্ছন্ন পরিচয়, বাঙালি ও বিভিন্ন জাতিসত্তার সমাজ বিন্যাসের মধ্যে খুজে পাওয়া যায়। উনিশ শতকে অবিভক্ত বাংলায় সামাজিক, ধর্মীয় এবং নিপীড়নমূলক রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে জাতি ধর্ম নির্বিশেষে একটি রেঁনেসা আন্দোলন, বাস্তব প্রয়োজন হিসেবে দেখা দিয়েছিল। নারীদেরকে আর্থ সামাজিক দিক দিয়ে শিক্ষাহীন, অসহায়, অক্ষম ও অধিকার বঞ্চিতভাবে এতই দুর্বল করে রাখা হয়েছিল যে, তৎকালীন নারী সমাজ এর ব্যতিক্রম কিছু চিন্তা করার অথবা এ অবস্থা পরিবর্তনের কথা ভাবতেও পারেনি। নিপীড়িত হয়েও মুক্তির স্বাদের সাহস তাদের ছিল না। মধ্যযুগে মুসলমানরা যখন বাংলার শাসন শুরু করেন তখন তারা সম্পূর্ণ আলাদা বৈশিষ্টসম্পন্ন ধর্ম, আচার-আচরণ ও জীবন ব্যবস্থা নিয়ে এলেন এবং বাংলার সংস্কৃতির সঙ্গে কোনভাবেই নিজেদের ঐতিহ্যকে বিলীন করে দিলেন না। ইসলাম নারীর জন্য যে সকল সামাজিক ধর্মীয় ও রাষ্ট্রীয় অধিকার দিয়েছে তা সেই সময়ের তুলনায় অনেক উদার এবং সমগ্র নারী সমাজের জন্য মঙ্গলজনক ছিল। ইসলামে নারী নির্যাতন রোধ করার কথা ঘোষণা করা হয়।

যেসব ক্ষেত্রে ইসলাম নারীকে অধিকার প্রদান করেছে, সেটুকু অধিকার কিন্তু তৎকালীন বাংলার মুসলিম শাসকরা বাংলার নারীদের ভোগ করতে দিলেন না। যদিও ইসলাম ধর্মে নারী ও পুরুষ উভয়ের জন্যই পর্দা রক্ষার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে তবু দেখা গেল ভারতের মুসলিম শাসকরা মূলত শুধু নারীর পর্দা বা আব্রুর উপরই দৃষ্টি দিলেন। বাংলার নারী সমাজ এমনিতেই অন্তঃপরবাসিনী ছিল সমাজের চলতি অনুশাসনেই।

Dhaka University Institutional Repository

তবু মুসলিম শাসকরা নতুন নতুন ঘোষণা নিয়ে নারী সমাজের পায়ে বেড়ি বাঁধতে থাকেন। ফিরোজ শাহ তুঘলক (১৩৫১ খ্রিঃ) ও সিকান্দার লোদী (১৪৮৯-১৫৭৭ খ্রিঃ) নারীদের ধর্মীয় পবিত্র স্থানে যাওয়া নিষিদ্ধ করলেন। বোরকা এবং নৌকা গাড়ি ছাড়া মেয়েদের চলাফেরা নিষিদ্ধ হলো। বাড়িতে জেনানা মহল তৈরি করা হল।[১]

হিন্দু ধর্মের সতীদাহ প্রথা ও হিন্দু ধর্মের নানারকম সামাজিক ও ধর্মীয় অনুশাসনের নির্যাতন থেকে বাঁচার জন্য মুসলিম শাসনামলে বাংলার বহু নারী ধর্মান্তরিত হয়েছিলেন। ধর্মান্তরিত হিন্দু নারীরা তাদের চিরাচরিত অভ্যাস বদলাতে পারেরি। সেজন্য বাঙালি মুসলিম মেয়েদের মধ্যে বাল্যবিবাহ চালু হল, হিন্দুদের যৌতুক প্রথা দ্বারা মুসলিম পরিবারগুলো নিষ্পেষিত হতে থাকলো, মেয়ের পছন্দ করার অধিকার বাতিল হল, বিধবারা হিন্দুদের মত বৈধব্য পালন করতে থাকল। কৌলিন্য প্রথার কারণে মুসলিম সমাজে অভিজাত শ্রেণীর সৃষ্টি হল। শিক্ষাসহ বিভিন্ন অধিকার অভিজাত নারীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকল। ইসলামের বিধান অনুসারে পাঠান ও মোঘল শাসনামলে বাংলার নারী সমাজের মূল্য কোনভাবেই বৃদ্ধি পায়নি।[২]

১৭৬৫ খ্রিঃ ইংরেজরা বাংলার দেওয়ানি পায়। এরপর চলে ইংরেজের শাসন। উনিশ শতকের পূর্ব পর্যন্ত বাংলার নারীদের সামাজিক মর্যাদা ও অধিকারের বিষয়ে দৃষ্টি দিলে দেখা যাবে, রাজনৈতিক বহু উত্থান-পতনের মধ্য দিয়ে বাংলার রাষ্ট্রীয় কাঠামো ও শাসন ব্যবস্থায় বহু পরিবর্তন ঘটলেও দীর্ঘদিন ধরে সমাজে ব্যবস্থার কোন পরিবর্তন না হওয়ায় নারীর মর্যাদা ও অধিকারের কোন তারতম্য ঘটেনি।

কৃষিভিত্তিক অর্থনীতির পাশাপাশি তাঁত শিল্প সুতা ও কাপড় তৈরির কাজসহ বিভিন্ন কুটির শিল্পভিত্তিক অর্থনীতি এ দেশে চালু ছিল। আঠারো শতকের মাঝামাঝি সময় থেকে উনিশ শতকের ইংরেজ শাসনের প্রারম্ভকাল পর্যন্ত। এই সময়কালকে সাধারণভাবে নবাবি আমল বলা যায়।[৩] ইংরেজ শাসনের প্রথম পর্যায় পর্যন্ত এ দেশে সামন্ততান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থা চালু ছিল এবং তা সমাজের সর্বস্তরে রক্ষণশীল ভাবধারা সৃষ্টি করেছিল। এর প্রভাব সামাজিক আচার ব্যবহার, রীতি-নীতি, সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে লক্ষ্য করা যায়।[৪]

১। ডুবু গালিচান, উইমেন আন্ডার পলিগেমি, পৃ-১৯৯ উদ্বৃতিঃ ড. জ্ঞানেশ মৈত্র, নারী জাগৃতি ও বাংলা সাহিত্য, কলকাতাঃ ন্যাশনাল পাবলিশার্স, ১৯৮৭, পৃ-১৮।

২। M.M. Siddiqui, women in Islam, Chapt.111 উদ্বৃতিঃ ; ড. জ্ঞানেশ মৈত্র, নারী জাগৃতি ও বাংলা সাহিত্য, কলকাতাঃ ন্যাশনাল পাবলিশার্স, ১৯৮৭, পৃ-১৭।

৩। গোপাল হালদার, বাংলা সাহিত্যের রূপরেখা (কলিকাতাঃ এ মুখার্জি অ্যান্ড কোং প্রাইভেট লিমিটেড, প্রথম প্রকাশ, ১৩৬৫খ্রিঃ), পৃ-৪।

৪। মালেকা বেগম, বাংলার নারী আন্দোলন (ঢাকা ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, দ্বিতীয় সংস্করণ, ২০০২ খ্রিঃ পৃ-৭-৮।

Dhaka University Institutional Repository

তৎকালীন সমাজ ব্যবস্থায় মেয়েরা ঘরের চার দেয়ালে অবরুদ্ধ ছিল। শিক্ষাহীন অনগ্রসর সমাজে নানারকম অবমাননাকর ধ্যান-ধারণা, সংকীর্ণতা, কুসংস্কার ইত্যাদি বদ্ধমূল হয়েছিল। নানা প্রথা, বিধি-নিষেধ জারি করে প্রকারান্তরে নারীকে শোষন ও নির্যাতন করা হয় এবং পুরুষের ওপর নির্ভরশীল করে রাখা হয় সামাজিক, পারিবারিক ও অর্থনৈতিকভাবে। ভারত বর্ষে হিন্দু যৌথ পরিবার প্রথায় বংশানুক্রমে সম্পত্তির মালিকানা পরিবারের পুরুষ সদস্যদের মধ্যে বিভক্ত হতে থাকে এবং মেয়েরা ভরণ-পোষণ পেয়ে থাকে। মেয়েদের বিয়ে হয়ে গেলে বাবার পরিবার থেকে মেয়েরা অর্থনৈতিকভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। মুসলিম শাসকরা এ দেশে পারিবারিক জীবন, ব্যক্তিগত অধিকার, দাম্পত্য সম্পর্ক সম্পর্কিত সম্পূর্ণ ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে এসেছিলেন। প্রচলিত হিন্দুবিবাহ পদ্ধতি, বিধবাদের প্রতি সামাজিক অনুশাসন, উত্তরাধিকার সংক্রান্ত আইন এসব থেকে মুসলিম আইন ছিল ভিন্ন এবং এ আইনে নারীর অধিকার সংরক্ষিত ছিল। একাধিক স্ত্রী গ্রহণ এবং বুড়ো বয়সেও বালিকা বধু গ্রহণ সামাজিক প্রথা ছিল। হিন্দু পরিবারগুলোতে এক ব্যক্তির মৃত্যুর ফলে একাধিক নারীকে বিধবা হতে হত। বিধবা হয়েও নিস্তার ছিল না। সতী হিসেবে তাদের স্বামীর চিতায় জীবন্ত আত্মাহুতি দিতে হত।

অধিকাংশ ক্ষেত্রে সমাজপতি ও পারিবারিক অভিভাবকরা অর্থনৈতিক স্বার্থ ও প্রলোভনে সতীদাহ প্রথা চালু রেখেছিল। ১৭৫৭ সালে পলাশীর যুদ্ধের পর থেকে ১৮২৯ পর্যন্ত প্রায় ৭০ হাজার সতীদাহ হয়েছে।[৫]

সে সময়ের সরকারি হিসেবে জানা যায়, ১৮১৫ সাল থেকে ১৮১৮ সালের মধ্যে কমপক্ষে ২ হাজার ৩৬৫ জন বিধবাকে স্বামীর চিতায় দাহ করা হয়েছে। শুধু কলকাতা ও আশপাশের এলাকাগুলোতে এই সতীদাহের সংখ্যা ছিল ১ হাজার ৫২৮ জন।[৬]

১৮১৫-২৩ সালের মধ্যে সতীদাহের ফলে ৫ হাজার ১২৮টি বালক-বালিকা পিতৃ মাতৃহীন হয়। বঙ্গদেশে যত সতীদাহ হয় তার সাত অংশের এক অংশই হয়েছে শুধু হুগলীতে। এই হুগলীতেই রামমোহন রায়ের আবির্ভাব। যিনি স্বয়ং ছিলেন সতীদাহের বিরুদ্ধে বলিষ্ঠ প্রতিবাদ।[৭]

৫। ড. জ্ঞানেশ মৈত্র, নারী জাগৃতি ও বাংলা সাহিত্য, পৃ-২২; উদ্বৃতিঃ এশিয়াটিক জার্নাল, ১৮২৭খ্রিঃ ভলিয়ুম-২৩, পৃ-৬৮৯।

৬। নির্মল সেনগুপ্ত, রাজর্ষি রামমোহন, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ কর্তৃক প্রকাশিত, ১৯৭২ খ্রিঃ, পৃ-৫৩।

৭। এশিয়াটিক জার্নাল, ১৮২৭ খ্রিঃ, ভলিয়ুম-২৩, পৃ-৬৮৯।

Dhaka University Institutional Repository

শত্রুর হাত থেকে বাঁচার জন্য রাজপুত মেয়েদের মধ্যে সতীদাহ প্রথা চালু ছিল। যুদ্ধে পরাজিত হয়ে বা কোন রাজপুত রাজার মৃত্যু হলে বিধবা স্ত্রীর সম্মান রাখার জন্য সতীদাহ প্রথা চালু ছিল। শত্রুপক্ষ যুদ্ধে জয়লাভ করে পরাজিত রাজার স্ত্রী ও মেয়েদের অধিকার পেয়ে যেত স্বাভাবিকভাবেই। শত্রুর হাত থেকে বাঁচার জন্য রাজপুত মেয়েরা জহরব্রত পালন করত অর্থাৎ নিজেরাই বিষ খেয়ে মারা যেত।[৮]

কুলিন মেয়েদের সমস্যা সমাজে প্রকট ছিল। কুলীন পুরুষ বহুসংখ্যক বিয়ে করতেন। কুলীন মেয়েরা শিশু বয়সে বা যে কোন বয়সেই হোক না কেন বিয়ের পর কুলীন স্বামীর ঘর করতে পারত না। স্বামীকে চোখে দেখাই সম্ভব হত না। ১৮৫৩ সালের অবিভক্ত বাংলার সরকারি রিপোর্টে জানা যায় যে, সে সময়ের কলকাতায় ১০ হাজার পতিতা মেয়ে ছিল কুলীন ব্রাহ্মণের স্ত্রী। সুন্দরী কুলীন মেয়েদের বিষ খাইয়ে মারার বহু ঘটনাও সে যুগে ঘটেছে।[৯]

বাংলার নবজাগরণের মনীষীদের সাহায্যে নারীর সামাজিক নিপীড়ন বন্ধের আন্দোলনের সূচনা ঘটলেও যত দিন পর্যন্ত নারী সমাজ তার নিজ অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য, অত্যাচারিত অবস্থা থেকে মুক্তির জন্য উদ্যোগী হয়নি, ততদিন পর্যন্ত তাদের জাগরণের পূর্ণ রূপায়ণ ঘটেনি। কিন্তু সমাজের সার্বিক প্রগতির জন্য যাঁরা চিন্তা-চেতনা, সাহিত্য, বিজ্ঞান, দর্শন ইতিহাস প্রভৃতির নতুন দিক নিয়ে চর্চা শুরু করেন তাঁরা রেনেঁসার মানবিক আবেদন থেকে নারী সমাজের সামাজিক নিপীড়ন বন্ধের জন্য এগিয়ে আসেন, প্রতিবাদ জানান এবং নারীর নিপীড়ন বন্ধের জন্য রাষ্ট্রীয় আইন তৈরির পক্ষে আন্দোলন করেন।[১০]

উনিশ শতকে অবিভক্ত বাংলায় নারী অধিকার বিষয়ক যে সকল কর্মসূচি বা পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছিল সেগুলো হচ্ছে (ক) সতীদাহ প্রথা উচ্ছেদ (খ) বিধবা বিবাহ আইন (গ) নারী শিক্ষার প্রসার (ঘ) সাহিত্য ক্ষেত্রে নারী সমাজের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি (ঙ) বিভিন্ন নারী কল্যাণ সমিতি গড়ে তোলা।[১১]

৮। মালেকা বেগম, প্রাগুক্ত, পৃ-৯।
৯। চিত্রাদেব, অন্তঃপুরের আত্মকথা, আনন্দ পাবলিশার্স, ১৯৮৪খ্রিঃ, পৃ-১০।
১০। মালেকা বেগম, প্রাগুক্ত, পৃ-১৩।
১১। মাহমুদ কবীর, বাংলাদেশের নারী (ঢাকা সূচিপত্র, প্রথম প্রকাশ, ফেব্রুয়ারী, ২০০৩, পৃ-১২।

Dhaka University Institutional Repository

এ উপমহাদেশের বুকে "পাকিস্তান" নামে মুসলমানদের একটি স্বাধীন সার্বভৌম আবাসভূমি প্রতিষ্ঠার আন্দোলন ছিল অত্যন্ত স্বাভাবিক এবং সকল যুক্তিতর্কের ভিত্তিতে অত্যন্ত ন্যায় সংগত। কারণ এ পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার উপরেই ছিল উপমহাদেশের মুসলমানদের অস্তিত্ব একান্তভাবে নির্ভরশীল। পাকিস্তান আন্দোলনের দাবী একদিকে যেমন ব্রিটিশ সরকার মেনে নিতে পারেন নি, অপরদিকে হিন্দু কংগ্রেসও শুধু মেনে নিতেই অস্বীকার করেনি, বরঞ্চ সর্বশক্তি প্রয়োগ করে বিরোধিতা করেছে। তথাপি উপমহাদেশের দশ কোটি মুসলমানের ক্রমাগত সাত বছর যাবত ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামের ফলে এবং লক্ষ লক্ষ মুসলিম নর-নারীর রক্তের বিনিময়ে পাকিস্তান নামে একটি স্বাধীন দেশ বিশ্বের মানচিত্রে স্থান লাভ করে। মানব সৃষ্টির সূচনা থেকেই মুসলমান ও অমুসলমান দুটি স্বতন্ত্র জাতিসত্তার উদ্ভব হয়েছে। এ যাবত বলবৎ আছে এবং চিরদিন থাকবে। উপমহাদেশে হিন্দু ও মুসলমান শত শত বছর ধরে একত্রে বাস করে আসছে একই শহরে, গ্রামে ও মহল্লায়, একই আঙ্গিনার এপারে-ওপারে। একই ভাষায় উভয়ে কথা বলে, একই মাটিতে জন্ম, একই আলো-বাতাসে লালিত-পালিত ও বর্ধিত। কিন্তু উভয়ে মিলেমিশে একাকার হয়ে যায়নি। একই আলো-বাতাসে লালিত-পালিত ও বর্ধিত। কিন্তু উভয়ে মিলেমিশে একাকার হয়ে যায়নি। একই জাতিতে পরিণত হয়নি। উপমহাদেশের অনেক পন্ডিত ব্যক্তিও এ সত্য স্বীকার করেন।[১২]

বাবু নীরদ চৌধুরী বলেন সত্য বলতে মিঃ জিন্নাহ বা মুসলিম লীগের বহু পূর্বেই দুই জাতিতত্ত্বের সৃষ্টি হয়েছিল। আর এ শুধু তত্ত্বকথা না এটা ঐতিহাসিক বাস্তব ঘটনা। সকলেই বর্তমান শতকের প্রথমে এটির অস্তিত্বের কথা জানত। এমনকি আমরা ছেলেবেলায় স্বদেশী আন্দোলনের পূর্ব থেকেই জানতাম।[১৩]

১২। আব্বাস আলী খান, বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস, পৃ-৪০৪ ও ৪২০।

১৩। The Autobiography of an unknown Indian, N.C. Choudhury, P-229-23.

Dhaka University Institutional Repository

পাকিস্তান আন্দোলনের দুটি মাত্র বুনিয়াদ ছিল। একটি এই যে, আমরা দুনিয়ার অন্য কোন জাতির অংশ নই বরঞ্চ একটি স্বাতন্ত্র জাতি। আর অন্য কোন জাতির সাথে মিলিত হয়ে কোন মিশ্র জাতীয়তাও বানাতে পারি না। দ্বিতীয়তঃ আমাদের জাতীয়তার ভিত্তি আমাদের দ্বীন। এছাড়া আমাদের জাতীয়তার অন্য কোন ভিত্তি নেই। সুতরাং একথা দিবালোকের মত স্পষ্ট যে, নিছক কোন রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কারণে অথবা সাময়িক ভাবাবেগে পরিচালিত হয়ে পাকিস্তান আন্দোলন করা হয়নি। আন্দোলনের ভাবাবেগ অবশ্যই ছিল। কিন্তু সে ভাবাবেগের উৎস ছিল মুসলমানদের ঈমান ও আকীদাহ বিশ্বাস। যার সূচনা হয়েছিল মানব জাতির সৃষ্টির সাথে সাথেই।[১৪]

বাংলার জাতীয় জাগরণ, শিক্ষা আন্দোলন ও স্বদেশী আন্দোলন তথা ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের মাধ্যমেই পাক ভারত উপমহাদেশে ক্রমান্বয়ে নারী জাতি, সমাজ ও শিক্ষাঙ্গনে তাঁদের অবস্থান করে নিতে চেষ্টা করেছিল। ব্রিটিশ ও হিন্দুদের মুসলিম বিদ্বেষী পরিবেশ, সীমিত সুযোগ, পরিবেশের বাঁধা সামাজিক পশ্চাৎপদতা সত্ত্বেও এই জাগরণের মধ্য দিয়ে বেশ কিছু নারী ব্যক্তিত্বের নাম জানা যায়। সে সকল নারীরা, নারীর অধিকার, মানুষ হিসেবে নারীর মর্যাদা, অবরোধ প্রথা দূর করা, স্ত্রী শিক্ষাবিস্তার, এসব নিয়ে আন্দোলন করেছেন। পাশাপাশি পুরুষরা সামগ্রিকভাবে দেশের মুক্তি সংগ্রামে অংশ নিয়ে, রাজনৈতিক কাজ করার মধ্য দিয়ে নারী মুক্তি ও প্রগতির আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে গেছেন। এই দুই ধারার মাধ্যমেই বাংলার নারী আন্দোলনের নতুন অধ্যায় শুরু হয়েছে।

১৯৪৭ সালের ১৪ ও ১৫ আগস্ট যথাক্রমে পাকিস্তান ও ভারত এই দুই রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা হল। পাকিস্তানের অন্তর্ভূক্ত হল তৎকালীন পূর্ববাংলা তথা বর্তমান বাংলাদেশ ও পাকিস্তান। দেশ ভাগের পরও কিন্তু সম্প্রদায়িক দাঙ্গা সৃষ্টি করা হল। সে দাঙ্গায় হাজার হাজার মানুষ মারা গিয়েছিল নিঃস্ব হয়েছিল লাখ লাখ মানুষ এবং অগণিত নারী লাঞ্ছিত হয়েছিল সম্ভ্রম হারিয়েছিল।[১৫] ভারত বিভাগের পরও ভারতে মুসলিম নিধনযজ্ঞে বন্ধ করা হয়নি। খুনের দরিয়া সাঁতার দিয়ে লক্ষ লক্ষ মুসলিম নরনারী, শিশু সীমান্ত অতিক্রম করে পাকিস্তানে এসে আশ্রয় নেয়। দিল্লীর বিভিন্ন স্থানে লোমহর্ষক হত্যাকান্ড বন্ধের উদ্দেশ্যে মি.গান্ধী অনশন ব্রত পালন করতে থাকেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত জীবন দিয়েও তা বন্ধ করতে পারেননি।[১৬]

১৪। আব্বাস আলী খান, প্রাগুক্ত, পৃ-৫৫৫।

Dhaka University Institutional Repository

১৯৪৭ সালের দেশ ভাগের পর কংগ্রেস নেত্রী জোবেদা খাতুন কংগ্রেস ছেড়ে মুসলিমলীগে যোগ দিলেন। মহিলা মুসলিমলীগ গঠন করে তার নেতৃত্ব গ্রহণ করলেন তখন তিনি। ফলে মুসলিম মহিলাদের ভেতর এ সময় প্রাণ চাঞ্চল্য জাগ্রত হয়। ঠিক এ সময় সিলেটে গণভোট অনুষ্ঠিত হল। জোবেদা খাতুনের নেতৃত্বে মহিলা মুসলিম লীগের কর্মীরা ঘুরে ঘুরে এ গণভোটকে সাফল্যমন্ডিত করার কাজে নিজেদের মেধা এবং শ্রম বিনিয়োগ করলেন একেবারে শর্তহীনভাবে।[১৭] ১৯৪৭ সালের দেশ ভাগের ফলে শামসুন নাহার মাহমুদ স্বামী পুত্রসহ তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানে চলে আসেন এবং রাজধানী ঢাকা শহরে বসবাস শুরু করেন। পাকিস্তান শাসনামলে সমাজকথ্যাণ মুলক কাজের পাশাপাশি মুসলিম লীগ সরকারের রাজনৈতিক কাজেও তিনি অংশ নেন। পূর্ব পাকিস্তান এমন কোন সংঘ, কমিটি বা প্রতিষ্ঠান ছিল না সরকারি বা বেসরকারি যাই হোক তার সঙ্গে তিনি ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত ছিলেন না।

১৯৪৮ সালে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খানের পত্নী বেগম লিয়াকত আলী খান প্রতিষ্ঠা করলেন এক নারী সমিতি। যার নাম ছিল "অল পাকিস্তান ওমেনস এসোসিয়েশন"। সংক্ষেপে "আপওয়া"। ঢাকাতে এই প্রতিষ্ঠানের পূর্ব পাকিস্তান শাখা গঠিত হয়। সমিতির প্রেসিডেন্ট হলেন তৎকালীন প্রধানমন্ত্রীর স্ত্রী বেগম নূরুল আমীন, বেগম শামসুন নাহার মাহমুদ হলেন ভাইস প্রেসিডেন্ট। পরবর্তীকালে বেগম শামসুন নাহার বহুবার পূর্ব পাকিস্তানের প্রতিনিধিত্ব করেছেন।[১৮] পাকিস্তানের প্রথম প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খানের স্ত্রীর নেতৃত্বে ১৯৪৮ সালের প্রতিষ্ঠিত মহিলা স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার আহবানে পশ্চিম পাকিস্তানের তরুণী ও মহিলারা প্রাথমিক চিকিৎসা, ত্রাণ পুনর্বাসনের ট্রেনিং গ্রহণ এবং রিফিউজি মহিলা শিশুদের সাহায্যে এগিয়ে আসেন। এছাড়াও এ সময় পশ্চিম পাকিস্তানে লীগ সরকারের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত মহিলাদের সংগঠনগুলো ছিল উইম্যান্স ন্যাশনাল (১৯৪৯), পাকিস্তান উইম্যান্স নেভাল রিজার্ভ (১৯৪৯) এই তিনটি মহিলা সমাজ কল্যাণমূলক সংগঠনের মূল নিয়ন্ত্রক ছিল সরকার এবং সরকারের পক্ষে দায়িত্ব পালন করতেন বেগম রানা লিয়াকত আলী খান।[১৯]

১৭। বাঙালী মুসলিম রাজনীতিবিদ, জোবেদা খাতুন চৌধুরীর অবদান উল্লেখ্যযোগ্য শত বছরে বাংলাদেশের নারী, নারী গ্রন্থ প্রবর্তনা, পৃ-৩১।

১৮। মালেকা বেগম, প্রাগুক্ত, পৃ-৭৮ ও ১২১।

১৯। Khawar Mumtaz and Farida Shaheed (Eds) Woman of Pakistan; Zed books <td. London, New Jew Jersey U.S.A. 1987. P-52.

Dhaka University Institutional Repository

পাকিস্তানের রাজধানী করাচিতে ১৯৪৯ সালের ২২ ফেব্রুয়ারি বেগম রানা লিয়াকত আলী খান মহিলা প্রতিনিধি এবং স্থায়ীয় সক্রিয় ১০০ জন মহিলার এক সম্মেলন আহবান করেন। এই সম্মেলনে আগত মহিলাদের নিয়েই প্রতিষ্ঠিত হয় "আপওয়া" সংগঠন।[২০] বাড়ির বাইরে মেয়েদের পেশাগত কাজের সুযোগ বৃদ্ধি করা, মেয়েদের শিক্ষাকেন্দ্রে বৃদ্ধির জন্য কুটির শিল্প কেন্দ্র চালু করা, অর্থকরী উৎপাদনমুখী শিক্ষার প্রশিক্ষণ দেওয়া ইত্যাদি কাজের পরকিল্পনা নেওয়া হয়। করাচি, লাহোর, পেশোয়ারের ছোট শহর গ্রামের মহিলাদের সেই সংগঠনের কাজে যুক্ত হতে থাকে। এই সংগঠনের মূল সংগঠকরা ছিলেন মূলত সরকারি উচ্চ পর্যায়ের অফিসারের স্ত্রী। সরকারি অনুমোদন সাপেক্ষে, সরকারি পরিকল্পনার সঙ্গে মিল রেখে এই সংগঠনের কাজ করতে হত।[২১] ১৯৪৮ সালের আগস্ট মাসে পূর্ব পাকিস্তান মহিলা সমিতি গঠিত হল।[২২] ১৯৫০ সালের ডিসেম্বরে নিখিল পাকিস্তান মহিলা সমিতির বার্ষিক সাধারণ সভা হয়েছিল গভর্ণর হাউসে।[২৩]

মহিলা সমিতি প্রতিষ্ঠার পর থেকেই বিভিন্ন জেলা ও শহরে জনগণের বিভিন্ন দাবি দাওয়াকে সামনে রেখে আন্দোলন, সংগ্রাম, মিটিং, মিছিল, করতে থাকে। এ সময় হামীদা বেগমের নেতৃত্বে মহিলাদের মধ্যে জামায়াতে ইসলামী কাজের সূচনা হয়। ব্যক্তিগতভাবে তিনি প্রতিবেশীদের মধ্যে সেবামূলক কাজ করতেন। অভাবগ্রস্ত মহিলাদের সাহায্য দান, বয়স্কদের মধ্যে শিক্ষার ব্যবস্থা, শীতবস্ত্র বিতরণ, সেলাই, হস্তশিল্প প্রশিক্ষণ দান এবং নারী শিক্ষা বিস্তারে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। এছাড়াও বিভিন্ন স্কুলের শিক্ষিকা এবং সরকারি অফিসারগণের স্ত্রীগণের মধ্যে জামায়াতে দাওয়াত দানের মাধ্যমে তাদের সংগঠিত করা, ঘরে ঘরে ইসলামী সাহিত্য বিতরণ করা, এসবই মহিলা জামায়াতের কর্মসূচির অন্তর্ভূক্ত ছিল। ১৯৪৬ সালের পর থেকে বহু বাঁধা বিপত্তি অতিক্রম করে হামিদা বেগম, নাইয়ার বানু সহ বেশ কিছু সংখ্যক মহিলা এ পথে দৃঢ়তা ও অবিচলতার প্রমাণ দেন।[২৪]

২০। মালেকা বেগম, প্রাগুক্ত, পৃ- ১২১।

২১। Khawar Mumtaz and Farida shaheed, op-cit, p-552.

২২। মালেকা বেগম, প্রাগুক্ত, পৃ- ১২৪।

২৩। সাপ্তাহিক বেগম, সওগাত প্রেস, পটুয়াটুলী, ডিসেম্বর, ১৯৫০।

২৪। আব্বাস আলী খান, জামাতে ইসলামীর ইতিহাস, প্রথম খন্ড, ঢাকাঃ জামাতে ইসলামী বাংলাদেশ প্রকাশনা বিভাগ, দ্বিতীয় প্রকাশ, জমাদিউল আওয়াল ১৪১৭, সেপ্টেম্বর-১৯৯৬, পৃ-১৪২।

Dhaka University Institutional Repository

দেশ বিভাগের আগে পূর্ববাংলার প্রায় সমস্ত স্কুল কলেজে হিন্দু ছাত্রীর সংখ্যাই ছিল বেশি। দেশ ভাগের পর দলে দলে হিন্দু ভারতে চলে যেতে থাকে। অন্যদিকে দলে দলে মুসলমান নরনারী পাকিস্তান এসে আশ্রয় নিতে থাকে। ফলে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে ছাত্রী শিক্ষক ঘাটতি দেখা দেয় মারাত্মক আকারে। এ অবস্থায় মুসলিম লীগ সরকার চাপের মুখে পড়ে। ছাত্র শিক্ষক শূন্যতার কবলে পড়ে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ হওয়ার উপক্রম হয়। জোবেদা খাতুন সিলেটের নারী শিক্ষার বিস্তারে এই প্রচন্ড বাঁধা দূর করার বাসনা নিয়ে শহর থেকে শহরতলী ঘুরেছেন। ছাত্র সংগ্রহসহ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান টিকিয়া রাখার জন্য এবং আর্থিক অনুদান সংগ্রহের কাজে। একই রকম ছাত্র শিক্ষক শূন্যতা সৃষ্টি হয় পূর্ব পাকিস্তানের অন্যান্য জেলাগুলোতেও।

সমাজ উন্নয়নের কাজ ও নারীর অধিকার নিয়ে বিভিন্ন মহিলা সংগঠনের কাজ শুরু হলেও শিল্প, সাহিত্য ও সংস্কৃতির চর্চার জন্য আগ্রহী মহিলাদের কোন সংগঠন ছিল না। ১৯৫০ সালে মোহাম্মদ নাসির উদ্দিনের পৃষ্ঠাপোষকতায় ঢাকায় প্রতিষ্ঠিত হয় "বেগম" পত্রিকা এবং ১৯৫৪ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় "বেগম ক্লাব"। বেগম ক্লাব এবং পত্রিকা পূর্ব পাকিস্তানের মহিলাদের সাহিত্য চর্চার কেন্দ্র হিসেবে গড়ে উঠল। বেগম শামসুন নাহার মাহমুদ ছিলেন এর প্রতিষ্ঠাতা সভানেত্রী।[২৫]

১৯৪৮ সালে দেশ জুড়ে ভাষা বিতর্ক জমে ওঠে। সিলেটের বড় বড় মুসলিম লীগ নেতারা বাংলা ভাষার বিপক্ষে অবস্থান নিয়েছিলেন। ১৯৪৮ সালের ১১ জানুয়ারী পাকিস্তান সরকারের যোগাযোগ মন্ত্রী আবদুর রব নিশতার এক সংক্ষিপ্ত সফরে সিলেটে আসেন। জোবেদা খাতুন এক মহিলা প্রতিনিধি দল নিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে বাংলা চালুর দাবি জানান।[২৬]

একই দাবি জানিয়ে একটি স্মারকলিপি পাঠালেন তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের মুখ্যমন্ত্রী খাজা নাজিম উদ্দিনের কাজে। ১৯৪৮ সালের ১০ মার্চ সিলেটের গোবিন্দ পার্কে মহিলা মুসলিম লীগের পক্ষ থেকে একটি জনসভার আয়োজন করা হয়। যদিও সে জনসভাটি সফল করতে পারেননি তারা। ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারী ছাত্র মিছিলে গুলিবর্ষণের খবর মহিলা সমাজের উপরও চরম প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। ২২ তারিখ ভোরে জোবেদা খাতুনের নেতৃত্বে প্রতিবাদ মিছিল বের করা হয় সিলেটে। একইভাবে ঢাকায় বিভিন্ন সংগঠনের মহিলারা সমবেত হয়ে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন ও একটি নিন্দা প্রস্তাব নেন। এ সময় নারায়নগঞ্জ মডার্ন গার্লস স্কুলের প্রধান শিক্ষয়ত্রী মমতাজ বেগমকে গ্রেপ্তার করা হয়।

২৫। মালেকা বেগম, প্রাগুক্ত, পৃ- ১২৬-১৩২।
২৬। শত বছরে বাংলাদেশের নারী, প্রাগুক্ত, পৃ-৩১।

Dhaka University Institutional Repository

নারী আন্দোলনের নেত্রী দৌলতননেসা খাতুন ১৯৫২ সালে বাংলা ভাষা আন্দোলনে সচেতন ভূমিকা রাখেন। তিনি ১৯৫৪ সালে রংপুর-দিনাজপুর-বগুড়ার সমন্বয়ে গঠিত এলাকার মিউনিসিপ্যাল এরিয়ার মহিলাদের প্রত্যক্ষ ভোটে আইন পরিষদের সদস্যা নির্বাচিত হয়েছিলেন।[২৭] ১৯৫৪ সালে যুক্তফ্রন্টের প্রার্থী হিসেবে আইন পরিষদে আরও যারা নির্বাচিত হয়েছিলেন তাঁরা হচ্ছেন নূরজাহান মুরশিদ, বদরুন্নেসা আহমদ, আমেনা বেগম, সেলিনা বানু, রাজিয়া বানু, তফতুন্নেসা, মেহেরুন্নেসা খাতুন ও তিনজন সংখ্যালঘু সদস্য ও নেলী সেন গুপ্তা প্রাদেশিক পরিষদের সদস্যা নির্বাচিত হন। এদের বিজয় সাফল্যে নারী সমাজের মধ্যে আলোড়ন ও আত্মবিশ্বাস জাগে।[২৮]

দৌলতননেসা খাতুন ৯২ (ক) ধারায় যুক্তফ্রন্ট সরকারে ক্ষমতাচ্যুত করলে প্রতিবাদ আন্দোলনে সক্রিয় হন এবং ১১ মাস কারা ভোগ এবং ৩ মাস অন্তরীণ থাকেন। ১৯৫৫ সালের নভেম্বর মাসে আইন পরিষদের নির্বাচিত সদস্য নূরজাহান মোরশেদ, বেগম রাজিয়া বানু ও দৌলতননেসা খাতুনকে প্রাদেশিক সরকারের পার্লামেন্টরী সেক্রেটারী নিযুক্ত করা হয়। দৌলতননেছা ফিল্ম সেন্সর বোর্ডেরও সদস্য ছিলেন। তিনি ১৯৫৭-৫৮ সালে জেলা রিফর্ম কমিশনের সদস্য ছিলেন এবং তিনি গাইবন্দার জেলা পরিদর্শকও ছিলেন।[২৯]

পাকিস্তান আইনসভার দু'জন মহিলা প্রতিনিধি ছিলেন- বেগম জাহানারা শাহনেওয়াজ। তিনি নিখিল ভারত মুসলিম লীগ কাউন্সিলের নির্বাচিত সদস্য ছিলেন ১৯৩৭ সালে এবং বেগম শায়েস্তা ইকরামুল্লাহ তিনি মুসলিম লীগ নেত্রী ছিলেন।[৩০] মেয়েদের আইনগত অধিকার আদায়ের সংগ্রামে এই দু'জন মহিলা প্রতিনিধি অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছেন। ১৯৪৮ সালে বাজেট অধিবেশনে মহিলাদের কাজের অধিকার ও সুযোগ বৃদ্ধি এবং অর্থনৈতিক সংকট মোচনের জন্য মহিলা প্রতিনিধিরা জোরালো প্রস্তাব রাখেন। এই দুই মহিলা নেত্রীর দাবির পরিপ্রেক্ষিতে প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খানের উদ্যোগে বিষয়টি সংসদে উত্থাপতি হয় এবং মুসলিম মহিলার ব্যক্তিগত আইনের শরীয়ত বিল (১৯৪৮) কার্যকরী হয় ১৯৫১ সালে।[৩১]

২৭। মালেকা বেগম, প্রাগুক্ত, পৃ- ১৩১ ও ১৬২।
২৮। গোলাম কিবরিয়া পিনু, দৌলতন নেসা খাতুন, পৃ-১৬।
২৯। শত বছরে বাংলাদেশের নারী, প্রাগুক্ত, পৃ-৮১।
৩০। Women of Pakistan, op-cit, p-55.
৩১। মালেকা বেগম, প্রাগুক্ত, পৃ- ১৩৫।

Dhaka University Institutional Repository

১৯৪৮ সালের ৮ নভেম্বর প্যারিসে অনুষ্ঠিত জাতিসংঘের সভয় পাকিস্তানের পক্ষ থেকে বেগম শায়েস্তা ইকরামুল্লাহ প্রতিনিধি হিসেবে যোগ দিয়েছিলেন। সংসদে নারীর সমঅধিকার সম মর্যাদা, সমকাজে সমবেতন ও শরীয়ত আইনে মুসলিম মেয়েদের অধিকার নিশ্চিত করার বিষয়গুলো অধিকাংশ সদস্যের সম্মতিতে সনদটি সংসদে গৃহীত হয়।[৩২] এই সনদটি গৃহীত হওয়ার পিছনে বেগম জাহানারা শাহনেওয়াজ এবং বেগম শায়েস্তা ইকরামুল্লাহর প্রচেষ্টা ছিল উল্লেখযোগ্য। ১৯৫২ সালের রক্তক্ষয়ী ভাষা আন্দোলনের পর সরকারী দমননীতির ফলে সব ধরণের আন্দোলনই কিছুদিনের জন্য বন্ধ হতে বাধ্য হয়।

মুসলিম লীগ সরকারের শোষণ নির্যাতনের বিরুদ্ধে সংগঠিত করার আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য মওলানা ভাসানী, শ্রমিক পার্টি, আওয়ামী লীগ, নেজামে ইসলাম পার্টি, খেলাফলে রাব্বানী পার্টি, গণতান্ত্রিক দল এবং পূর্ব পাকিস্তান কমিউনিস্ট পার্টি নিয়ে ১৯৫৩ সালের ৪ ডিসেম্বর গঠিত হয়েছিল দেশের প্রথম যুক্তফ্রন্ট।

এক কালের মুসলিম লীগ নেত্রী জোবেদা খাতুন চৌধুরী এই সময় দলত্যাগ করেন ও স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে নির্বাচন করেন কিন্তু তিনি জয়ী হননি। নূরজাহান মোরশেদের প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে মুসলিম লীগ থেকে দাঁড়িয়েছিলেন শামসুন্নাহার আহমেদ। তিনিও পরাজিত হন। ১৯৫৫ সালের নভেম্বর মাসে আইন পরিষদের নির্বাচিত সদস্যা নূরজাহান মোরশেদ, বেগম রাজিয়া বানু ও বেগম দৌলতুন্নেসাকে প্রাদেশিক সরকারের পার্লামেন্টোরি সেক্রেটারি নিযুক্ত করা হয়।

১৯৫৬ সালে চূড়ান্তভাবে যে সংবিধান রচিত হলো তাকে মহিলাদের সংরক্ষিত আসনের জন্য বিশেষ নির্বাচনী এলাকা নির্দিষ্ট করা ও মহিলাদের ভোটে মহিলাদের নির্বাচনের আইন ঘোষিত হল। এই আইনের ফলে মহিলারা সাধারণ আসন ও মহিলাদের সংরক্ষিত আসনে মাত্র দুই ভোট দেওয়ার অধিকার পেয়েছিল। মানবাধিকার সংক্রান্ত জাতিসংঘের তৃতীয় অধিবেশনে সংসদ সদস্যদের মধ্যে নূরজাহান মোর্শেদ যোগ দিয়েছিলেন ১৯৫৭ সালে। এই সময় সরকারী উদ্যোগে সোশ্যাল ওয়ার্ক কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হয়।[৩৩]

৩২। Women of Pakistan, op-cit, p-56.

৩৩। মালেকা বেগম, প্রাগুক্ত, পৃ- ১৪০-১৪২।

Dhaka University Institutional Repository

মূলত সমাজ উন্নয়নের লক্ষ্যে আন্তর্জাতিক সংগঠনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হওয়ার জন্য এই কমিটি গঠিত হয়। মিউনিকের সম্মেলনে এই কমিটির পক্ষে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের সদস্যরা যোগ দেন। মুসলিম লীগ সরকার কর্তৃক জমিদারী প্রথা বাতিল করা হয়। এ সময় জমিদারী প্রথা বিলুপ্ত হওয়ায় জমিদার গৃহিনী, কন্যা ও পরিবারের মহিলারা রিকসা শোভাযাত্রা করে পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নরের সঙ্গে দেখা করে জমিদারী ব্যবস্থা বজায় রাখা অথবা যথেষ্ট পরিমাণে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার দাবি জানান।[৩৪]

আবু হোসেন সরকার বেশিদিন ক্ষমতায় ছিল না। পূর্ব পাকিস্তানের নানা সংকটের মোকাবিলা করতে না পারায় মূলত কমিউনিস্ট পার্টি আওয়ামীলীগ এদের বিক্ষোভের মুখে আবু হোসেন সরকারের পতন ঘটে। এবং কেন্দ ও পূর্ব পাকিস্তানে আওয়ামী লীগের কোয়ালিশন মন্ত্রীসভা গঠিত হয়। কিন্তু অচিরেই ১৯৫৮ সালে সামরিক শাসন জারি করে গণতান্ত্রিক পরিবেশ ও শাসনব্যবস্থার অবসান ঘটানো হয়। ১৯৫৯ সালে থেকে সামাজিক ও ধর্মীয় সভানুষ্ঠান ইত্যাদির প্রতি নিষেধাজ্ঞা শিথিল হতে থাকলে কিছু কিছু সমাবেশ মিলাদ-মাহফিল ইত্যাদির সুযোগে বিভিন্ন সমিতির সদস্যরা একত্রিত হতে থাকেন।[৩৫] পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর ইসলাম সম্পর্কে সঠিক ধারণার অভাব এবং সাথে সাথে কিছু কিছু ইসলাম বিদ্বেষী কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে পারিবারিক আইন ১৯৬১ দাবির পরিপ্রেক্ষিতে পারিবারিক আইন ১৯৬১ প্রণীত হলে, পূর্ব পাকিস্তানে মাওলানা আব্বাস আলী খান, জামায়াতে ইসলামীর নেতৃবৃন্দ, পশ্চিম পাকিস্তানে মাওলানা সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী সাহেবসহ ওলামা ও ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ প্রতিবাদ জানিয়ে বলেন যে, মুসলিম পারিবারিক আইন ১৯৬১ পবিত্র কুর'আনের কিছু বিধানের পরিপন্থি। ১৯৬১-এর পারিবারিক আইনের কয়েকটি ধারা, যেমন-চার বিষয়ে নিয়ন্ত্রণ, তালাকের পদ্ধতি নিয়ন্ত্রণ উত্তরাধিকার আইন পরিবর্তন।

ষাটের দশকে পশ্চিম পাকিস্তানে জামায়াতে ইসলামী মহিলা বিভাগের কাজ আরও বৃদ্ধি পায়। আলেম উলামা ও ধর্মীয় সম্প্রদায়ের বিভিন্ন সংগঠনের পক্ষ থেকে পারিবারিক আইন সংশোধনীর দাবি সোচ্চার থাকলেও নারী সমিতির আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৬৩ সালের নভেম্বর মাসে জাতীয় পরিষদে কোন সংশোধন ছাড়াই আইনটি গৃহীত হয়।[৩৬]

৩৪। সাপ্তাহিক বেগম, ১৯৫৬-৫৭।
৩৫। খোকা রায়, প্রাগুক্ত, পৃ-১৬০।
৩৬। মালেকা বেগম, প্রাগুক্ত, পৃ-১৪৯।

Dhaka University Institutional Repository

আইন প্রণয়ন সত্ত্বেও নারীর অবস্থান ও মর্যাদা আগের তুলনায় কোন অংশেই বৃদ্ধি পায়নি বরং দিন দিন মূল্যবোধের অবক্ষয় ইসলাম বিরোধি পরিবেশ সৃষ্টির কারণে নারী সমাজকে চরম মূল্য দিতে হচ্ছে।

সংবিধানে প্রাপ্ত নারীর ভোটে সদস্য নির্বাচনের অধিকার অনুযায়ী ১৯৬২ এর সংবিধানে ২০ ধারায় জাতীয় পরিষদে ৬টি ও প্রত্যেক প্রদেশের ৬টি আসন মেয়েদের জন্য সংরক্ষিত হল এবং রাষ্ট্রপতি দ্বারা সংরক্ষিত ৬টি মহিলা আসনে প্রার্থী মনোনয়ন হওয়ার পদ্ধতি চালু হল। কয়েকজন মহিলা মন্ত্রীকেও এ সময় নিয়োগ করা হল।[৩৭]

১৯৬৪ সালের জানুয়ারীতে শামসুন্নাহার মাহমুদ নির্বাচকমন্ডলীর বিলের সংশোধনী প্রস্তাব উত্থাপন করেন। আইন পরিষদসহ নির্বাচকমন্ডলীতে ২৫ শতাংশ আইন মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত করার দাবি জানান পূর্ব পাকিস্তানের সদস্যা বেগম রোকাইয়া আনোয়ার। কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তানের সদস্যা বেগম জি.এ. খান ও বেগম মমিনুন্নেসা আহাদের বিরোধিতার ফলে প্রস্তাবটি বাতিল হয়ে যায়। জাতীয় পরিষদে প্রত্যেক প্রদেশ থেকে ৩টি করে ৬টি ও প্রাদেশিক পরিষদে ৫টি করে ১০টি আসন মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত ছিল। এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত হয় যে, মহিলা সদস্যরা তাদের সংশ্লিষ্ট প্রদেশ থেকে আইন পরিষদের মাধ্যমে সদস্যা নির্বাচিত হবেন। সরকারী কর্মচারীর স্ত্রী নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারবেন না এই বিধিবলে পূর্ব পাকিস্তান পরিষদের নির্বাচিত সদস্যা বেগম শামসুন্নাহার মাহমুদ অযোগ্য ঘোষিত হলে সেই আসন শূন্য হয় এবং উক্ত আসনে উপ নির্বাচন হয়।

এ সময় সামরিক সরকার প্রধান আইয়ুব খানের পূর্ব পাকিস্তান সফর কালে ময়মনসিংহের মহিলাদের প্রতিনিধি স্থানীয় চারজন মহিলা তাঁর সঙ্গে দেখা করে নারী সমাজের কিছু দাবি পেশ করেন। তখন পূর্ব পাকিস্তানের সম্মিলিত নারী সমাজের দাবির প্রেক্ষিতে ১৯৬৪ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী নিবাসটির নাম হয় "রোকেয়া হল"।

৩৭। Women of Pakistan, op-cit, p-60.

Dhaka University Institutional Repository

১৯৬২ সাল থেকেই পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের সর্বত্র আইয়ুব বিরোধী আন্দোলন জোরদার হয়ে ওঠে। আইয়ুব সরকারের বিরুদ্ধে সমস্ত সরকার বিরোধী ও গণতন্ত্রকামী দলের ঐক্যবদ্ধ মোর্চা গঠনের জন্য প্রগতিশীল দল সিদ্ধান্ত নিলেও তা কার্যকরী হয়নি। অবশেষে খাজা নাজিমুদ্দিনের উদ্যোগে পাঁচটি বিরোধী দল নির্বাচনের লক্ষ্যে ৯ দফা কর্মসূচী নিয়ে "কপ" গঠন করে। প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী আইয়ুব খানের বিরুদ্ধে সম্মিলিত বিরোধীদল বা "কপ" মিস ফাতেমা জিন্নাহকে প্রার্থী মনোনীত করে ১৯৬৪ সালের ১৭ সেপ্টেম্বর।

নির্বাচনকালে দেশের মধ্যে গণতান্ত্রিক আন্দোলনের পরিবেশ সৃষ্টি হয়। সমাজ কল্যাণমূলক কাজের বাইরে পঞ্চাশ ও ষাটের দশম জুড়ে এ দেশের নারী সমাজ বিভিন্নমুখী কাজ এবং ফাতেমা জিন্নাহর নির্বাচনী প্রচারে ব্যাপকভাবে যুক্ত হয়ে পুরো দুই দশক জুড়ে এ অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন যে, নারী সমাজের সার্বিক মুক্তি ও অধিকার অর্জনের বিষয়টি গণতান্ত্রিক আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত। বিশেষ করে এ সময় কমিউনিস্ট নেতৃবৃন্দ ময়দানে সক্রিয় ছিল।[৩৮]

১৯৬৪ সালের নির্বাচনে ফাতেমা জিন্নাহ পরাজিত হন। তবে ১৯৬৫সালে পাকিস্তান ও ভারতের সীমান্ত যুদ্ধের সময় সরকারী উদ্যোগে প্রতিরক্ষামূলক প্রশিক্ষণ দেওয়া শুরু হয়। রাইফেল চালানোসহ নানা রকম প্রাথমিক স্তরের সামরিক শিক্ষা, প্রাথমিক চিকিৎসা, নার্সিং ইত্যাদি প্রশিক্ষক মহিলা সংগঠন "আপওয়ার" উদ্যোগে সাধারণ মহিলাদের দেয়া হল।

১৯৬৬ সালে ফেব্রুয়ারী মাসে আওয়ামী লীগ ছয় দফা কর্মসূচী দিয়ে আন্দোলন শুরু করে। সামরিক আইন ভঙ্গ করে দেশে আন্দোলন সংগ্রাম সৃ'টি করে ক্রমান্বয়ে দেশে অস্থিতিশীল অবস্থার সৃষ্টি করা হল। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, পাকিস্তানের সামরিক শাসনকর্তা আইয়ুব খান ১৯৫৬ সালে জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের প্রণীত শাসনতন্ত্র বাতিল করে সাড়ে তিন বছর স্বৈরশাসন চালু রাখেন। বেসামরিক শাসন উত্তরণের উদ্দেশ্যে তিনি ১৯৬২ সালের ১ মার্চ নতুন এক শাসনতন্ত্র জারি করেন। পাকিস্তানের রাজনৈতিক দলসমূহের মধ্যে একমাত্র জামায়াতে ইসলামীই সামরিক শাসন প্রত্যাহারের ২৪ ঘন্টার মধ্যে পুনবর্হাল হয়। অন্যদিকে মুসলিম লীগ তো আইয়ুব খানই দখল করে নেন। এ দলের যারা ঐ সংগঠনের যোগদান করেননি তাদের নতুন করে সংগঠিত হতে স্বাভাবিকভাবেই বিলম্ব হয়।

৩৮। অধ্যাপক গোলাম আযম, জীবনে যা দেখলাম, দ্বিতীয় খন্ড, ঢাকাঃ কাসিয়ার প্রকাশনা, প্রথম প্রকাশ, ২০০২ ডিসেম্বর, পৃ-২৬২-২৬৩।

Dhaka University Institutional Repository

অন্যান্য দলের মধ্য থেকেও আইয়ুব খান কিছু নেতাকে ভাগিয়ে নিতে সক্ষম হন। শহীদ সোহরাওয়ার্দী নিজের দল আওয়ামী লীগকে পুনবর্হাল না করে অন্যান্য দলের সাথে মিলে আন্দোলনে করার পক্ষে ছিলেন। তাই তিনি পশ্চিম পাকিস্তান সফরে গিয়ে মাওলানা মওদূদীর সাথেই প্রথম সাক্ষাৎ করেন। তিনি আইয়ুব বিরোধী আন্দোলনের অগ্রণী ভূমিকা পালনের জন্য মাওলানা মওদূদীর উপরই সবচেয়ে বেশি আস্থা পোষণ করতেন। আই মত বিনিময়ের পর দু'জন একমত হয়ে গণতান্ত্রিক আন্দোলনের পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। কিন্তু জনাব সোহরাওয়ার্দী ১৯৬২ সালের ৫ ডিসেম্বর বৈরুতের কন্টিনেন্টাল হোটেলে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে ইনতিকাল কারেন।[৩৯]

তার মতো গতিশীল এক নেতার অভাবে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের নেতৃবৃন্দের সম্মিলিত গণতান্ত্রিক আন্দোলন সাংগঠনিক রূপ পেল না। পরবর্তীতে আওয়ামী লীগ ছয় দফা কর্মসূচী দিয়ে আন্দোলন শুরু করে। সংগ্রাম আন্দোলনে গণজাগরণ সৃষ্টি হয় উনসত্তরে। ৬৯ এর ১৯ জানুয়ারী ছাত্রীদের ওপর লাঠিচার্জ করা হয় এবং ২০ জানুয়ারী ছাত্রী মিছিলে গুলি করা হয়। শহীদ হলো আসাদ। এই হত্যার বিরুদ্ধে হরতাল সভা মিছিল করা হয়। অসংখ্য বোরকা পরা মহিলা এতে যোগ দেন। দেশে ছাত্র আন্দোলন তীব্র হয়ে উঠন। এ সময় মহিলা সমাজ রাজবন্দিদের মুক্তির দাবিতে বিবৃতি দেওয়া, পথসভা, সমাবেশ ইত্যাদি কাজ করেছেন। ছাত্র আন্দোলনের প্রয়োজনে নারী সমাজের সমর্থন সৃষ্টির জন্য ছাত্রীদের মধ্য থেকে বিভিন্ন মহিলা নেত্রীর উদ্যোগে পূর্ব পাকিস্তানে মহিলা সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হয়েছিল।

১৯৭০ সালে ৪ এপ্রিল বেগম সুফিয় কামালের নেতৃত্বে মালেকা বেগমকে সাধারণ সম্পাদিকা করে প্রতিষ্ঠিত হলো "পর্ব পাকিস্তান মহিলা পরিষদ"। বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ ছিল একমাত্র সংগঠন যে সংগঠন সারা দেশের মহিলাদের সংগঠিত করে এবং সংগ্রামের প্রস্তুতি নেওয়ার জন্য আহবান জানায়। তাই মহিলারা শহরে শহরে সমাবেশ করে লাঠি হাতে কুচকাওয়াজ করেন, স্বামী সন্তানকে মুক্তিযুদ্ধে যোগদানের জন্য প্রেরণা দেন।

Dhaka University Institutional Repository

১৯৭১ এর ২৫ মার্চ পূর্ব বাংলার ওপর পাক বাহিনীর সশস্ত্র আক্রমন শুরু হল মুক্তিযুদ্ধের নয় মাস হানাদার পাক সেনাদের দ্বারা প্রায় ১৪ লাখ নারী বিভিন্নভাবে নির্যাতিত, নিগৃহীত এবং স্বামী, পুত্র, কন্যা, বা অভিভাবক হারিয়ে নিঃস্ব হয়েছেন। এর ভেতর ধর্ষিতা হয়েছেন হাজার হাজার। বাংলাদেশের আপামর জনসাধারণ সামরিক ও গেরিলা যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেছেন। ৭ কোটি বাঙালি নর নারী জনতার জীবন মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে অতিবাহিত হয়েছে মার্চ থেকে ১৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত। এ ক্ষেত্রে সাফল্য আসতে পারত না সাধারণ মানুষের অংশ গ্রহণ ছাড়া। মুক্তিযুদ্ধে সাধারণ মানুষ যেমন হয়েছেন ট্রেনিং ছাড়াই সাহায্য করেছেন। আপামর জনসাধারণ ছিলেন বেসামরিক মুক্তিযোদ্ধা। মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক বেশিরভাগ বইপত্রে সাধারণ মানুষের অনুপস্থিতি পীড়াদায়ক। স্বাধীনতার মাত্র দু'দিন আছে ১৪ ডিসেম্বর ১৯৭১-এ দেশের সেরা বুদ্ধিজীবী অধ্যাপক, ডাক্তার, সাংবাদিক, সাহিত্যিক, শিল্পীদের হত্যা করা হয়েছে। যা সমগ্র জাতিকে হতবাক করে দেয়। রক্তস্নাত নয় মাস ব্যাপী স্বাধীনতা আন্দোলনের মাধ্যমে ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশ স্বাধীন হল। পৃথিবীর মানচিত্রে নতুন একটি দেশ বাংলাদেশর সৃষ্টি হল। মুক্তিযুদ্ধে নির্যাতিত সম্ভ্রমহারা অগণিত মা, বোন, অগণিত ভাইয়ের জীবন দানকে চিরদিন স্মরণ রাখবে শ্রদ্ধাভরে।[৪১]

নারী শিক্ষার প্রসারে বাংলার শিক্ষিত সমাজের উদ্যোগ ঃ

এটা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ যে হিন্দু ধর্ম সংস্কার আন্দোলনের ফলে যে ব্রাহ্ম সমাজ প্রতিষ্ঠা হয়েছিল সেই ব্রাহ্ম আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা রাজা রামমোহন রায় ও তার পরবর্তী অনুসারী কেশবচন্দ্র সেন, অক্ষয়কুমার দত্ত (১৮২০-১৮৮৬) প্রমুখ ব্যক্তিগণই হিন্দু নারীদের শিক্ষা ও সামাজিক মর্যাদান উন্নত করার জন্য নিরলস প্রচেষ্টা করেছেন। অবশ্য পাশ্চাত্য ধ্যা-ধারণা দ্বারা প্রভাবিত হয়ে মানবতাবাদী ব্রাহ্মণ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরও নিজেকে উৎসর্গ করেছিলেন হিন্দু নারী সমাজ উন্নয়নের জন্য। ঠিক একই সময়ে বাংলার মুসলিম সমাজে প্রথমে ছিল গোড়া ফারায়েজী আন্দোলনের প্রভাব এবং পরবর্তীতে ১৮৫৭ খ্রিঃ পর বাংলায় নওয়াব আব্দুল লতিফ, সৈয়দ আমীর আলী ও উত্তর প্রদেশের সৈয়দ আহমেদ খাঁ প্রমুখ মুসলিম নেতৃবৃন্দ ইংরেজ সরকারের সঙ্গে সমঝোতামূলক মনোভাবের সথে ইসলামী চেতনার সমন্বয় করার প্রয়াস করেছেন।[৪২]

৪১। সুফিয়া কামাল, একাত্তরের ডায়েরী, ঢাকাঃ জ্ঞান প্রকাশনী, ১৯৮৯।

৪২। আব্বাস আলী খান, প্রাগুক্ত, পৃ-২৫৭।

Dhaka University Institutional Repository

১৮৫৭ সালের আযাদী আন্দোলনের পর ধীরে ধীরে মুসলিম সমাজ ইংরেজদের মুসলিম বিধন ও অত্যাচার নির্যাতনের কাল অতিক্রম করে নিজেদের বেঁচে থাকার সংগ্রামে আত্মনিয়োগ করেন। সৈয়দ আহমদ ভারতীয় মুসলিম সমাজে পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রসারের জন্য এবং শাসক ইংরেজদের সঙ্গে মুসলমানদের বৈরী মনোভাব দূর করার জন্য সারাজীবন নিরলসভাবে প্রচেষ্টা চালিয়েছেন। নারীর মর্যাদা উন্নতিকরণ ও নারী শিক্ষার গুরুত্ব অনুধাবন করে সৈয়দ আমীর আলী তুর্কী রমনীদের উদাহরণ উল্লেখ করে বলেন-There is no reason why the Mussalmans of India should not follow the example of their brother Moslems of Constantinople. Where the women are able to move about freely and to take part in the social economy.

নারী জাতির উন্নতি ব্যতীত সমাজের উন্নতি অসম্ভব, তাই আমীর আলী বলেন-If the Mussalmans of India desire to raise themselves, they should restore women to the pedestal they occupied in the early centuries of Islam.[৪৩]

সৈয়দ আমীর আলীর নারী শিক্ষা এবং নারী জাগরণের সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালান। এই সময়ে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য এবং সেন্ট্রাল ন্যাশনাল মোহামেডান এ্যাসোসিয়াশনের মুহাম্মদ ইউসুফ ভারতীয় ব্যবস্থাপনা সভাসমূহে মহিলাদের প্রতিনিধিত্ব করার দাবি প্রথম উত্থাপন করেন। উনবিংশ শতাব্দীর ষষ্ঠ দশক থেকেই সমসাময়িক পত্রিকায় অতি অল্প সংখ্যক মুসলমান মেয়েদের স্কুলে পড়ার বিক্ষিপ্ত উল্লেখ পাওয়া যায়। এরও পূর্বে উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে মুসলিম বালিকার বিদ্যা পরীক্ষায় অংশগ্রহণের তথ্য পাওয়া যায়। সমকালীন সমাচার দর্পণ-এ তথ্যটি তুলে ধরে।[৪৪] বামাবোধিনী পত্রিকার ১৮৭৩ খ্রিঃ আগস্ট মাসের সংখ্যায় শিক্ষা বিভাগের ১৮৭১-১৮৭২ খ্রিঃ এর রিপোর্টে উল্লেখ করা হয় কলিকাতায় সরকারী সাহায্যপ্রাপ্ত বালিকা বিদ্যালয়ের সংখ্যা ছিল ১১০টি এবং ১৪টি বালিকা বিদ্যালয় ছিল। যেগুলো সরকারী সাহায্য পায় না এবং যেগুলো পায় উভয় স্কুলে সর্বমোট ছাত্রী সংখ্যা ছিল ৭৩২ জন। এর মধ্যে মাত্র ৫৮ জন ছিল মুসলমান ছাত্রী।[৪৫]

৪৩। Sayyid Ameer Alic The Influence of women in Islam, The Nineteeth century, Mayc 1899, p-755-774.

৪৪। Bimanbehari Mazumdar, History of Political thought from Rammohum to dayannda, 1821-84. vol. I: Bangal (Calcutta, 1934) p-394-401.

৪৫। বামাবোধিনী পত্রিকা, ১২০ সংখ্যা, আগষ্ট ১৮৭০, পৃ-১৪৩।

Dhaka University Institutional Repository

এর চেয়েও করুন চিত্র পাই ১৮৮০ খ্রিঃ ইডেন বালিকা বিদ্যালয়ের। সেখানে মোট ছাত্রী সংখ্যা ১৫৩ জনের মধ্যে মুসলিম ছাত্রী সংখ্যা মাত্র একজন।[৪৬] ১৮৮২ খ্রিঃ বামাবোধিনী পত্রিকার জানুযারী সংখ্যায় সম্পাদকের মন্তব্য অতি তাৎপর্যপূর্ণ স্ত্রী শিক্ষার সর্বাপেক্ষা উন্নতি পারসী সমাজে এবং সর্বাপেক্ষা দুর্গতি মুসলমানদের মধ্যে।[৪৭] তবে উনবিংশ মানসিকতার ক্রম পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়। এই শতাব্দীর আশির দশকে মুসলিম নারী শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে সর্বপ্রথম এগিয়ে আসে ঢাকা মুসলমান সুহৃদ সম্মিলনী ১৮৮৩ সালে।

এই সংগঠন অন্তঃপুর শিক্ষা প্রণালীতে মুসলমান মেয়েদের মধ্যে শিক্ষা প্রদানের ব্যবস্থা করে। প্রথম শ্রেণী থেকে শুরু করে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত বিভিন্ন শ্রেণীর পাঠ্য তালিকা নির্বাচন ও উক্ত পাঠ্য তালিকা অনুযায়ী সংগঠনের পক্ষ থেকে বিভিন্নস্থানে মেয়েদের পরীক্ষা গ্রহণের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। প্রথম বছর সর্বমোট ৩৭ জন ছাত্রী পরীক্ষা দিয়েছিল ১৪ জন উর্দু ভাষায় এবং ২৩ জন বাংলা ভাষায়। তন্মধ্যে উর্দু বিভাগে ১২ জন ও বাংলা বিভাগে ২২ জন উত্তীর্ণ হয়েছিলেন।[৪৮] নারী শিক্ষাকে মুসলমান সমাজে গ্রহণযোগ্য করার লক্ষ্যে অধ্যাপক মেরাজ উদ্দিনের সহযোগীতায় মোহাম্মদ রেয়াজউদ্দিন মুসলমান সমাজে গ্রহণযোগ্য বাংলা পাঠ্য বই তোহফাতুল মোসলেমীন (১২৯০) গ্রন্থখানি রচনা করেন। নওশের আলী খান ইউসুফজী বঙ্গীয় মুসলমান (১৮৯১) পুস্তকে ঢাকা মুসলমান সুহৃদ সম্মিলনীর নারী শিক্ষা বিস্তারের সফলতার কথা উল্লেখ করেছেন।[৪৯]

ঔপনিবেশিক সরকার কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত কাউন্সিল অব এডুকেশনের প্রেসিডেন্ট এলিয়ট বীটন বা বেথুন ১৮৪৯ সালের ৭ মে তারিখে একটি অবৈতনিক বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেন। উল্লেখ্যযোগ্য যে, ইংরেজ মিশনারীদের উদ্যোগে পরিচালিত মেয়েদের স্কুলগুলো খ্রিস্টধর্ম প্রচার করা হত এ কারণে কেউ এসব স্কুলে মেয়েদের পড়াতে আগ্রহী ছিলেন না। এই সংকট দূর করার জন্য শুধু হিন্দু পরিবারের মেয়েদের জন্যই তিনি এই স্কুলের ব্যবস্থা করেছিলেন।

৪৬। বামাবোধিনী পত্রিকা, ১২০ সংখ্যা, আগষ্ট ১৮৭০, পৃ-১৪৩।

৪৭। বামাবোধিনী পত্রিকা, ১৮২ সংখ্যা, আগষ্ট ১৮৮০, পৃ-১৪৯।

৪৮। তাহমিনা আলম, বাংলার সাময়িক পত্রে বাঙালি মুসলিম নারী সমাজ, ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী, প্রথম প্রকাশ, জুন-১৯৯৮খ্রিঃ, পৃ-৬২-৬৩।

৪৯। মোহাম্মদ আব্দুল কাউউম, ঢাকা মুসলমান সুহৃদ সম্মিলনী সাহিত্যিক, ১৪শ বর্ষ, বসন্ত সংখ্যা-১৩৮৪,পৃ ১-২।

Dhaka University Institutional Repository

বেথুন বালিকা বিদ্যালয়ে মুসলিম বালিকাদের শিক্ষার্থী হিসেবে গ্রহণ করা হত না। মূলত সে কারণেই মুর্শিদাবাদের নওয়াব বেগম ফেরদৌস মহলের আনুকূল্যে ১৮৯৬ খ্রিস্টাব্দে কলিকাতায় প্রতিষ্ঠিত হয় প্রথম মুসলিম বালিকা বিদ্যালয়। মুসলিম সমাজে যখন নারী শিক্ষার বিষয়টি মূলত পর্দাপ্রথার কঠোর বিধি নিষেধের জন্য বাধাগ্রস্ত ছিল। মুসলিম মেয়েদের বাইরের জগতের সাথে যোগাযোগ প্রায় বিচ্ছিন্ন ছিল। সেই যুগে কলকাতায় শ্যামবাজারের নামহীন একজন মুসলিম মহিলা শিক্ষাব্রতীর কথা জানা যায় যিনি ইংরেজ শিক্ষাব্রতী মিসকুকের শিক্ষা প্রসার ও প্রচারে সক্রিয় সহযোগীতা করেছেন।[৫০]

সাহিত্য ক্ষেত্রে নারী সমাজের অংশগ্রহণ ঃ

১৯৫৭ সালে পলাশী যুদ্ধের পর থেকে দেশের মুসলমানগণ রাজনৈতিক অস্থিরতা, জুলুম, নিপীড়ন, অর্থনৈতিক বিপর্যস্ততার মধ্যে শিক্ষা-দীক্ষা থেকে বঞ্চিত থেকে দিন যাপনে বাধ্য হয়েছিলেন। বাংলার ইতিহাসের এই ক্রান্তিকালে বা ভাংগনের যুগে মুসলমানদের পক্ষে চিন্তাশীল সাহিত্য সৃষ্টি করা সম্ভব হয়নি। কেননা চিন্তাশীল সাহিত্য সৃষ্টি করতে হলে যে সময়, সাধনা, স্থিতিশীলতা, অর্থনৈতিক নিরাপত্তা ও শিক্ষার প্রয়োজন, এদেশীয় মুসলমানগণ ছিলেন সে সব থেকে সম্পূর্ণ বঞ্চিত। উনবিংশ শতকের শেষ প্রান্তে এসে মুসলমান লেখকগণ যেন কিছুটা সচেতন হন। পুরো উনবিংশ শতাব্দী জুড়ে মুসলমানদের সাহিত্য সৃষ্টির যে প্রয়াস তা কেবল মাত্র পুরুষ সমাজের মধ্যেই মূলত সীমাবদ্ধ ছিল। আর এর মধ্যেই পুরো উনবিংশ শতাব্দী ধরে আমরা একজন মহিলা সাহিত্যিকের নাম হলেও পাই তিনি নবাব ফয়জুন্নেছা চৌধুরানী।

১৮৭৬ খ্রিস্টাব্দের ১০ই ফেব্রুয়ারী ঢাকা গিরিশ মুদ্রাযন্ত্র থেকে শ্রীমতি ফয়জুন্নেছা চৌধুরানীর রচিত সাহিত্য গ্রন্থ "রূপজালাল" প্রকাশিত হয়। যার মাধ্যমে ফয়জুন্নেছা বাংলা সাহিত্যের প্রথম মুসলিম মহিলা গ্রন্থকর্ত্রী হিসেবে খ্যাতি লাভ করেন।[৫১] মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যে একমাত্র মুসলিম মহিলা কবির নাম পাওয়া গিয়েছে, তিনি রহিমুন্নেছা।[৫২]

৫০। তাহবিনা আলম, প্রাগুক্ত, পৃ-৬৩।

৫১। রওশন আরা বেগম, নবাব ফয়জুন্নেসা ও পূর্ব বঙ্গের মুসলিম সমাজ, ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী, জুন-১৯৯৩, পৃ-৭৫-৭৬।

৫২। ডাঃ মুহাম্মদ এনামুল হক, মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যে একমাত্র মুসলিম মহিলা কবি, বাংলা একাডেমী পত্রিকা, ১ম সংখ্যা, পৃ-৫৩।

Dhaka University Institutional Repository

মধ্যযুগীয় সাহিত্যে রহিমুন্নেছার আবির্ভাব যদিও একটি বিরল ঘটনা, তথাপি রহিমুন্নেছা অন্যের গ্রন্থের অনুলিপি করতে গিয়ে স্থানে স্থান স্বয়ং কাব্য চর্চা করেছেন। তাঁর নিজস্ব কোন গ্রন্থ ছিল না। রহিমুন্নেছা শুধুমাত্র পদ্য চর্চা করেছেন, ফয়জুন্নেছা কেবল পদ্যেই সীমাবদ্ধ থাকেননি স্থানে স্থানে গদ্য চর্চাও করেছেন এবং ফয়জুন্নেছার "রূপজালাল"একখানি পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ।

১৮৬৫ খ্রিস্টাব্দে বিবি তাহেরন নেসা নামক একজন মুসলমান মহিলার রচিত একটি গদ্য নিবন্ধ বামাবোধিনী পত্রিকার ২৫তম সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। এই মহিলাকে সম্ভবতঃ প্রথম মুসলমান গদ্য লেখিকা বলে আখ্যায়িত করা যায়। লেখিকা এ নিবন্ধে শিক্ষার উপকারিতা এবং উপযোগিতা বর্ণনা করেছেন। প্রারম্ভে তিনি বলেছেন যে, "স্ত্রী এবং পুরুষ শ্রেণী কোন একটি না থাকলে পৃথিবীর "পরম মঙ্গলকর নিয়ম সকল প্রতিপালিত হত না, বরং পৃথিবী জনশূন্য অরণ্যানি তুল্যবোধ হত। সৃষ্টিকর্তা মানুষকে পরম হিতকর ও সুখবিধায়ক অমূল্য বিদ্যারত্ন লাভোপযোগী জ্ঞান দান করেছেন। কিন্তু এদেশের মহিলারা সেই বিদ্যাধনে বঞ্চিত হয়ে বিশ্বের অনুপম শৃঙ্খলার মধ্যে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করেছেন। অজাত ও মৃত পুত্র কেবল দুঃখদায়ক, কিন্তু মূর্খ সন্তান অসীম দুঃখের উৎস। উপসংহারে লেখিকা বলেন যদি ধরাধামকে যথার্থই সুখধামরূপে দেখার বাসনা থাকে তাহলে পুরুষ সমাজ যেন সকল উদাসীন্য বর্জন করে স্ত্রীগণকে বিদ্যা ভূষায় ভূষিত করতে চেষ্টা পান।[৫৩]

তবে এসব কিছুর পাশাপাশি নবাব ফয়জুন্নেছা একটি পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ রচনার কৃতিত্বের দাবিদার। বাংলা সাহিত্যে মুসলমান মহিলাদের মধ্যে ফয়জুন্নেছাই সর্বপ্রথম পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ রচনা করেছেন। মোবাশ্বের আলী বলেছেন, শুধু বাংলা সাহিত্যে নয়, সমগ্র উপমহাদেশে অপর কোন সাহিত্যে মুসলমান মহিলা রচিত গ্রন্থ ইতোমধ্যে প্রকাশিত হয়েছে কিনা আমার জানা নাই। "রূপজালাল" ব্যতীত ফয়জুন্নেছা কর্তৃক রচিত বলে আরো দু'খানি গ্রন্থের নাম পাওয়া যায়। কিন্তু সে সবের বাস্তব রূপ সম্পর্কে সন্দেদের অবকাশ রয়েছে। গ্রন্থ দু'খানি হল- সংগীত সার, ও সংগীত লহরী।[৫৪] শুধু নামোল্লেখ ছাড়া বই দু'টোর বাস্তব অস্তিত্বের কোন হদিস এ পর্যন্ত কেউ দিতে সক্ষম হয়নি। "রূপজালাল"[৫৫] গ্রন্থে নবাব ফয়জুন্নেছা বিচিত্রভাব ও ভাষার সমন্বয়ে অপরূপ সব কাহিনী আমাদের পরিবেশন করেছেন।

৫৩। গোলাম মুরশিদ, রাম সুন্দরী থেকে রোকেয়া নারী প্রগতির একশো বছর, ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী, প্রথম প্রকাশ, ১৯৯৩ খ্রিঃ পৃ-৯০-৯১।

৫৪। মোবাশ্বের আলীর 'নবাব ফয়জুন্নেছা' এবং 'রূপজালাল' শত বার্ষিকী স্মরণী, ১৯৭৬, পশ্চিমগাঁও কুমিল্লা, ১৯৭৭ খ্রিঃ পৃ-৪৫-৪৬।

৫৫। রওশন আরা বেগম, প্রাগুক্ত, পৃ-৭৮

Dhaka University Institutional Repository

কোন একটি নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য অনুসরণ না করে তিনি আমাদেরকে বিচিত্রতার বেড়াজালে আবদ্ধ করেছেন। ফয়জুন্নেছা যে মূলত পুঁথি সাহিত্যের ধারাকেই অনুসরণ করেছে একথা নিঃসন্দেহে বলা চলে। রূপকথা ধর্মী অলৌকিক ঘটনা ও চরিত্রের সমাবেশে দ্বন্দ্ব সংঘাতপূর্ণ প্রেম চিত্রময় পুঁথির উদাহরণ স্বরূপ মধুমালতী, সয়ফুলমূলক বদিউজ্জামান ইত্যাদির উল্লেখ করা যায় রূপজালাল ও এগুলোর ব্যতিক্রম নয়।[৫৬] ফয়জুন্নেসাকে মধ্যযুগীয় বলা ভুল হবে। কারণ তাঁর একই পুস্তকে অত্যন্ত আধুনিক গদ্যের (বঙ্গিমের মতো) পরিচয় পাওয়া যায় যা মাধে মাঝে সংস্কৃতি কবিতাতে বিধৃত। ১৯০২ সালে ফয়জুন্নেছা খাতুন নামে প্রথম মুসলিম মহিলা মুসলামনদের সম্পাদিত ইসলাম প্রচারক পত্রিকায় আত্মপ্রকাশ করেন। ১৯০২ সালে ইসলাম প্রচারক তাঁর হামদ, প্রশাস্তি প্রকাশ করে। এছাড়াও তিনি Gold Smith এর The Hermit কাব্য বাংলায় অনুবাদ করেন ১৮৮৪ সালে।

শিক্ষা বিস্তারের ফলে বিভিন্ন স্তরের এবং বিভিন্ন কাঠামোর শিক্ষা লাভ, মহিলাদেরকে লেখালেখির জগতে প্রবেশের জন্য প্রস্তুত করে তুলেছিল। সনাতনী যুগে অন্দর মহলেই মহিলারা সর্বদা লিখতেন। তবে উপনিবেশিক শাসনের আওতায়, শিক্ষার নতুন ধারার আবির্ভাব তারা সৃজনশীলতার এক নবযুগে পদার্পন করেন। উনিশ শতকে যারা লেখালেখির সাথে জড়িত ছিলেন কালক্রমে তাঁরা তাদের লেখার স্বীকৃতি পেলেন। তাঁরা বাংলায় লিখতেন, যদিও তাঁদের মধ্যে অনেকেই গৃহে উর্দুতে লেখাপড়া করেছিলেন। এই নারীরা যেমন ছিলেন নবযুগের ফসল তেমনি ছিলেন যুগ পরিবর্তনের বাহক।[৫৭] ১৮৯৭ সালের বামাবোধিনীর জুন সংখ্যায় লুৎফুন্নেসা নাম্নী আরো একজন মুসলমান মহিলা লেখকের কবিতা ছাপা হয়, যিনি কাম্বেল মেডিকেল স্কুল থেকে পাস করেছিলেন। কবিতাটির নাম ছিল "বঙ্গীয় মুসলমান মহিলাদের প্রতি।"

সিরাজগঞ্জ নিবাসী খায়রুন্নেসা (১৮৭০-১৯১২) ১৯০৪ সালে আমাদের শিক্ষার অন্তরায় নামে একটি রচনা প্রকাশ করেন। খায়রুন্নেসার লেখায় উপযুক্ত শিক্ষা। সংস্কৃতি এবং বুদ্ধিমত্তার পরিচয় রয়েছে বলে মনসুর উদ্দীন মত প্রকাশ করেন। স্বদেশী আন্দোলনের সমর্থনে তিনি নারী সমাজের প্রতি বিদেশী সামগ্রী বর্জনের আহবান করেন। ৬৮ পাতার পুস্তিকা তাঁর সতীর পতি ভক্তি ছিল ভাল স্ত্রী হওয়ার উপদেশমূলক নির্দেশিকা।[৫৮]

৫৬। মোবাশ্বের আলী, প্রাগুক্ত, পৃ-৫৬।

৫৭। সোনিয়া নিশাত আমীন, বাঙালী মুসলিম নারীর আধুনিকায়ন, প্রাগুক্ত, পৃ-১৫৬-১৬১।

৫৮। মুহাম্মদ মুনসুর উদ্দিন, এম.এ. বাংলা সাহিত্যে মুসলিম সাধনা, ১-৩ খন্ড, ৩য় সংস্করণ, ঢাকাঃ রতন পাবলিকেশন্স, ১৯৮১ খ্রিঃ পৃ-১৯৭-১৯৮।

Dhaka University Institutional Repository

বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে মোটামুটি প্রতিটি মধ্যবিত্তের ঘরে জার্নাল, সাপ্তাহিক, পক্ষিক এবং দৈনিক সংবাদপত্র পৌঁছাতে শুরু করে। সেকালের আবেকজন লেখিকা হচ্ছেন সিলেট নিবাসী সাহিফাবানু (১৮৫০-১৯২৬) তিনি জনবহুল কলরবময় ঢাকা ও কোলকাতা থেকে দূরে ঐ রকম একটি আধা মফস্বল শহরে থেকেও সাহিত্য অঙ্গনে জায়গা করে নিয়েছিলেন।[৫৯]

রাজিয়া খাতুন চৌধুরানী ছিলেন(১৯০৭-১৯৩৪) একজন সমাজ বিশ্লেষক। রাজিয়া তাঁর স্বল্পকালীন জীবনে প্রবন্ধকার, কবি ও ছোটগল্প লেখক হিসেবে পরিচিতি লাভ করেন। রাজিয়া খাতুন সেসব সীমিত সংখ্যক মহিলাদের একজন ছিলেন যিনি সে সময়কার রাজনৈতিক আন্দোলন, যথা স্বদেশী আন্দোলন, খিলাফত আন্দোলন, অসহযোগ আন্দোলন ইত্যাদির খুব ঘনিষ্ঠ হতে পেরেছিলেন।[৬০] কোলকাতা থেকে প্রকাশিত কাজ নজরুল ইসলামের স্বল্পায়ু কিন্তু জনপ্রিয় এবং প্রগতিশীল ধুমকেতু পত্রিকায় তিনি নিয়মিত লিখতেন। তিনি মিসেস এম.রহমান এই নামে ধূমকেতুর মহিলা বিষয়ক কলাম লিখতেন। নবাব ফয়জুন্নেসার রচনা আবিস্কার এবং তাঁর সাহিত্য সমালোচকদের মনোযোগ আকৃষ্ঠ হওয়র পূর্বে, তদানীন্তন আধুনিক কালের প্রথম মহিলা লেখক হিসেবে বেগম রোকেয়ার নাম বিবেচিত হত। রোকেয়া তাঁর সাহিত্যকর্ম শুরু কনের ১৯০১ সালে নবপ্রভা পত্রিকায় "পিপাসা" নামক রচনাটি প্রকাশের মাধ্যমে। রবীন্দ্রনাথের প্রায় সমসাময়িক লেখক হিসেবে রোকেয়ার লেখায় হয়তো নান্দনিকতার অভাব ছিল কিন্তু তিনি তা পুষিয়ে দিয়েছিলেন তাঁর লেখার তীক্ষ্ণতা স্পষ্টতা এবং নারীদের বিষয়গুলো সম্পর্কে একাগ্রতার মাধ্যমে।[৬১]

বেগম রোকেয়া শুধু অনৈসলামী অবরোধ প্রথার উচ্ছেদ ও মুসলিম নারী শিক্ষারই অগ্রদূত ছিলেন না। তিনি বাঙালি মুসলমানের সামগ্রিক উন্নয়নের জন্যও মজবুত হাতে কলম ধরেছিলেন এবং অংশ নিয়েছিলেন বিকাশমুখী বিভিন্ন কর্মযজ্ঞে। ইসলামী মূল্যবোধ সম্পন্ন কল্যাণমুখী সমাজ গঠনই ছিল তাঁর আদর্শ।[৬২] বেগম রোকেয়ার লেখা প্রবন্ধ সাহিত্য থেকে তা প্রমাণিত হয় যে, তিনি প্রচন্ড আল্লাহ ভীরু এবং ইসলামের প্রতি পূর্ণ আস্থাশীল রমনী ছিলেন।

৫৯। সোনিয়া নিশাত আমীন, প্রাগুক্ত, পৃ-১৬২।

৬০। রাজিয়া খাতুন চৌধুরানী, বঙ্গীয় মুসলিম মহিলাগণের শিক্ষার ধারা, সওগাত ভদ্র, ১৩৩৪, পৃ-২৭৩।

৬১। সোনিয়া নিশাত আমীন, প্রাগুক্ত, পৃ-১৬২।

৬২। দি উইটনেস, রোকেয়া সন্ধানে, সম্পাদনায় তাহমিনা তাকিয়া (ঢাকাঃ প্রকাশকাল-ডিসেম্বর, ১৯৯১ খ্রিঃ,পৃ-১২)

Dhaka University Institutional Repository

তাঁর লেখনী হতে কয়েকটি উদাহরণ দিলেই একথা স্পষ্ট হয়ে যায় যে, তিনি একজন ইসলাম ধর্মে বিশ্বাসী মহিলা ছিলেন এবং কুর'আন সুন্নাহর সত্যিকার প্রয়োগ ও ইসলামের বিধানের প্রতি তাঁর লেখনী হতে কয়েকটি উদাহরণ দিলেই একথা স্পষ্ট হয়ে যায় যে, তিনি একজন ইসলাম ধর্মে বিশ্বাসী মহিলা ছিলেন এবং কুর'আন সুন্নাহর সত্যিকার প্রয়োগ ও ইসলামের বিধানের প্রতি তাঁর অগাধ শ্রদ্ধা ছিল। যেমন "স্কুলের বিরুদ্ধে কতদিকে কত প্রকার ষড়যন্ত্র তা একমাত্র আল্লাহ জানেন। একমাত্র ধর্মই আমাদিগকে বরাবর রক্ষা করিয়া আসিতেছে।" অনত্র স্কুলের আঠার বছর পূর্তিতে তিনি বলেন, "হে আল্লাহ আমরা তোমারই উপাসনা করি এবং তোমারই সাহায্য প্রার্থনা করি কুর'আন শরীফের এই রচনাটিই আমি জীবনের পরতে পরতে সত্য বলিয়া উপলব্ধি করিলাম।"[৬৩] এক বক্তব্যের তিনি বলে, "মুসলমান বালিকাদের প্রাথমিক ভাষায় কুর'আনের অনুবাদ শিক্ষা দিতে হবে। সম্ভবত এজন্য গভর্ণমেন্ট বাধ্যতামূলক আইন পাস না করলে আমাদের সমাজে মেয়েদের কুর'আন শিক্ষাও দিবে না। আমরা কুর'আন শরীফের লিখিত ব্যবস্থা অনুযায়ী কোন কার্য করি না। শুধু তাহা পাখির মত পাঠ করি আর কাপড়ের থলিতে (জুযদানে) পুরিয়ে অতি যত্নে উচ্চ স্থানে রাখি। যদি কেউ ডাক্তার ডাকিয়া ব্যবস্থাপত্র লয় কিন্তু তাহাতে লিখিত ঔষধপত্র ব্যবহার না করিয়া সে ব্যবস্থাপত্র খানাকে মাদুলীরূপে গলায় পরিয়ে থাকে আর দৈনিক তিবার করিয়া পাঠ করে, তাহাতে কি সে উপকার পাইবে?" [৬৪]

ছেলেবেলায় আমি মার মুখে শুনতাম, কুর'আন শরীফ ঢাল হয়ে আমাদের রক্ষা করবে। সে কথা অতি সত্য। অবশ্য তার মানে এই নয় যে, খুব বড় আকারের সুন্দর জেলদ বাঁধা কুর'আনখানা আমার পিঠে ঢালের মতো করে বেঁধে নিতে হবে। বরং আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে আমি এই বুঝি যে, কুর'আন শরীফের সার্বজনীন শিক্ষা আমাদের নানা প্রকার কুসংস্কারের বিপদ থেকে রক্ষা করবে। কুর'আন শরীফের বিধান অনুযায়ী ধর্ম-কর্ম আমাদের নৈতিক ও সামাজিক অধঃপতন থেকে রক্ষা করবে।[৬৫]

৬৩। শামসুন নাহার, রোকেয়া জীবনী, প্রথম প্রকাশ, বুলবুল পাবলিশিং হাউস, পুন মুদ্রা (১৯৩৭), ঢাকাঃ রিয়াদ মাহমুদ, ১৯৮৭, পৃ-৮৩।

৬৪। মিসেস আর. এস. হোসেন, বঙ্গীয় নারী শিক্ষা সমিতি, সওগাত, ৪র্থ বর্ষ, ১০ম সংখ্যা চৈত্র ১৩৩৩/১৯২৭, পৃ-২৮২।

৬৫। বেগম রোকেয়া, ধ্বংসের পথে বঙ্গীয় মুসলমান, মাসিক মোহাম্মদ, জৈষ্ঠ-১৩৩৮।

Dhaka University Institutional Repository

সম্পদের উত্তরাধিকার ও মোহর প্রসঙ্গে তিনি লিখেন-"হায় পিতা মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তুমি আমাদের উপকারের নিমিত্তে পিতৃসম্পত্তির অধিকারিণী করিয়াছ। কিন্তু তোমার সুচতুর শিষ্যগণ নানা উপায়ে কুলবালাদের সর্বনাশ করিতেছে। আহা! "মহম্মদীয় আইন" পুস্তকের মসি রেখারূপে পুস্তকেই আবদ্ধ থাকে। টাকা যার, ক্ষমতা যার, আইন তাহারই। আইন আমাদের ন্যায় নিরক্ষর অবলাদের নয়।"[৬৬]

নারীর ব্যক্তি স্বাধীনতার অধিকার, মতামত প্রকাশের অধিকার ইসলাম প্রদত্ত। নারীদের অবলা বলে গণ্য করা হয়। রোকেয়া বলেন, অবলাদেরও চক্ষুকর্ণ আছে, চিন্তাশক্তি আছে, উক্ত শক্তিগুলোর অনুশীলন যথানিয়মে হওয়া উচিত। তাহাদের বাকশক্তি কেবল আমাদের শিখান বুলি উচ্চারণ করবার জন্য নয় এবং ব্যক্তি স্বাধীনতা মানে গাটহীন, বাঁধনহারা হয়ে চলা, বলা, খেলা নয়-নর-নারীর উভয়কেই একটি সীমারেখা মেনে চলতে হবে এবং এ সীমারেখা মেনে চলাটা মানব সভ্যতার সুষ্ঠু বিকাশ ও শৃঙ্খলার জন্য অতীব প্রয়োজন।[৬৭]

মূলত ইসলামই নারী মুক্তি দিয়েছে। কিন্তু প্রকৃত ঈমানদারীত্বের অভাবে সময়ে সময়ে বিভিন্ন স্থানে নারী মুক্তি স্বাধীনতার বিধান চাপা পড়েছিল। বেগম রোকেয়া ইসলামী দর্শন ও আদর্শ দ্বারাই নিজের বুদ্ধিমত্তার প্রয়োগে সেসব বিধানের পুনর্জন্মোর চেষ্টা করেছেন। লেখিকার দু'একটি উক্তকে বিচ্ছিন্নভাবে উপস্থাপন করে বা ঐ সকল উক্তির উপর ভিত্তি করে ইসলামের বিরুদ্ধে বেগম রোকেয়াকে দাঁড় করানো একটি অন্যায়। কেননা তৎকালীন প্রতিকূল সমাজ ব্যবস্থার সাথে লড়াই করে তিনি অগ্রসর হয়েছিলেন। তারই পরিপ্রেক্ষিতে তিনি প্রচন্ড ক্ষোভ, গোস্বা ভরে কখনো কখনো এ জাতীয় কিছু মন্তব্য করেছেন।[৬৮]

৬৬। বেগম রোকেয়া, 'গৃহ' মতিচুর, প্রথম খন্ডের প্রবন্ধ, পৃ-৭২।
৬৭। বেগম রোকেয়া, সৌরজগৎ, পৃ-১৩১-১৩২।
৬৮। সম্পাদনা ঃ তাহসিনা তাকিয়া, প্রাগুক্ত, পৃ-৫৭।

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম বাঙালি মুসলিম মহিলা উপন্যাসিক নূরুন্নেছা খাতুন বিদ্যাবিনোদিনী স্বপ্রতিষ্ঠ কর্মে আপন পরিচয়ে বাঙালি নারী সমাজে উজ্জ্বল নক্ষত্রের মতই দেদীপ্যমান। বিয়ের পর সাহিত্যচর্চা করে মাত্র ২৯ বছর বয়সে ১৩২৯ (১৯২৩) সালে তাঁর রচনা প্রথম উপন্যাস "স্বপ্নদ্রষ্টার" জন্য তিনি সে সময়ের সাহিত্য সমাজে সমাদৃত হয়েছিলেন। সম্ভবত তাঁর কর্মের সূচনা হয় "আহ্বান-গীতি" নামক একটি কবিতার মাধ্যমে। কবিতাটি ১৩১৮ সালে কহিনূর পত্রিকার প্রথম সংখ্যায় প্রকাশিত হয় "সওগাত" পত্রিকার সপ্তমবর্ষ প্রথম সংখ্যায় "আমাদের কাজ" নামে একটি প্রবন্ধও প্রকাশিত হয়। কথাশিল্পী হিসেবে নূরুন্নেছা খাতুনের সাধনার কালমাত্র ছয়/সাত বছরের। এ সময়ের মধ্যে নূরুন্নেছা খাতুন এর ছয়টি উপন্যাস স্বপ্নদ্রষ্টা, জানকী বাঈ, আত্মদান, ভাগ্যচক্র, বিধিলিপি ও নিয়তি প্রকাশিত হয়েছিল। এ ছয়টি উপন্যাস ছাড়াও 'মোসলেম বিক্রম, বাঙ্গালার মুসলিম রাজত্ব' নামে দুটি ঐতিহাসিক উপন্যাস লিখিছেন। এছাড়াও অসংখ্য প্রবন্ধ লিখেছেন। নূরুন্নেছা খাতুন বিদ্যাবিনোদিনীকে তাঁর সাহিত্যকর্মের স্বীকৃতি স্বরূপ নিখিল বঙ্গ সাহিত্য সমিতি তাঁকে 'বিদ্যানিবোদিনী' উপাধিতে ভূষিত করেন। নিখিল ভারত সাহিত্য সঙ্ঘ তাঁকে 'সাহিত্য সরস্বতী' উপাধি দেন। এছাড়া বিভিন্ন সাহিত্য সম্মেলনের আমন্ত্রণে তিনি যোগ দিতেন এবং সে সকল সভায় সমাজ গঠনে সাহিত্যকের ভূমিকা ও দায়িত্ব বিষয়ে বক্তব্য রাখতেন। ১৯৩৭ সালে মুন্সিগঞ্জে অনুষ্ঠিত বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনের ষোড়শ অধিবেশনে "বঙ্গসাহিত্যে মোসলমান" শীর্ষক তাঁর একটি প্রবন্ধ প্রচুর সুনাম অর্জন করে। ১৯২৯ সালে সওগাত মহিলা সংখ্যায় তাঁর ছবি ও গল্প পাঠিয়েছিলেন। বিদ্যাশিক্ষার প্রতি তাঁর প্রবল আকর্ষণ ছিল। আশি উত্তর বয়সেও জ্ঞানুশীলনের ব্যাপারে তাঁর কোন ক্লান্তি ছিল না। ১৯৭৫ সালের ৬ই এপ্রিল এই স্বনামধন্য সাহিত্যিক পরলোকগমন করেন।[৬৯]

৬৯। শত বছরের বাংলাদেশের নারী, ঢাকাঃ নারীগ্রন্থ প্রবর্তনা, দ্বিতীয়, সংস্করণ, ফেব্রুয়ারী, ২০০৩, পৃ-৯-১০; সোনিয়া নিশাত, আশ্বিন, প্রাগুক্ত, পৃ-১৫৮।

Dhaka University Institutional Repository

আকিকুন্নেসা আহমদ

"আধুনিকা স্ত্রী" ও "আধুনিক স্বামী" নামক দু'টি গ্রন্থ রচনা করে নারী অধিকার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে একটি বিশেষ ভূমিকা রাখেন। মাত্র দুটি গ্রন্থ রচনা করেও তিনি ভীষণ জনপ্রিয়তা লাভ করতে পেরেছেন। বেগম আকিকুন্নেসা নিজে একজন গৃহবধূ হিসেবে স্বামী সন্তানদের দেখাশুনা করা এবং সকল প্রকার সামাজিকতা বজায় রেখেও নারীদের প্রতি তাঁর নিজের কর্তব্যের প্রতি সজাগ ছিলেন। তাই তাঁর বাস্তব অভিজ্ঞতা দিয়ে "আধুনিকা স্ত্রী" (১৯৫৩) ও "আধুনিক স্বামী" (১৯৬২) গ্রন্থ দু'টি রচনা করেন। ১৭ জুন ১৯৮২ সনে বেগম আকিকুন্নেসা আহমদ ইন্তেকাল করেন।[৭০]

আখতার মহল সাঈদা খাতুনকেও এই সকল লেখকদের দলে স্থান দেয়া যায়। আখতার মহল সাঈদা খাতুন ১৯০১ সালে পূর্ব বাংলায় ফরিদপুর জেলার একটি ধনাঢ্য পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। বাড়ির বৌ এর বই পত্রে এবং লেখালেখিতে আসক্তি শ্বশুর বাড়ির লোকজন ভাল চোখে দেখেনি। কিন্তু আখতার মহল গোপনে লিখে গেছেন। তিনি তাঁর লেখা ট্রাংকের ভেতর তালাবদ্ধ করে রাখতেন। একদিন তাঁদের নোয়াখালীর বাড়িতে বেড়াতে এসে স্বয়ং কবি নজরুল ইসলাম সেগুলো আবিষ্কার করেন। পরবর্তীকালে তাঁর লেখা নওরোজে ছদ্মনামে এবং সওগাতে স্বনামে প্রকাশিত হয়। মাত্র ২০ বছর বয়সে তার অকাল মৃত্যুতে তাঁর লেখক জীবনের সমাপ্তি ঘটে। তাঁর লেখা দু'টি প্রবন্ধ এখন পাওয়া যায়।[৭১]

শামসুন্নাহার মাহমুদ (মৃত্যু-১৯৬৪)

এ দেশের নারী শিক্ষা, নারী জাগরণের প্রচার ও প্রসারে অনন্য কীর্তিও অবদান রেখে গিয়েছেন। বেগম রোকেয়ার সঙ্গে শামসুন নাহারের পরিচয় হয় লেখার মধ্য দিয়ে। অল্প বয়সে শামসুন নাহারের প্রথম লেখা একটি কবিতা প্রকাশিত হয় তৎকালীন কিশোরদের পত্রিকা "আঙ্গুর" নামক মাসিক পত্রিকায়। এরপর নওরোজ ও অন্যান্য পত্রিকায় শামসুন নাহারের কিছু কিছু লেখা ছাপা হয়। তাঁর প্রথম রচনা "পূণ্যময়ী" লেখা হয় মাত্র দশ বছর বয়সে এবং ১৯২৫ সালে তা প্রকাশিত হয় যখন তাঁর বয়স সতের। এই বইকে উপলক্ষ্য করে কবি কাজী নজরুল ইসলাম তাঁকে পাঠিয়েছিলেন তাঁর অশিষ বাণী। কবির স্বহস্তে লিখিত কবিতাখানি ব্লক করে পূণ্যময়ীর প্রথম পাতায় ছাপানো হয়েছিল।

৭০। শত বছরে বাংলাদেশের নারী, প্রাগুক্ত, পৃ-১৮।
৭১। সোনিয়া নিশাত আমীন, প্রাগুক্ত, পৃ-১৬৯।

Dhaka University Institutional Repository

অল্প বয়স থেকেই শামসুন নাহার লেখাপড়ার প্রতি যেমন আকৃষ্ঠ হয়েছিলেন তেমনি সাহিত্যের প্রতিও অনুরাগ জন্মেছিল তাঁর বাল্যকাল থেকেই। এর কারণ তাঁদের বাড়িতে ছিল একটা সুন্দর সহিত্যিক পরিবেশ। তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থ পূণ্যময়ী, ফুল বাগিচা, বেগম মহল, রোকেয়া জীবনী, শিশুর শিক্ষা, আমার দেখা তুরস্ক, নজরুলকে যেমন দেখেছি। তাঁর সম্পাদিত পত্রিকা "বুলবুল"। স্কুলের পাঠ্যপুস্তক- সবুজ পাঠ, কিশোর সাথী, তাজমহল পাঠ, নতুন তাজমহল পাঠ, বিচিত্রপাঠ্য। ১৯৬৪ সালে মাত্র ৫৬ বছর বয়সে তিনি পরলোকগমন করেন।[৭২]

সৈয়দা মোতাহেরা বানু (১৯০৬-১৯৭৩)

১৯০৬ সালে নভেম্বর মাসে বরিশাল জেলার পটুয়াখালীর বাসনা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। কবি মোতাহার বানুর কাব্যচর্চা শুরু হয় তার বিয়ের পর থেকে। তবে লেখালেখির অনুপ্রেরণা পেয়েছিলেন পিতা সৈয়দ সাজ্জাদ মোজাফ্ফরের কাছ থেকেই। "সওগাত" ১৩২৬ সংখ্যায় খেলার সাথী নামে কবিতাটিই হচ্ছে তাঁর লেখা প্রথম প্রকাশিত কবিতা। সেই থেকে মোতাহেরা বানু কবিতা লেখা শুরু করেন আর থামেননি। এর মধ্যে বাল্য বিধবা, প্রতীক্ষা, অধীরা ও চিরবাঞ্ছিত অন্যতম। সৈয়দা মোতাহেরা বানুর কাব্যচর্চা দীর্ঘকালের নয়। তাঁর কাব্য কাল মূলত আট-দশ বছরের। ব্যক্তি জীবনে তিনি ছিলেন খুবই ধর্মভীরু নিষ্ঠাবান নামাজি। তিনি পরলোকগমন করেন ১৯৭৩ সালের ২২ মার্চ ঢাকার হলি ফ্যামেলি হাসপাতালে।[৭৩]

দৌলতুননেছা খাতুন (১৯২২-১৯৯৭)

তিনি ১৯২২ খ্রিস্টাব্দে তাঁর পিতার কর্মস্থান বগুড়া জেলার সোনাতলা নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। রাজনৈতিক কর্মী সমাজ সেবিকা ছাড়া দৌলতুন্নেছা খাতুন লেখিকা হিসেবেও ছিলেন যথেষ্ঠ পরিচিত। দৌলতুননেছা খাতুন বার বছর বয়স থেকে লেখালেখি শুরু করেন এবং মৃত্যুর আগ পর্যন্ত সাহিত্য চর্চা করেছেন। অল্প বয়স থেকেই দৌলতুননেছার রচনা বঙ্গশ্রী, দেশ, নবশক্তি, বিচিত্রা প্রভৃতি পত্রিকায় প্রকাশিত হতে থাকে। রস রচনা, একাংকীকা, প্রবন্ধ, গল্প, উপন্যাস প্রভৃতি রচনার মাধ্যমে তাঁর বাস্তববাদী চেতনার প্রকাশ ঘটেছে। তিনি ১৯৯৭ সালে রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে মৃত্যুবরণ করেন।[৭৪]

৭২। সোনিয়া নিশাত আমীন, প্রাগুক্ত, পৃ-১৬৭।

৭৩। সাঈদা জামান, সৈয়দা মোতাহেরা বানু, ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী, প্রথম প্রকাশ, সেপ্টেম্বর, ২০০০ খ্রিঃ,পৃ-২৭।

৭৪। গোলাম কিবরিয়া পিনু, দৌলতুননেছা খাতুন, ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী, প্রথম প্রকাশ, জুন-১৯৯৯ খ্রিঃ পৃ-২১-২২।

Dhaka University Institutional Repository

ড.মালিহা খাতুন

ড. মালিহা খাতুন ১৯২৮ সালের ২২ জুলাই পাবনা জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৪০ সালে সাখাওয়াত মেমোরিয়াল গালর্স স্কুল থেকে ম্যাট্রিক পাস করেন। ১৯৫৭ সালে এভিনবনা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মনোবিজ্ঞান ও ১৯৫৯ সালে দর্শনে এম.এ. পাস করেন। ড. মালিহা খাতুন অনেক বই প্রণেতা। মূলত তিনি নাট্যকার উপন্যাসিক গল্পকার প্রবন্ধকার ও কবি। তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থ ১৫টি। ১৯৭৭ সালে সাহিত্য বিনোদিনী পুরস্কার লাভ করেন।[৭৫]

মাহমুদা খাতুন

মাহমুদা খাতুন সিদ্দীকা ১৯০৬ সালে পাবনায় জন্মগ্রহণ করেন। সওগাত এবং বেগম পত্রিকার প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই তিনি নিয়মিত লেখেছেন। মাহমুদা খাতুনের প্রথম প্রকাশিত কাব্য গ্রন্থের নাম "পসারিনী" ১৯৩১ সালে প্রকাশিত হয়। তাঁর অন্যান্য লেখা "মন ও মৃত্তিকা" ও অরণ্যের সুর"। বিভিন্নপত্র পত্রিকায় প্রকাশিত ও পান্ডুলিপি আকারে সংরক্ষিত তাঁর কবিতার সংখ্যা প্রায় শতাধিক। কবি মাহমুদান খাতুন সিদ্দিকা ১৯৭৭ সালে মৃত্যুবরণ করেন।[৭৬]

জেব-উন নেসা আহমদ

জেব-উন নেসা আহমদ ১১ এপ্রিল ১৯৩৮ সালে সিলেটের লামাবাজারে জন্মগ্রহণ করেন। পঞ্চাশের দশক থেকে বেগম জেব-উন-নেসা আহমদ শিশু কিশোরদের জন্য লেখায় উৎসাহিত হন। তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থের সংখ্যা ২৮টি। এছাড়া পান্ডুলিপি আকারে রয়েছে আরও ৩৯টি গ্রন্থ। তাঁর রচিত গানের সংখ্যা পঁচাত্তরের ওপরে। ১৯৩৩ সালের ১২ জানুযায়ী মাত্র ৫৫ বছর বয়সে দীর্ঘদিন অসুস্থ থাকার পরে মারা যান।[৭৭]

৭৫। শত বছরে বাংলাদেশের নারী, নারী গ্রন্থ প্রবর্তনা, প্রাগুক্ত, পৃ-১২১।

৭৬। বাংলাদেশের নারী, প্রাগুক্ত, পৃ-৪০-৪১।

৭৭। শত বছরে বাংলাদেশের নারী, নারী গ্রন্থ প্রবর্তনা, প্রাগুক্ত, পৃ-১৩৩-১৩৪।

Dhaka University Institutional Repository

মিসেস রাজিয়া মজিদ

মিসেস রাজিয়া মজিদ ১ জানুয়ারি ১৯৩০ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ১৯৪৪ সালে ম্যাট্রিক পাস করেন। ১৯৪০ সালে মাত্র দশ বছর বয়সে তাঁর লেখিকা জীবন আরম্ভ হয়। বর্তমানে রোববার, ইত্তেফাক, বেগম, দৈনিক ইনকিলাব ও দৈনিক দিলকালে নিয়মিত লিখেছেন। তিনি "পেনশন" ছায়াছবির কাহিনীকার। টেলিভিশন ও রেডিওর নাট্যকার। ১৯৭৮ সালে বাংলা একাডেমীর পুরস্কার লাভ করেন। ১৯৮৯ সালে একুশে পদক ১৯৮৪ সালে বাংলাদেশ লেখিকা সংঘের স্বর্ণপদক লাভ করেন। তিনি মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে প্রচুর ছোটগল্প ও উপন্যাস রচনা করেছেন। মিসেস রাজিয়া মজিদ এখনও নিয়মিত লিখছেন।[৭৮]

কবি আজিজা এন মোহাম্মদ

কবি আজিজা এন মোহাম্মদের জীবনের দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হয়েছে সাংবাদিকতার মধ্যে দিয়ে। পাশাপাশি প্রায় অর্ধশতাব্দী জুড়ে কবি আজিজা কাব্যচর্চা করেছেন। তার বহু কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। নয় সন্তানের জননী আজিজা এন মোহাম্মদ ১৯৮৪ সালের ৬ অক্টোবর ইনতিকাল করেন।

তৎকালীন সময় যে সকল মহিলারা শিক্ষাক্ষেত্রে অগ্রসর হয়েছিলেন তাঁরাই লেখার জন্য কলমও হাতে তুলে নিয়েছিলেন। তাই সাহিত্য ক্ষেত্রে তো অবশ্যই অন্যান্য ক্ষেত্রেও মহিলারা বিভিন্ন পেশায় অংশগ্রহণ করতে থাকে সংখ্যায় কম হলেও। এঁদের মধ্যে সাংবাদিকতায় নূরজাহাজ বেগম "বেগম" পত্রিকায়। নার্সিং এ তুবা খানম, সাংবাদিক ও শিক্ষাবিদ রাজিয়া খান। শিক্ষাবিদ মেহেরুন্নেসা। ইসলাম জোহরা বেগম, জোবেদা খানম, আনোয়ারা ইসলাম মনসুরসহ আরও অনেক মহিলা ব্যক্তিত্ব যাদের ত্যাগ ও সীমাহীন চেষ্টায় বর্তমানের মুসলিম নারী সমাজ শিক্ষাসহ সকল ক্ষেত্রে নিজেদের অবস্থান গড়ে নিতে সক্ষম হয়েছেন।[৭৯]

৭৮। শত বছরে বাংলাদেশের নারী, প্রাগুক্ত, পৃ-৯২-৯৩।
৭৯। শত বছরে বাংলাদেশের নারী, পৃ-১৫১-১৬৭।

Dhaka University Institutional Repository

বর্তমানে বাংলাদেশে নারীর সামাজিক অবস্থা

শতকরা ৮৭ জন মুসলমানের আবাসভূমি এ বাংলাদেশ। হযরত শাহ জালাল (রঃ), হযরত শাহ শাখদুম(রঃ), হাজী শরীয়তউল্লাহ (রঃ), বড় পীর হযরত আবদুল কাদের জিলানী(রঃ)সহ বহু পরীর আউলিয়ার পুণ্যভূমি এই বাংলাদেশ। দুঃখজনক এখানে বিপুল সংখ্যক মুসলমান বাস করে যাদের জীবন দর্শন বিভিন্ন। অথচ ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানে এঁরা মুসলমান। বর্তমান বাংলাদেশের মুসলমানরাও অন্যান্য ধর্মের মত ইসলামকেও জীবনের ব্যক্তিগত গন্ডির মধ্যে সীমিত করে দিয়েছে। জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রে প্রবেশের অনুমতি তার নেই। অথচ ইসলাম বাস্তব জীবনে প্রতিষ্ঠাযোগ্য একটি প্রগতিশীল পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান।[৮০] পবিত্র কুর'আন মজিদে ইসলামকে কোথাও ধর্ম বলা হয়নি; বলা হয়েছে দ্বীন! শুধু দ্বীন নয় বরং বলা হয়েছে আদ্‌দ্বীন। যার অর্থ This is the only way of life. বা একমাত্র জীবন বিধান। একথা মনে প্রাণে বিশ্বাস করা এবং মেনে চলা ঈমানের শর্ত।

মানব সভ্যতার বিনির্মাণ, এর বিকাশ ও উন্নয়নের জন্য প্রয়োজন নারী ও পুরুষ উভয়কে। নারী পুরুষের পরস্পরের সহযোগিতা, সহমর্মিতা, সম্মিলিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ, আনুগত্য ও অনুসরণের মাধ্যমেই মানব সমাজের উন্নয়ন সম্ভব। সুতরাং মানব সভ্যতার উন্নতির জন্য যেমন প্রয়োজন আছে কোমলতা ও নমনীয়তার তেমনি প্রয়োজন আছে কঠোরতার। যেমন প্রয়োজন একজন দক্ষ সেনাপতির, বিচক্ষণ শাসকের। তেমনি প্রয়োজন মমতাময়ী মাতার, দায়িত্বশীল সহধর্মিনীর, আনুগত্যশীল পরিবার পরিজনের। উভয় শ্রেণীর মধ্যে যাকেই বাদ দেয়া হবে তমদ্দুন ততই ক্ষতিগ্রস্ত হবে। বাংলাদেশের ভৌগোলিক অবস্থান, সংখ্যাগরিষ্ট জনগণের ধর্মীয় বিশ্বাসের আলোকে এরকমই হওয়া উচিত ছিল বাংলাদেশের নারী সমাজের সামাজিক অবস্থা। কিন্তু স্বাধীনতার পর এদেশের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সংখ্যাগরিস্ট মুসলিম নারী ও যুব সমাজের মধ্যে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটেছে।[৮১] এই নেতিবাচক পরিবর্তনের ফলে নারী নির্যাতন বৃদ্ধি পেয়েছে। পরিবার, সমাজ, শিক্ষাঙ্গনে নারীর সম্মান ভূলুণ্ঠিত হয়েছে। একটি পরিবার মানুষ গড়ার তথা জাতি গড়ার কারখানা। এ কারখানা থেকেই বেরিয়ে আসে সমাজের ভবিষ্যত নাগরিক। এ কারখানা জিনিস তৈরির কারখানা নয়। সুতরাং স্বামী, সন্তান, ঘর তদারকির দয়িত্ব মায়ের।[৮২]

৮০। শামসুন্নাহার নিজামী, দ্বীন প্রতিষ্ঠায় মহিলাদের দায়িত্ব, ঢাকাঃ সাহিত্য প্রকাশনী, তৃতীয় প্রকাশ, জমাদিউসসানী, ১৪১০, জানুয়ারী-১৯৯০ খ্রিঃ, পৃ-৫।

৮১। মাহমুদ কবীর, প্রাগুক্ত, পৃ-১৯-২০।

৮২। হাফেজা আসমা খাতুন, নারী মুক্তি আন্দোলন ও ইসলাম, ঢাকাঃ সাফওয়ান পাবলিকেশন, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারী, ২০০১খ্রিঃ, পৃ-৩৬।

Dhaka University Institutional Repository

তাই সেই মাকে হতে হবে যোগ্য, শিক্ষিত, সম্মানিত সমাজ ও পরিবারের কাছে। বর্তমানে বাংলাদেশের নারী সমাজ বিভিন্ন নির্যাতনমূলক ব্যবস্থার শিকার এবং এ সকল ব্যবস্থা অধিকাংশ ক্ষেত্রে পুরুষ কর্তৃক সৃষ্ট। এদেশে স্থানীয় পর্যায়ে সামাজিক প্রথাগুলো নারী নির্যাতনের বাহন হিসেবে অনেক সময় কাজ করে। নারী নির্যাতন বিষয়টি শহর অপেক্ষা গ্রামে অধিক হারে লক্ষ্য করা যায়। নারী পুরুষের ভূমিকা সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অঙ্গনে কতকগুলো সামাজিক প্রথার মাধ্যমে রক্ষিত হয়। যেমন ঃ বিয়ের সময় যৌতুক প্রথা ব্যবস্থা এবং নারীর ওপর ব্যক্তি স্বাধীনতার হস্তক্ষেপ ইত্যাদি।[৮৩]

নারী নির্যাতনের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ক্ষেত্র হল যৌন সংক্রান্ত (১৭.৫%) অর্থনৈতিক (৬৫.৮৩%) শারীরিক (৭৮.৩৩%) এবং মানসিক (৮১.৬৭%)।[৮৪] ১৯৯৫ সালে জাতিসংঘ কর্তৃক প্রকাশিত বিশেষ প্রতিবেদনে লিঙ্গ ভিত্তিক নির্যাতনকে সংঙ্গায়িত করা হয়েছে-

Gender violence is a violence against women that result in physical mental, sexual coercion or urbitrars deprivation and a violation of human rights.[৮৫]

সুতরাং নারী নির্যাতনের এ অবস্থার পিছনে কতগুলো সুস্পষ্ট, দৃশ্যমান, বাস্তব কারণ রয়েছে। বাংলাদেশে সেগুলো হল-(ক) নৈতিকতা বর্জিত অশ্লীল চলচ্চিত্র (খ) ফ্যাশন শোর নামে নগ্ননারী দেহ প্রদর্শনী (গ) সুন্দরী প্রতিযোগিতা (ঘ) বর্ষবরণ অনুষ্ঠান (ঙ) থার্টি ফার্স্ট নাইট উদ্‌যাপন (চ) অশ্লীল বিজ্ঞাপন প্রচার ইত্যাদি। সৃষ্টি এ সকল কারণের অনিবার্য পরিণতি নারীত্বের অবমাননা, নারী নির্যাতন, অপহরণ, ধর্ষণ, নারী পাচার, অবৈধ যৌনাচার, অশ্লীলতা, বেহায়াপনা বিবাহ বিচ্ছেদ, এসিড নিক্ষেপ, যৌতুক চাওয়াসহ হাজারো প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ফল।

৮৩। খাদিজা আখতার রেজায়ী, মুসলিম নারীর দায়িত্ব ও কর্তব্য, ঢাকাঃ প্রীতি প্রকাশন, দ্বিতীয় প্রকাশ, রবিউল আওয়াল ১৪১৪, সেপ্টেম্বর, ১৯৯ ও পৃ-৩৬।

৮৪। শিরিন সুলতানা, বৈবাহিক ক্ষেত্রে নারী নির্যাতন, এম.এস.এস. মনোগ্রাফ, সকগই, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৯৮খ্রিঃ, পৃ-২৭৯।

৮৫। মোঃ নূরুল ইসলাম, নারীর নিরাপত্তায় বাংলাদেশে প্রচলিত সামাজিক আইনঃ একটি পর্যালোচনা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা, সংখ্যাঃ ৬৬, ফেব্রুয়ারী, ২০০২ খ্রিঃ পৃ-১৩৫।

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশে নারী নির্যাতনের কারণ ধর্মীয় অনুশাসন নয়; বরং ধর্মীয় অনুশাসনকে উপেক্ষা করে পাশ্চাত্যের অপসংস্কৃতিকে অনুসরণই এর অন্যতম কারণ। বিশ্বের অন্যান্য দেশের সাথে পাল্লা দিয়ে বাংলাদেশেও ক্রমান্বয়ে নারী নির্যাতনের হার বৃদ্ধি পাচ্ছে। আমাদের সমাজে আজ চারিদিকে নারী নির্যাতন, কিশোরী ধর্ষণ, ছাত্র অপহরণ, নারী পাচার, এসিড নিক্ষেপ, যৌতুক সমস্যা প্রভৃতি বিবেকবান মানুষকে আতঙ্কগ্রস্থ করে তুলছে। স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের অস্তিত্ব ও অবস্থান তাঁর তিনদিকে ঘিরে থাকা বৃহৎ প্রতিবেশী রাষ্ট্র দ্বারা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে প্রভাবিত। তাই হিন্দু ধর্মের সাংস্কৃতিক প্রভাব পরিকল্পিতভাবে সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম দেশ বাংলাদেশের উপর চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। তারই বহিঃপ্রকাশ দেখতে পাই আমরা সংস্কৃতি চর্চা ও সৌন্দর্য লালনের নামে অপসংস্কৃতির মাধ্যমে।[৮৬]

বাংলাদেশের নারীবাদী আন্দোলন ও নারীর ক্ষমতায়ন

স্বাধীনতার পর জাতীয় রাজনীতিতে নারীর অংশগ্রহণ ক্রমশই বৃদ্ধি পাচ্ছে। বর্তমানে দেশের বৃহত্তম দু'টি দলের প্রধান নারী হলেও দল দু'টির কাঠামোয় নারীদের অংশগ্রহণ খুবই কম। এদেশের নারী সমাজের আন্দোলন বিভিন্ন অবস্থার ওপর নির্ভরশীল ছিল। নারীর অবস্থান বা আন্দোলন, পারিবারিক অবস্থা, নারীর শিক্ষা, সাংস্কৃতিক কাঠামো, রাজনৈতিক কাঠামো, ধর্মীয় ও সামাজিক অবস্থা, অর্থনৈতিক কাঠামো এবং নারীর মানসিক অবস্থার উপর নির্ভরশীল। বর্তমানে নারী সমাজকে তিনটি ভাগে ভাগ করা যায়-

গ্রামের অশিক্ষিত নারী সমাজ। এই গ্রাম্য নারী সমাজকে আবার দুই ভাগে ভাগ করা যায়- (ক) ধর্ম পরায়না (খ) ধর্মের ব্যাপারে উদাসীন।

শহুরে এবং শিক্ষিত নারী সমাজ। এই শিক্ষিত নারী সমাজকেও তিনটি ভাগে ভাগ করা যায়। (ক) উগ্র আধুনিক এবং পাশ্চাত্যের অনুসারী (খ) পূর্ণাঙ্গভাবে ধর্মনিষ্ঠ না হলেও শালীনতায় বিশ্বাসী এবং (গ) ধর্মনিষ্ঠ নারী সমাজ।

আর এক শ্রেণীর নারী রয়েছে সমাজে এদের অবস্থা নিতান্ত করুণ। তারা হচ্ছে শহরের অশিক্ষিত নারী সমাজ।[৮৭]

৮৬। সরকার সাহাবুদ্দীন আহমেদ, নারী নির্যাতনের রকমফের, ঢাকাঃ বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ, প্রথম প্রকাশ, ৮মার্চ ২০০১খ্রিঃ, পৃ-১৪৩-১৪৫।

৮৭। সামসুন্নাহার নিজামী, নারী মুক্তি আন্দোলন, ঢাকাঃ আধুনিক প্রকাশনী, ৬ষ্ঠ প্রকাশ, সাবান ১৪১২, নভেম্বও ১৯৯৯, পৃ-৯-১৪।

Dhaka University Institutional Repository

নারী পুরুষের সম্পর্ক সমাজের মূল বুনিয়াদ। এটার উপর নির্ভর করে সমাজের মূল ভিত্তি। নারী সমাজ সম্পর্কে পুরুষেরও ভিন্ন ভিন্ন ধারণা রয়েছে। (ক) আলেম এবং ধর্মপরায়ণ শ্রেণী- তারা চান নারীকে তাঁর সঠিক মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করতে। ইসলাম নারীকে যতটুকু স্বাধীনতা দিয়েছে তার সংরক্ষণ করতে। তাঁরা চায় নারী তার নির্দিষ্ট গন্ডির মধ্যে থেকে জ্ঞান বিজ্ঞান চর্চা করুক। বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজে অংশ গ্রহণ করুক, প্রয়োজনে যুদ্ধক্ষেত্রে সহযোগিতা করুক, নারী কল্যাণমূলক বিভিন্ন অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করুক। কিন্তু অধিকারের নামে উচ্ছৃঙ্খল জীবন, বেপর্দা ক্লাবে রেস্তোরায় ঘুরে বেড়ানো, রাস্তাঘাটে সৌন্দর্য প্রদর্শন এটা গ্রহণযোগ্য নয়।[৮৮] (খ) অন্ধ কুসংস্কারবাদী তথাকথিত ধার্মিক ব্যক্তিদের ধারণা-নারী চার দেয়ালের মধ্যে আবদ্ধ থাকবে। শিক্ষাদীক্ষা বা জ্ঞান গবেষণার, উন্নয়নমূলক কাজে অংশ গ্রহণের কোন প্রয়োজন নেই। পর্দার নামে এরা নারীদের উপর কঠোর অবরোধ আরোপ করে। ফলে নারীরা তাদের স্বাভাবিক অধিকার হতে বঞ্চিত হয়। (গ) ধর্মের প্রতি উদাসীন এক শ্রেণীর লোক রয়েছে যেমন কাল তেমন চলভাবে, চলতে এরা অভ্যস্ত। এদের মধ্যে শিক্ষিত অশিক্ষিত উভয় শ্রেণীই রয়েছে। শিক্ষিতরা আনুষ্ঠানিক ইবাদতে অভ্যস্ত।[৮৯] পরিপূর্ণ জীবনে এর কোন প্রভাব নেই। ধর্ম সম্পর্কে জানার আগ্রহও তাদের নেই। (ঘ) ধর্ম বিরোধীদের ধারণা নারী উপভোগের বস্তু। দু'দিনের জীবনে যেমন করে সম্ভব উপভোগ কর। নারীদের পৃথক অস্তিত্ব অস্বীকার করে এরা। (ঙ) মুনাফাখোর ব্যবসায়ী গোষ্ঠী দুনিয়াবী লাভের জন্য যে কোন হীন পন্থা অবলম্বন করতে এরা পিছপা হয় না। সমাজের উন্নতি বা অবনতির দিকে তারা ভ্রূক্ষেপ করে না।[৯০] এদের মধ্যে অনেকেই নারী মর্যাদা, নারী স্বাধীনতার কথাও তার স্বরে বলে বেড়ান। অথচ কর্মক্ষেত্রে এ সকল ব্যক্তিগণই নারীর কদর্য ব্যবহার দ্বারা সমাজকে কলুষিত করেন। মাতা, ভগ্নি, জায়া মর্যাদার নারী জাতির অবমূল্যায়ন করেন।

৮৮। মাওলানা মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম, নভেম্বও ১৯৯৯, পৃ-৯-১৪।
৮৯। শামসুন্নাহার নিজামী, প্রাগুক্ত, পৃ-১৫।
৯০। আসগার হোসেন, অভিষপ্ত এন.জি.ও. এবং আমাদেও ধর্ম স্বাধীনতা ও নারী পৃ-২৪।

Dhaka University Institutional Repository

নারী পুরুষের সম্পর্কে এবং অবস্থানগত এই প্রেক্ষিতে, আমাদের দেশে নারী অধিকার আদায়ের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন সংস্থা ও সংগঠন তৈরি করা হয়েছে। উনসত্তরের গণ অভ্যুত্থান ছাত্র রাজনীতি এবং দলীয় রাজনীতিকে প্রবল করে তোলে। আওয়ামী লীগ এবং কিছু বাম দলীয় নারী রাজনৈতিক নেতা কর্মী সামনে চলে আসেন। এদের মধ্যে আমেনা বেগম, মতিয়া চৌধুরী, মালেকা বেগম, জোহরা তাজউদ্দিন, নূরজাহান মোর্শেদ, সাজেদা চৌধুরী, আইভী রহমান, সুফিয়া কামাল উল্লেখযোগ্য। তথাকথিত প্রগতিশীল নারী এবং বামপন্থী নারী কর্মীদেরকে সংগঠিত করার জন্য ১৯৭০ সালের এপ্রিলে কবি সুফিয়া কামালের নেতৃত্বে গঠন করা হয় মহিলা পরিষদ নামক নারী সংগঠন।[৯১] স্বাধীনতার পর সংবিধানে নারী পুরুষ সমানাধিকারের কথা উল্লেখ থাকায় নারীর অবস্থানের গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন ঘটে। জিয়া সরকারের শাসনামলে ১৯৭৮ সালে নারী ও শিশু বিষয়ক আন্তর্জাতিক নীতিমালা সম্পর্কে দিক নির্দেশনা লাভের জন্য একটি পৃথক মহিলা মন্ত্রণালয় স্থাপন করা হয়।

বাংলাদেশের নারী সংগঠনগুলো নারী আন্দোলনে বিশেষ করে জেন্ডার বিতর্ক, লিঙ্গ সমতা পুরুষের সাথে পাল্লা দিয়ে সমাধিকার আদায়ের আন্দোলনে অগ্রগতি লাভ করেছে। নারী আন্দোলনের বর্তমানের প্রায় সকল সংগঠনের মূল নেতৃত্বে রয়েছে আওয়ামী লীগ এবং কিছু বাম রাজনীতির নারী নেতৃবৃন্দ।[৯২] যারা এদেশের সংখ্যাগরিস্ট মানুষের ধর্মীয়বোধ, বিশ্বাস, চেতনা এবং সাংস্কৃতিক মূল্যবোধের সাথে সংগতিপূর্ণ নয়। বরং বর্তমানে নারী আন্দোলনের বিভিন্ন ইস্যুতে তাদের কথায় ও কাজে প্রকাশ পায় কুর'আন সুন্নাহর বিধানের প্রতি কটাক্ষ।

জন্মগতভাবেই নারী পুরুষ সম্পূর্ণ আলাদা, দৈহিক ও মানসিক সকল দিক থেকে। এটা অস্বীকার করার অর্থ প্রকৃতির নিয়মকে অস্বীকার করা। স্রষ্টার বিধানকে অস্বীকার করা। কোন দেশ ও জাতির কল্যাণ প্রচেষ্টা তার ইতিহাস ঐতিহ্য ও নিজস্ব ধর্মীয় চেতনা এবং সাংস্কৃতিক মূল্যবোধকে উপেক্ষা করে সফল হতে পারে না। পিতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থাকে অস্বীকার করা, লিঙ্গভিত্তিক শ্রম বিভাজন মেনে না নেওয়া, ধর্মীয় মূল্যবোধকে অস্বীকার করা লিঙ্গ বৈষম্য দূর করার যে আন্দোলন নারী সংগঠন এবং এন.জি.ও.গুলো করে যাচ্ছে, এর ফলে সামাজিক ও নৈতিক মূল্যবোধের অবক্ষয় নারী নির্যাতন, এসিড নিক্ষেপ, হত্যা, সন্ত্রাস, পরিবার ব্যবস্থায় ভাঙ্গন, শিক্ষাঙ্গনের সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠ পর্যন্ত ধর্ষণের কালিমা লিপ্ত হয়েছে।[৯৩]

৯১। মালেকা বেগম, প্রাগুক্ত, পৃ-১৬৯।
৯২। মাহমুদ কবীর, প্রাগুক্ত, পৃ-১৫-১৭।
৯৩। মালেকা বেগম, প্রাগুক্ত, পৃ-১৬৯।

Dhaka University Institutional Repository

বরং মধ্যবিত্ত নিম্নবিত্ত গৃহবধু কন্যা জায়া জননীদের অর্থনৈতিক মুক্তি, নারী স্বাধীনতার নামে গৃহ ছাড়া করে রাস্তায় এনে দাড় করিয়েছে। ১৯৯৫-১৯৯৬/১৯৯৬-১৯৯৭ সাল থেকে নারীবাদী আন্দোলন সমাধিকারের আন্দোলন জোরদার হতে থাকে এবং একই সাথে দ্রুত বৃদ্ধি পেতে থাকে নারী নির্যাতনের ঘটনা। ১৯৯৭-২০০১ সাল বিগত বছরগুলোতে নারী ও শিশু নির্যাতনের সংখ্যা বহুগুণে বেড়ে গেছে। নারী আন্দোলনের বিস্তৃতি, প্রতিরোধ, নতুন নতুন কঠোর আইন প্রণীত হওয়া সত্ত্বেও নারী ও শিশু নির্যাতনের হার অনেক বেড়ে গেছে।

১৯৮০ সালের ২৬ জুন তৎকালীন আইনসভার স্পীকার মির্জা গোলাম হাফিজের নিকট ১৭ হাজার মহিলার স্বাক্ষরসহ যৌতুক বিরোধী আইন প্রণয়নের দাবি পেশ করা হয়। এই দাবির প্রেক্ষিতে ১৯৮০ সালের ২৬ ডিসেম্বর যৌতুক বিরোধী আইন পাস হয়।

১৯৮৩ সালে নারী নির্যাতন বিরোধী অধ্যাদেশ জারি করা হয়। ১৯৮৫ সালে এসিড নিক্ষেপ বিরোধী অধ্যাদেশ প্রবর্তন করা হয়। ২০০২ সালে ১৪ মার্চ জাতীয় সংসদে এসিড অপরাধ দমন বিল পাস হয়। নতুন এই আইনে এসিড নিক্ষেপের সর্বোচ্চ শাস্তি মৃত্যুদন্ড দেওয়ার বিধান পাস করা হয়েছে অথবা যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদন্ড এবং এর অতিরিক্ত এক লক্ষ টাকার অর্থ দন্ড। এছাড়া এসিড দ্বারা আহত করার জন্য ৭ বছর সশ্রম কারাদন্ডসহ ৫০ হাজার টাকা জরিমানা প্রস্তাব করা হয়েছে।[৯৪]

এর থেকেই প্রমাণিত হয় যে, নারীদের অনেক সমস্যা রয়েছে, নারীরা নানাভাবে নির্যাতিত হচ্ছে, অধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছে একথা সত্য কিন্তু বিভিন্ন নারী আন্দোলন ও সংগঠন এন.জি.ও. গুলো এই সমস্যা সমাধানে যে পথ ও পদ্ধতি অবলম্বন করেছে তা সম্পূর্ণ ভুল এবং তারা ব্যর্থ। এতে করে সমস্যা আরো ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে। বর্তমানে নারী নির্যাতনের ভাষা, ধরণ বদলেছে সেই সাথে নারী নির্যাতনও বেড়েছে বহুগুণ। তাই নতুন করে চিন্তা করতে হবে নির্যাতনের উৎসমূল কোথায় এবং কিভাবে উৎস মুখ বন্ধ করা যায়, বিস্তাব রোধ করা যায়।

৯৪। মাহমুদ কবীর, প্রাগুক্ত, পৃ-১২৪-১২৬।

Dhaka University Institutional Repository

ইসলাম একমাত্র নারীর অধিকার ও মর্যাদান প্রতিষ্ঠার জন পবিত্র কুর'আন ও হাদীসের মাধ্যমে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মানুষের চিন্তা বিশ্বাসের পরিবর্তন ঘটিয়ে ধর্মীয় মূল্যবোধের প্রতিষ্ঠা করেছেন। নারীর মর্যাদা প্রতিষ্ঠার জন্য পরিবেশ ও সমাজের পরিবর্তন ঘটিয়েছেন। যার ফলে জাহিলিয়াতের সেই যুগ স্বর্ণযুগে পরিণত হয়েছিল। একমাত্র ইসলামই একজন নারীকে স্ত্রীর মর্যাদা, কন্যার অধিকার, মায়ের সম্মানসহ সমাজে, পরিবারে এবং ব্যক্তি জীবনে যথাযোগ্য মর্যাদা দান করেছে। সমাজ ও সংসারে সমান গুরুত্বপূর্ণ সদস্যরূপে প্রতিষ্ঠিত করেছে।[৯৫]

এখনও পর্যন্ত বাংলাদেশের অন্যান্য দেশের তুলনায় যতটুকু ভাল আছে তা শুধুমাত্র ধর্মীয় মূল্যবোধের কারণেই। যেহেতু মানব জাতির সংরক্ষণ ও প্রতিপালন তথা মানব জাতি সম্প্রসারণের পুরো দায়িত্ব মেয়েদের। একজন নারীকে গর্ভধারণ, সন্তান প্রসব, স্তন্যদান, সন্তান প্রতিপালনের মত গুরুত্বপূর্ণ ও কঠিন দায়িত্ব পালন করতে হয় এরপরও যদি জীবিকার্জনে চেষ্টায় পুরুষের পাশে এসে দাঁড়াতে বাধ্য করা হয় তবে সেটা নারী মুক্তি নয় নারী নির্যাতনে পরিণত হয়। তাই একজন নারীকে নারীই থাকতে হবে। যদি তা অস্বীকার করে স্বাভাবিক কর্মক্ষেত্র থেকে বেরিয়ে আসে তখন তারা আর নারী থাকবে না।[৯৬] শুধু নারীই পুরুষের মুখাপেক্ষী একথা ঠিক নয়। কোন কোন ক্ষেত্রে নারীরা যেমন পুরুষের মুখাপেক্ষী তেমনি অনেক ক্ষেত্রে পুরুষও নারীর উপর নির্ভরশীল।

সুতরাং স্বামী ও পরিবারের সাথে সমঝোতা ও সুসম্পর্ক স্থাপনের, ধর্মীয় মূল্যবোধ, নীতি ও নৈতিকতা বোধকে জাগ্রত করার মাধ্যমেই পারিবারিক শৃঙ্খলা স্থাপন এবং সমাজ শান্তি ও স্থিতিশীলতা আসতে পারে। আর এ রকম সুস্থ্য পরিবার এবং শান্তিপূর্ণ সমাজেই সম্ভব নারীর নির্যাতন বন্ধ করা। সম্ভব নারীর অধিকার রক্ষা করে মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করা।

৯৫। মাওলানা মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম, প্রাগুক্ত, পৃ-৬৯।
৯৬। শেখ মুহাম্মদ আব্দুর হাই, নারী অধিকার, পৃ-১৯৩।

Dhaka University Institutional Repository

নারীর ক্ষমতায়ন

বিশ্বব্যাপী উন্নয়নের ধারায় নারীর অংশগ্রহণ এক অবিচ্ছেদ্য বিষয়। বর্তমানকালের বিবর্তনে "উন্নয়নে নারীর অংশ গ্রহণের" ধারা ভিন্ন ভিন্নরূপে প্রকাশিত হতে থাকে। ১৯৫০-৬০ এর দশকে উন্নয়ন নারীর অংশ গ্রহণের ক্ষেত্রটি ছিল স্ত্রী বা ভাল 'মা' রূপে নারীকে গড়ে তোলার মধ্যে সীমাবদ্ধ। ১৯৭৫-৮৫ এই সময়েকাল ছিল নারীর সমতাভিত্তিক অধিকার আদায়ের লক্ষ্যে দক্ষতা বৃদ্ধি, দারিদ্র বিমোচনের মধ্যে সীমাবদ্ধ। নব্বইয়ের দশকে ছিল নারীর অর্থনৈতিক মুক্তি ও নারীর ক্ষমতায়নের মাধ্যমে নারীর উন্নয়নের লক্ষ্য। ক্ষমতায়ন হচ্ছে এমন একটি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে ব্যক্তি নিজের জীবনকে নিয়ন্ত্রণের সক্ষমতা অর্জন করতে পারে। এই সক্ষমতা অর্জন বা ক্ষমতায়নের সূচক হচ্ছে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা, পারিবারিক অর্থ লেনদেনে অংশগ্রহণ, সম্পদ অর্জনের ক্ষমতা, আইনের আশ্রয় নেয়ার ক্ষমতা, প্রজনন ও জন্ম শাসনে নিজের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের ক্ষমতা, বিচরণের গন্ডির প্রসারতা।[৯৭]

বাংলাদেশের নারীবাদী সংগঠন এবং আন্দোলনগুলো ক্রমাগতভাবে বিগত নব্বইয়ের দশকে নারীর ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে দাবি করতে থাকে যে, রাজনীতি ও ক্ষমতা কাঠামোর জনগোষ্ঠীর অর্ধেক অংশ নারী সমাজের আনুপাতিক প্রতিনিধিত্ব ছাড়া কখনোই সত্যিকার গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়। সমাজের প্রতিটি ক্ষেত্রে নারী ও পুরুষ সমতার ভিত্তিতে যৌথ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারলেই কেবল গণতন্ত্র প্রকৃত গুণগত মান অর্জন করবে। সুতরাং উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় নারীকে সম্পৃক্তকরণের মূল হাতিয়ার হল ক্ষমতা কাঠামো ও সিদ্ধান্তগ্রহণের সর্বস্তরে নারীর সক্রিয় অংশ গ্রহণ।[৯৮] দেশের মোট জনসংখ্যার অর্ধেক নারী হলেও এ দেশের রাজনীতিতে নারীর অংশগ্রহণ অত্যন্ত সীমিত। দেশের সরকার প্রধান ও বিরোধীদলীয় নেত্রী নারী হওয়া সত্ত্বেও রাজনীতির সর্বস্তরে নারীদের অংশগ্রহণ খুবই সীমিত। স্থানীয় পর্যায় থেকে জাতীয় পর্যায় পর্যন্ত সকল পর্যায়ের রাজনীতিতেই নারীর অংশ গ্রহণ অত্যন্ত কম। তথাপি নারীরা যে সোচ্চার তা স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচন এবং জাতীয় নির্বাচনে স্বতস্ফূর্ত অংশ গ্রহণ থেকে বুঝা যায়।[৯৯] বাংলাদেশের নারী সমাজ মাঠে ময়দানে সক্রিয় রাজনৈতিক কর্মকান্ডে অংশ গ্রহণ করতে আগ্রহী নয়। কেননা বাংলাদেশ সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম জনগোষ্টির দেশ।

৯৭। সুলতানা মোস্তফা খানম, বাংলাদেশে নারী উন্নয়ন ও ক্ষমতায়নঃ মীম এবং বাস্তবতা, ঢাকাঃ উইমেন গবেষণা ও পাঠচক্র, ২০০২, সংখ্যা ৪, পৃ-৪-৫।

৯৮। আবেদা সুলতানা, ক্ষমতা কাঠামো ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে নারী ঃ বৈশ্বিক ও বাংলাদেশ বিষয়ে একটি অনুসন্ধান। ক্ষমতায়ন ২০০২ সংখ্যা ৩, ঢাকা ঃ উইমেন ফর উইমেন গবেষরা পাঠচক্র, পৃ-১-২।

৯৯। মাহমুদ কবীর, প্রাগুক্ত, পৃ-১০৮।

Dhaka University Institutional Repository

এখানকার ধর্মীয় এবং সামাজিক মূল্যবোধের কারণে নারীরা পুরুষের সাথে একই ময়দানে একই প্লাটফরমে কাজ করতে সম্মত নয়। এটা পরিবেশগত দিক থেকে কোন কোন ক্ষেত্রে সমস্যারও কারণ হয়ে থাকে। তবে পরামর্শদান, পরিকল্পনা গ্রহণ, সাংগঠনিক কার্যকলাপ পরিচালনায় নারীরা অংশ গ্রহণ করতে সক্ষম। বর্তমানে বাংলাদেশের ক্ষমতায়নের কেন্দ্রবিন্দুতে নারীর অবস্থান তার প্রমাণ। এছাড়াও রাজনৈতিক দলের মহিলা শাখায়েও বহু মহিলা কাজ করে যাচ্ছেন।[১০০]

নারীর ক্ষমতায়নের প্রচেষ্টা, প্রস্তাবনা, সাথে সাথে ক্রমানুয়ে ইউনিয়ন পরিষদ ও জাতীয় পর্যায়ে নারীর সক্রিয় রাজনীতিতে অংশ গ্রহণ পূর্বের তুলনায় বৃদ্ধি পেয়েছে। যদিও তা মূল জনসংখ্যার তুলনায় খুবই নগণ্য। আওয়ামী লীগ সরকারের শাসনামলে ১৯৭২ থেকে ১৯৭৫ পর্যন্ত মন্ত্রীসভার ৫০ জন সদস্যের মধ্যে ২ জন ছিলেন মহিলা। ১৯৭৬ থেকে ১৯৮২ সালে বিএনপি সরকারের আমলে মোট ১০১ জন মন্ত্রীর মধ্যে মহিলা ছিলেন ৬ জন। ১৯৮২ থেকে ১৯৯০ সালে জাতীয় পার্টির শাসনামলে মোট ১৩৩ জন মন্ত্রীর ৪ জন ছিলেন মহিলা।[১০১]

জাতীয় সংসদ নির্বাচন ১৯৭৩ সনে নির্বাচিত কোন মহিলা সংসদ সদস্য ছিলেন না। প্রথম সংসদ থেকে বর্তমানে সপ্তম সংসদ পর্যন্ত সংরক্ষিত আসনে মোট ১৬৬ জন মহিলা সদস্য মনোনীত হয়েছেন। এদের মধ্যে একাধিকবার সংসদ সদস্য হয়েছেন ৮ জন। সুতরাং সংসদীয় এই সংরক্ষণ ব্যবস্থা রাজনীতিতে নারীর আগমন তরান্বিত করেছে এমন কথা বলা যায় না।[১০২]

বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর বিগত ৩৭ বছরে ৬টি স্থানীয় সরকার সংস্থার নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। ১৯৭৩, ১৯৭৭, ১৯৮৩-৮৪, ১৯৮৮, ১৯৯২ ২০০৯ সালে। ১৯৭৩ সালের নির্বাচনে ৪৩৫২টি ইউনিয়ন পরিষদের মধ্যে মাত্র ১ জন মহিলা রংপুর থেকে চেয়ারম্যান নির্বাচিত হয়েছিলেন। ১৯৭৭ সালে ৪ জন নির্বাচিত হন। ১৯৮৪ সালে ৪৪৪০টি ইউনিয়ন পরিষদের মধ্যে ০৪ জন মহিলা চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন। ক্ষমতা কাঠামো ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে নারীর অবস্থান ও অংশগ্রহণের এই চিত্র সর্বক্ষেত্রে নারীর ক্ষমতায়নের প্রতীকী বৃদ্ধি মাত্র। সমতার লক্ষ্য অর্জন অনেক দূর ভবিষ্যত। কেননা নারীর সক্রিয় অংশগ্রহণই নারীর সকল সমস্যার সমাধান দিতে সক্ষম নয়।

১০০। নারী ও রাজনীতি, ঢাকা ঃ উইমেন ফর উইমেন, প্রথম সংস্করণ, সেপ্টেম্বর-১৯৯৪, পৃ-৫-৯।
১০১। উইমেন ফর উইমেন, ক্ষমতায়ন সংখ্যা ৩, প্রাগুক্ত, পৃ-১০।
১০২। নারী বার্তা, ১ম বর্ষ, ২য় সংখ্যা, ঢাকা ঃ উইমেন ফর উইমেন ১৯৯৬, নারী ও উন্নয়ন।

Dhaka University Institutional Repository

বরং নারী পুরুষের সম্মিলিত সমাজ ব্যবস্থায় প্রত্যেকের প্রয়োজনীয় অংশগ্রহণ নারী মুক্তির জন্য জরুরী। সেই সাথে সাথে প্রয়োজন পরিবারে নারীর মর্যাদা রক্ষা, সমাজে তার অবস্থান দৃঢ় করা, তাহলে স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় নারীর ক্ষমতায়ন হতে পারে। তবে অবশ্যই এজন্য প্রয়োজন ধর্মীয় মূল্যবোধের বাস্তবায়ন, নৈতিকমান সম্পন্ন শিক্ষিত জনগোষ্ঠি এবং প্রয়োজন জনগোষ্ঠির আত্মসংশোধন ও কর্ম সংশোধনের প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ। তখনই সম্ভবন হবে রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন অর্থাৎ ক্ষমতা কাঠামো ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রতিটি স্তরে নারী যথার্থ অর্থেই ক্ষমতায়িত হবে।[১০৩]

বাংলাদেশের ইসলামী আন্দোলনে নারীর অবদান

আল্লাহ তা'আলার জমীনে আল্লাহ্‌র পূর্ণাঙ্গ দ্বীন ইসলাম পরিপূর্ণরূপে কায়েম করতে যে আন্দোলন, সাধনা ও সংগ্রাম তাকেই ইসলামী আন্দোলন বলা হয়। মানব জাতির জন্মলগ্ন থেকেই ইসলামী আন্দোলনের সূচনা। তাই মানব জাতির ইতিহাস যত প্রাচীন, ইসলামী আন্দোলনের ইতিহাসও ততটা প্রাচীন। ইসলামী আন্দোলন কোন কালের, কোন এক সময়ে গজিয়ে ওঠা কোন অভিনব বস্তু নয়। বরঞ্চ আবহমান কাল থেকে চলে আসা এক নিরবাচ্ছিন্নতার ধারাবাহিক সূত্রে গাঁথা এ আন্দোলন। মূলত এ আন্দোলনের ধারক ও বাহক ছিলেন আল্লার প্রিয় নবী রাসূলগণ। দ্বীন প্রতিষ্ঠার আন্দোলন যেমন ইসলামী আন্দোলন, তেমনি দ্বীন প্রতিষ্ঠার পর বাতিল শক্তি ও চিন্তাধারার আকিদাহ-বিশ্বাস, আমল-আখলাক থেকে তাকে অক্ষুন্ন, অমলিন ও অবিকৃত রাখার চেষ্টা সাধনাও ইসলামী আন্দোলন। শেষ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রতিষ্ঠিত ইসলামী ব্যবস্থাকে অবিকৃত রাখার সংগ্রামই আজীবন করেছেন তাঁর উত্তরসূরী খোলাফায়ে রাশেদীন।[১০৪]

আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামগণের সময়ে তাদের স্ত্রীগণও এ মহান কাজে নিয়োজিত ছিলেন। মহিলাদেরকে ইসলামের দাওয়াত পৌছে দেয়া, তাদেরকে ইসলামী আকিদাহ শিক্ষা দেয়া, তাযকিয়ার কাজে অংশ গ্রহণসহ ইসলামী আন্দোলনের কাজে শেষ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর স্ত্রীগণ ও অসংখ্য মহিলা সাহাবীও অংশ গ্রহণ করেছেন।[১০৫] এমনকি প্রয়োজনে সব ধরণের ত্যাগ এবং কুরবানীও স্বীকার করেছেন। জীবন দেয়ার দৃষ্টান্তও বিরল নয়।

১০৩। সৈয়দা রওশন কাদিও, স্থানীয় পর্যায়ে মহিলাদেও রাজনীতিতে অংশ গ্রহণ প্রক্রিয়ার সমস্যা ও সম্ভাবনা, নারী ও রাজনীতি উইমেন ফর উইমেন গবেষণা ও স্টাডি গ্রুপ, প্রথম সংস্করণ, সেপ্টেম্বও, ১৯৯৪, পৃ-৬।

১০৪। আব্বাস আলী খান, জামায়াতে ইসলামের ইতিহাস, প্রাগুক্ত,পৃ-১২

১০৫। আহমদ মনসুর, বহুবিবাহ, ইসলাম ও মুহাম্মদ (সঃ) প্রাগুক্ত, পৃ-১৯৬-২২৫।

Dhaka University Institutional Repository

পরবর্তীকালে ও প্রত্যেক যুগে এবং প্রত্যেককালেই মহিলারা ইসলামী আন্দোলনের কাজ করেছেন, বিভিন্ন নামে ও নানা পদ্ধতিতে। আল কুরআন, হাদীস ও ইসলামী জ্ঞান অর্জন এবং মহিলাদের কাছে ইসলামী দাওয়াত পৌছে দেয়া এবং সর্বোপরি তাদেরকে সংগঠিত করে তাদের মন-মগজ ও চরিত্রকে ইসলামী যোগ্যতায় ভূষিত করাই এর একমাত্র লক্ষ্য ছিল।

স্বাধীনতার পর বাংলাদেশে নারী অধিকার বিষয়ক বিভিন্ন নারী আন্দোলন জোরদার হয়। নারীর অধিকার আদায়ের লক্ষ্যে নানা কর্মসূচিও তারা বাস্তবায়ন করতে থাকে। কিন্তু নারীর উপযুক্ত অধিকার, মর্যাদা উদ্ধার ও রক্ষার্থে তারা ব্যর্থ হয়। এ সময়ই মহিলাদের মধ্যে ইসলামী আন্দোলনের কাজ করার লক্ষ্যে ঢাকা শহরের বিভিন্ন এলাকায় "মহিলা মজলিশ" নামে ১৯৭৪-১৯৭৫ সাল থেকে একটি সংগঠন কাজ শুরু করে। মহিলা সাহাবীদের আদর্শকে অনুসরণ করে বাংলাদেশে বেশ কিছু মহিলা একত্রিত হয় "মহিলা মজলিশ" নামের এই সংগঠনে। মহিলা মজলিশের তৎকালীন সভানেত্রী ছিলেন তাহেরা সাঈদ। সহ সভানেত্রী ছিলেন সাইয়েদা মুনিরা। এছাড়াও রওশন আরা, শামসুন্নাহার নিজামী, হেনা বেগম, আখতারা সাত্তার, হাসিবা খাতুন, রোকেয়া আনসার, রোকেয়া ইউনুস আলম আরা প্রমুখ এই সংগঠনের সাথে যুক্ত ছিলেন।

ইসলাম প্রিয় নেতাদের সহায়তায় এই "মহিলা মজলিশ" এর ভিত গড়ে উঠেছিল। এদের অনেকেই বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সাথে জড়িত ছিলেন। আবার অনেকে ছিলেন গৃহবধু ও সমাজসেবী। মহিলা মজলিশের এ কাজের সাথে ছাত্রীরাও জড়িত ছিল। অবশ্য সত্তরের দশক পর্যন্ত ছাত্রীদের একক কোন ইসলামী সংগঠন ছিল না।[১০৬] এদের মধ্যে খন্দকার আয়েশা খাতুন, নুরুন্নিসা সিদ্দীকা, নাহিদা আঞ্জুম প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য। রাজধানীসহ বাংলাদেশের সর্বত্র মহিলারা সফর করে গড়ে তোলার চেষ্টা করেছেন মহিলা মজলিশের বিভিন্ন এলাকাভিত্তিক কাজ। এ উদ্যোগে সাড়া দিয়ে ঢাকার রামপুরায় কাজ শুরু করেন মনোয়ারা মাকসুদ। এছাড়াও শামসুন্নাহার মজুমদার, নাজিরা বাজার এলাকায় কাজ শুরু করেন।[১০৭]

১০৬। খন্দকার আয়েশা খাতুনের সাক্ষাৎকার, ৪ই জুলাই, ২০০৩।
১০৭। রোকেয়া ইউনুসের সাক্ষাৎকার, ৫ জুলাই-২০০৩।

Dhaka University Institutional Repository

মহিলা মজলিশের প্রথম অফিস ছিল ৭৬, হৈ চৈ সবুজবাগ ঢাকা। পরবর্তীতে এর অফিস নেওয়া হয় বি.সি.সি. রোড ঠাটারী বাজার। ঢাকার বাইরে বরিশালের ঝালকাঠির দায়িত্বশীল ছিলেন হাফেজা আসমা খাতুন।

সমসাময়িক সময় "মুসলিম মহিলা কল্যাণ ট্রাস্ট" নামে আরও একটি সমাজসেবামূলক প্রতিষ্ঠান কাজ শুরু করে। ইসলামী আদর্শভিত্তিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা, সেলাই প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দরিদ্র মহিলাদের স্বাবলম্বী করে গড়ে তোলা এবং অসহায় দুর্গত মহিলাদের বিভিন্নভাবে সাহায্য সহযোগিতা করাই ছিল এ প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য।[১০৮]

মুসলিম মহিলা কল্যাণ ট্রাস্ট এর চেয়ারম্যান ছিলেন জনাব রাশেদা খাতুন। এবং সেক্রেটারী ছিলেন জনাব রোকেয়া ইউনুস। ট্রাস্টের অন্যান্য সদস্যগণের মধ্যে ছিলেন শামসুন্নাহার নিজামী, রোকেয়া আনসার, শামসুন্নাহার মজুমদার, ফরিদা নাজির এবং খোন্দকার আয়েশা খাতুন। এই ট্রাস্টের কার্যক্রম এখনও পর্যন্ত চালু আছে। মুসলিম মহিলা কল্যাণ ট্রাস্ট পরিচালিত একটি স্কুল রয়েছে এর নাম হযরত আয়েশা (রাঃ) একাডেমী। এই স্কুলটির আরও একটি শাখা ঢাকার শ্যামলীতে বর্তমানে চালু করা হয়েছে।

১৯৭৪ সালে "মুসলিম মহিলা মিশন" নামে একটি ইসলামী সংগঠন কাজ শুরু করে। এ সংগঠনের সভানেত্রী ছিলেন সৈয়দা জাকিয়া খাতুন, এই সংগঠনের সাথে আরও যুক্ত ছিলেন জনাব জাহানারা আজহারী ও আফিফা আযম, এই সংগঠনের পক্ষ থেকেই "মুসলিম মহিলা" নামে সাময়িক একটি পত্রিকা বের করা হয়েছিল।

মহিলা মজলিশের উদ্যোগে ঢাকার বিভিন্ন এলাকায় ইসলামী বইয়ের ছোট ছোট পাঠাগার তৈরী করা হয়। সপ্তাহের একটি নির্দিষ্ট তারিখ ও সময়ে ইসলাম প্রিয় মহিলারা একত্রিত হতেন। ধারাবাহিকভাবে কোরান ও হাদীস থেকে এই মজলিশগুলোতে আলোচনা চলত। মাঝে মাঝে অন্যরাও এই আলোচনায় শরিক হতেন। এভাবে আরও অনেক কর্মী ও নেত্রী তৈরি হতে থাকে। এদের অনেকেই নিজের উদ্যোগে অন্যান্য এলাকায় মহিলা মজলিশের কাজ শুরু করেন।

১০৮। খন্দকার আয়েশা খাতুন ও রাশিদা খাতুন এর সাক্ষাৎকার, ৪ জুলাই ২০০৩।

Dhaka University Institutional Repository

বাড়িভিত্তিক এই সকল লাইব্রেরী থেকে মহিলারা নিয়মিত বই নিয়ে পড়তেন। মহিলা মজলিশের কর্মীরাও এলাকায় এলাকায় মহিলাদের কাছে কুর'আন, হাদীস, ইসলামী বই বিলি ও বিক্রি করতেন। এভাবেই মুসলিম মহিলাদের চিন্তার জগতে পরিবর্তন আসতে শুরু করে।

১৯৭৯ সালের ২৫,২৬ ও ২৭ মে হোটেল ইডেনে সমমনাদের উদ্যোগে এক সম্মেলনের মাধ্যমে জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের কাজ শুরু হয়। ঐ সময় একই সাথে জামায়াতের মহিলা বিভাগও কাজ শুরু করে। ইডেন হোটেলের এই সম্মেলনে সাবেক পূর্ব পাকিস্তানের জামায়াতের মহিলা সদস্যরাও যোগদান করেন। তাদের সংখ্যাও অল্প ছিল না।

১৯৭৯ সালে জামায়াতে ইসলামী মহিলা বিভাগের সুনির্দিষ্ট কোন সাংগঠনিক কাঠামো ছিল না। জনাব রাশিদা খাতুন ও জনাব শামসুন্নাহার নিজামীর উদ্যোগে ঢাকা শহরে জামায়াতে ইসলামী মহিলা বিভাগের কাজ শুরু হয়। জামায়াতের মহিলা বিভাগে এই সময় আরো যাঁরা কাজ করেন তাঁদের মধ্যে সাইয়েদা মুনীরা, শামসুন্নাহার মজুমদান, ফাতেমা খাতুন রোকেয়া আনসার, রোকেয়া ইউনুস, শামসুন্নাহার ইউসুফ, শামসুন নেসা প্রমুখ নেতৃবৃন্দের নাম উল্লেখযোগ্য।[১০৯]

জামায়াতে ইসলামী মহিলা বিভাগ ঢাকা মহানগরীর এই কমিটির অক্লান্ত প্রচেষ্টা এবং জামায়াতে ইসলামী পুরুষ বিভাগের সর্বাত্মক সহযোগিতায় ঢাকা মহানগরীর বিভিন্ন এলাকায় জামায়াতের মহিলা বিভাগের কাজ সম্প্রসারিত হতে থাকে। সার্বক্ষণিত তদারকি, কাজের রিপোর্ট গ্রহণ, বিভিন্ন কাজের দায়িত্ব প্রদানের মাধ্যমে ত্যাগী এক কর্মী বাহিনী ক্রমানুয়ে গড়ে উঠতে থাকে।

১৯৮০ সালে জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ মহিলা শাখার আনুষ্ঠানিকভাবে সাংগঠনিক কাঠামো তৈরি করে দায়িত্ব অর্পণ করা হয়। জনাব রাশিদা খাতুন মহানগরীর সেক্রেটারী এবং রোকেয়া আনসার ছিলেন সহকারী সেক্রেটারী। ঢাকা মহানগরীর কমিটিতে সেই সময় বিভিন্ন দায়িত্ব পালন করেছেন শামসুন্নাহার নিজামী, শামসুন নেসা, রোকেয়া ইউনুসসহ প্রমুখ মহিলা নেতৃবৃন্দ ঢাকা মহানগরীর এই কমিটি ১৯৮০-১৯৯১ সাল পর্যন্ত কাজ করেন। ঢাকা মহানগরীর মহিলা বিভাগের তৎকালীন অফিস ছিল পুরানা পল্টনে।

Dhaka University Institutional Repository

১৯৮০ সাল থেকেই জামায়াতের মহিলা বিভাগ সুনির্দিষ্টভাবে বার্ষিক ও মাসিক পরিকল্পনা গ্রহণ করে এবং পরিকল্পিতভাবে এলাকাভিত্তিতে কাজ করতে থাকে।

জামায়াতে ইসলামী মহিলা বিভাগ নির্দিষ্ট একটি সিলেবাসের ভিত্তিতে পরিকল্পিতভাবে মহিলা কর্মীদের ইসলামী জ্ঞান বৃদ্ধির কার্যক্রম শুরু করে। অর্জিত জ্ঞানের বাস্তবায়নের লক্ষ্যে মাসিক এবং বাৎসরিক স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদী তাযকিয়ার বা আত্মশুদ্ধির এবং ইসলামী জীবন ব্যবস্থা অনুশীলনের লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ ক্যাম্প চালু করা হয়। এই ক্যাম্পগুলো একদিন থেকে পাঁচদিন পাঁচরাত পর্যন্ত স্থায়ী হত। এই ক্যাম্পগুলোতে দিনব্যাপী কুর'আন হাদীস এবং ইসলাম প্রতিষ্ঠায় মহিলা সাহাবীর ত্যাগ কুরবানীর উপর আলোচনা, বইভিত্তিক পাঠচক্র, দরসে কুর'আন, দরসে হাদীস, শিক্ষা দেয়া হত এবং রাতে নৈশ ইবাদত করা হত।

জামায়াতে ইসলামী মহিলা বিভাগ মুসলিম মহিলাদের সামনে ইসলামের পুর্ণাঙ্গ রূপ তুলে ধরে এবং বাস্তব জীবনে তা অনুশীলনের আহবান জানায়। মুসলিম উম্মাহসহ নারী জাতির প্রকৃত কল্যাণ, অধিকার ও মর্যাদা একমাত্র ইসলামই দিতে পারে, একথা মানুষের সামনে উপস্থাপন করে জামায়াতের মহিলা কর্মীরা। ঘরে ঘরে কুর'আন তাফসীরসহ কুর'আন শুধু তেলাওয়াত নয়, অধ্যায়ন ও গবেষণা করা এবং কুর'আন বুঝে পড়ার গুরুত্ব তুলে ধরে। ফলে বেশ কিছু শিক্ষিত মহিলা কুর'আনের পথে আসতে শুরু করেন। ক্রমান্বয়ে মহিলা জামায়াতের কাজও বৃদ্ধি পেতে থাকে। এলাকায় এলাকায় জামায়াতের মহিলা কর্মীরা যাঁর যাঁর যোগ্যতা ও মেধা দিয়ে মা বোনদের কাছে ইসলামের দাওয়াত দিতে থাকেন। একদিকে সাধারণ মানুষের সামনে জামায়াতে ইসলামী ও ইসলামের পরিচয় তুলে ধরা এবং ব্যক্তিজীবনে পূর্ণাঙ্গ ইসলামের অনুসারণ করার আপ্রাণ চেষ্টা চলতে থাকে। একই সাথে সাংগঠনিক মজবুতির জন্য বিভিন্ন স্তরভিত্তিক, মাসিক, ত্রৈমাসিক ষান্মাসিক ও বার্ষিক সম্মেলনসহ বিভিন্ন কর্মসূচী পালন করা হয়। এ সকল সম্মেলনে জামায়াতের উদ্দেশ্য লক্ষ্য ও কর্মসূচী সম্পর্কে স্পস্ট ধারণা দেওয়া হয়। জামায়াতে ইসলামী তাঁর সাংগঠনিক মজবুতি অর্জনের সাথে সাথে ইসলামী জ্ঞানের প্রচার ও প্রসারের লক্ষ্যে এক বিশাল ইসলামী সাহিত্যের ভান্ডার গড়ে তোলে। জামায়াতে কর্মীদের আমল আখলাকের পরিশুদ্ধির লক্ষ্যে মান উন্নয়নের স্তরভিত্তিকভাবে দায়িত্ব বন্টন করে থাকে।

১০৯। খন্দকার আয়েশা খাতুন ও রোকেয়া ইউনুসের সাক্ষাৎকার, ৪ জুলাই, ২০০৩।

Dhaka University Institutional Repository

১৯৭৯ সাল থেকে ১৯৮৬ সাল পর্যন্ত জামায়াতে ইসলামীর যে সাংগঠনিক মজবুতি ও জনশক্তি তৈরি হয় তা নিয়ে ১৯৮৬ সালে জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে। জামায়াতের মহিলা বিভাগও এ নির্বাচনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

১৯৯১ সালে বি. এন.পি সরকার গঠন করলে জামায়াতে ইসলামী মহিলা বিভাগের দু'জন রুকন সংরক্ষিত মহিলা আসনে সংসদ সদস্য হিসেবে মনোনীত হন। এঁরা হলেন জনাব হাফেজা আসমা খাতুন এবং জনাব রাশিদা খাতুন। সংগঠনের সিদ্ধান্তের কারণে ১৯৯১ সালে জনাব রাশিদা খাতুন তাঁর সরকারী চাকুরী থেকে স্বেচ্ছায় অবসর গ্রহণ করেন।[১১০]

জামায়াতের মহিলা বিভাগের সারা দেশভিত্তিক কাজ সৃষ্টির লক্ষ্যে কেন্দ্রে হাফেজা আসমা খাতুনকে দায়িত্বশীল করে একটি সফর টীম গঠন করা হয়। এই টীম হাফেজা আসমা খাতুনের নেতৃত্বে সমগ্র বাংলাদেশ সফর করে চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা, বরিশাল, মাদারীপুর, ফরিদপুর, শরিয়তপুর, রংপুর, দিনাজপুর, নোয়াখালী, ফেনী, সাতক্ষীরাসহ বিভিন্ন জেলায় জামায়াতে ইসলামীর মহিলা শাখা তৈরী করেন। এ সকল শাখার জেলাভিত্তিক দায়িত্বশীলদের নামের কোন তথ্য পাওয়া যায়নি।

যতদূর জানা যায় চট্টগ্রামে মহিলা জামায়াতের প্রথম দায়িত্বশীল ছিলেন ডলি বেগম। ১৯৮০ সালে রাজিয়া আহমেদ এ শাখার দায়িত্বভার গ্রহণ করেন।[১১১] মাদারীপুর জেলার প্রথম দায়িত্বশীল ছিলেন লুৎফুন নাহার। এ ছাড়াও বাংলাদেশের অধিকাংশ জেলায় ও শহরে জামায়াতের শাখা প্রতিষ্ঠিত হয়। জামায়াতের আপ্রাণ প্রচেষ্টায় সকল মহলে জামায়াতের মহিলা শাখা গঠনের চেষ্টা অব্যাহত থাকে।

জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের পুরুষ সংগঠনের পাশাপাশি মহিলা সংগঠনও তাঁদের সাংগঠনিক কাজের ধারা অব্যাহত রেখেছে অদ্যাবধি। যার ফলশ্রুতিতে ঢাকা শহরের প্রতিটি থানাসহ বাংলাদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে, জামায়াতে ইসলামীর কাজ চলছে সুশৃঙ্খলভাবে গড়ে উঠেছে এক বিশাল কর্মী বাহিনী।

১১০। গঠনতন্ত্র, জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ, ঢাকাঃ প্রকাশনা বিভাগ জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ, ১৬শ সংস্করণ, জানুয়ারী, ২০০৩, পৃ-১৪।

১১১। সাক্ষাৎকার, খন্দকার আয়েশা খাতুন, জুলাই-২০০৩।

Dhaka University Institutional Repository

ছাত্রী আন্দোলন

১৯৭১ সালে বিশ্ব মানচিত্রে জন্ম নিয়েছিল অপরূপ সৃষ্টি বৈচিত্র্যে ভরপুর ছোট একটি দেশ বাংলাদেশ। অনেক আশা আকাঙ্খার কেন্দ্র ছিল স্বাধীন বাংলাদেশ। শোষণের হাত থেকে মুক্তি পেয়ে স্বাধীন ভূমিতে, সুন্দর পরিবেশে, প্রতিটি নারী তাঁর অধিকার নিয়ে বেঁচে থাকতে পারবে এটাই ছিল প্রত্যাশা। কিন্তু সামাজিক বিশৃঙ্খলা, নারীর নিরাপত্তাহীনতা, শ্লীলতাহানি, শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস, পাশ্চাত্যের অন্ধ অনুকরণে ছাত্রী সমাজ দিক নির্দেশনাহীনভাবে গতডালিকা প্রবাহে তেসে চলছিল অজানা গন্তব্যে। আদর্শিক শূন্যতা, চরম নৈতিক অবক্ষয়সহ শিক্ষার করাল গ্রাসে ভূলুণ্ঠিত হচ্ছিল প্রতিনিয়ত ছাত্রীদের মর্যাদা ও অধিকার।[১১২] এই পরিস্থিতিতে প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল একদল সচেতন সত্যের সন্ধানী নিবেচিত প্রাণ আলোর দিশারীর। যারা হাত ধরে তুলে আনতে পারবে নির্যাতিত আত্মভোলা ছাত্রী সমাজকে। ইসলামী ছাত্রী সংস্থা এ অনুভূতিরই বাস্তব প্রতিফলন। মুসলমান আজ ভুলে গেছে তার ঐতিহ্য, দূরে সরে গেছে ইসলামের মূল শিক্ষা হতে।

তাই আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত হবার পাশাপাশি ছাত্রী সমাজকে আল্লাহর কুর'আন ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সুন্নাহ অনুযায়ী আদর্শ নারী হিসেবে গড়ে তোলার দায়িত্ব কাধে নিয়ে যাত্রা শুরু করেছিল ছাত্রী সংস্থা।[১১৩]

স্বাধীনতার পর মহিলাদের মধ্যে বিভিন্ন এলাকায় মহিলা মজলিশ, মুসলিহ মিশন, তৌহিদ প্রচার সমিতি নামে মহিলা আঙ্গনে ইসলামের কাজ শুরু হয় বিভিন্ন এলাকায়। কিন্তু ছাত্রীদের মধ্যে আলাদা কোন সংগঠন ছিল না, ইসলামের জন্য কাজ করার। এই অবস্থায় বিচ্ছিন্নভাবে স্ব স্ব উদ্যোগে মুষ্টিমেয় ছাত্রী ইসলামের কাজের সাথে সম্পৃক্ত হতে থাকে।

সত্যের প্রতি শাশ্বত টান, পারিবারিক ঐতিহ্য ছিল এর প্রধান কারণ। এছাড়া মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে বিশেষ কোন ব্যক্তির মাধ্যমে মানবতার পথ প্রদর্শনের ইচ্ছাও ছিল এর অন্যতম কারণ। সংখ্যাগত ও মর্যাদাগত দিক থেকে তেমন উল্লেখযোগ্য না হলেও মুষ্টিমেয় হাতে গোনা কয়েকজন ছাত্রী দ্বীন ইসলাম জানা, ছাত্রীদের মাঝে এ সত্যকে পৌঁছে দেয়া এবং ছাত্রীদের নৈতিক অধঃপতন থেকে মুক্তির পথ দেখানোর তীব্র আকাংখা নিয়ে মহিলা মজলিশের মাধ্যমে দ্বীনি আন্দোলনে শরীক হয়।[১১৪]

১১২। মোহাম্মদ আব্দুল মান্নান, আমাদেও জাতিসত্তার বিকাশধারা, পৃ-১৩৪।

১১৩। ছাত্রী বার্তা, বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রী সংস্থা (ঢাকা ঃ প্রথম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, নভেম্বও ১৯৮৮, রবিউল আওয়াল, ১৪০৯), পৃ-১৭-১৮।

১১৪। আয়েশা খাতুনের সাক্ষাৎকার, জুলাই-২০০৩।

Dhaka University Institutional Repository

তাঁদের মধ্যে প্রথম কাঁতারে ছিলেন খোন্দকার আয়েশা খাতুন, নুরুন্নিসা সিদ্দীকা, নাহিদ আঞ্জুম, আলম আরা প্রমুখ। কিন্তু মহিলা মজলিশে কাজ করতে করতে তীব্রভাবে অনুভূত হতে লাগল, মহিলা অঙ্গন ও ছাত্রী অঙ্গনের কাজের ধরণ ও ক্ষেত্র আলাদা। তাই আলাদা সংগঠন হওয়া দরকার। ছাত্রীদের কাজ তাদের সুযোগ সুবিধা, কর্মপদ্ধতি, সবকিছুই মহিলাদের থেকে আলাদা। তাই আলাদাভাবে কাজের প্রয়োজন আরও তীব্রতর হতে থাকে।

এই প্রয়োজন পূরণের লক্ষ্যে ১৯৭৮ সালের ১২ই জুলাই ঢাকার নাজিরা বাজারে কিছু ছাত্রী একত্রিত হয়ে ছাত্রী সংস্থা গঠনের সিদ্ধান্ত নেয়। খোন্দকার আয়েশা খাতুনকে আহবায়িকা এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম.এ. শেষ বর্ষের ছাত্রী নাসিম হামিদা বানুকে যুগ্ম আহবায়িকা করে ১১ সদস্য বিশিষ্ট আহবায়ক কমিটি গঠন করা হয়। ঐ বছরই ১৫ জুলাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের TSC-এর ক্যাফেটেরিয়ায় এক ছাত্রী সমাবেশে এ সংগঠনের আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দেয়া হয় এবং বিভিন্ন দৈনিক তা প্রকাশিত হয়।[১১৫]

যাঁদের মেধা, মনন, অক্লান্ত শ্রম, আর নিরলস প্রচেষ্টায় এ সংগঠনের সৃষ্টি, সময়ের সেই সাহসী সৈনিকরা হলেন খোন্দকার আয়েশা খাতুন। আহ্বায়িকা, নাসিম হামিদা বানু যুগ্ম আহবায়িকা এবং মারজিয়া বেগম, নুরুন্নিসা সিদ্দীকা, মনোয়ারা সুলতানা, উম্মো সালমা মুন্নি, নাহিদ আনজুম, নূরজাহান বেগম, আনোয়ারা বেগম, ফজিলা বেগম মিতু। হাসিনা আক্তার সদস্যা। ১১ সদস্যবিশিষ্ট এই আহবায়ক কমিটির মাধ্যমে ইসলামী ছাত্রী সংস্থা তার সাংগঠনিক যাত্রা শুরু করে। সংগঠন প্রসারের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে, বাস্তব ময়দানে পদক্ষেপ গ্রহণ, সমমনা মেয়েদের খুঁজে বের করা, মত বিনিময়, একত্রিত করা, উদ্বুদ্ধ করার মাধ্যমে দিন রাত অবিরাম প্রচেষ্টা চলতে থাকে এই শিশু সংগঠনকে দৃঢ় ভিত্তির উপর দাঁড় করানোর।[১১৬]

১১৫। সম্মেলন স্মারক ৯১, বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রী সংস্থা (ঢাকা ৪ জমাদিউল আউয়াল ১৪১২, নভেম্বর ১৯৯১, পৃ-১১।

১১৬। খন্দকার আয়েশা খাতুনের সাক্ষাৎকার গ্রহণ, ২০০৩, সম্মেলন স্মারক ১৯৯১, বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রী সংস্থা, প্রাগুক্ত, পৃ-২৪-২৫।

Dhaka University Institutional Repository

১৯৭৮ সালের ১৪ জুলাই ইসলামী ছাত্রী সংস্থার যাত্রা শুরু হয়। ছাত্রীদের মধ্যে দ্বীন ইসলামের সঠিক ধারণার ব্যাপক প্রচার, প্রসার, ইসলাম প্রিয় ছাত্রীদেরকে সুসংগঠিত করে উন্নত নৈতিক জীবন যাপনের প্রশিক্ষণ দান এবং ছাত্রী সমাজের মর্যাদা প্রতিষ্ঠা ও বিভিন্নমুখী সমস্যা সমাধানের তিন দফা কর্মসূচীর ভিত্তিতে ছাত্রী সংস্থা এক ব্যাপক কর্মসূচী হাতে নেয়। সাধারণ সভা, বিভিন্ন সামাজিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, পোস্টারিং, বিভিন্ন দিবস উপলক্ষে আলোচনা সভা, চা-চক্র, ঈদ পুনর্মিলনী, ইফতার পার্টি, ইত্যাদির মাধ্যমে ছাত্রীদের কাছে ইসলামের সুমহান আদর্শ তুলে ধরা হয়।

সাহিত্য ও সংস্কৃতি মনা ছাত্রীদের নিয়ে গড়ে তোলা হয় নিজস্ব শিল্পী গোষ্ঠী "প্রজ্জলিত বহ্নি শিখা" এবং বিভিন্ন সময়ে সাহিত্য আসরের আয়োজন করা হয়। প্রকৃতির অনাবিল আনন্দ স্রষ্টার অপার মহিমা অবলোকনের উদ্দেশ্যে আয়োজন করা হত বনভোজন। সেখানেও থাকত ইসলামী আদর্শের প্রভাব। এভাবেই যারাই ইসলামের পতাকাতলে সামিল হয়েছে, তাদেরকে উন্নত নৈতিকতার মানে পৌঁছানোর লক্ষ্যে এবং হযরত খাদীজা রাযী আল্লাহু আনহা, হযরত আয়েশা রাযী আল্লাহু আনহা, হযরত উম্মে আম্মারার রাযী আল্লাহু আনহার যোগ্য উত্তরসূরী গড়ে তোলার লক্ষ্যে সাপ্তাহিক, পাক্ষিক, কর্মী বৈঠকে কুর'আন হাদীসের পাঠচক্র সামষ্টিক পাঠ চলতে থাকে। ক্রমান্বয়ে এই প্রশিক্ষণের মে.যাদ বৃদ্ধি করে একদিন ব্যাপী ও তিন দিন তিন রাত ব্যাপী ট্রেনিং ক্যাম্প করা হয়। দিনব্যাপী দারসে কুর'আন, দারসে হাদীস এবং বিখ্যাত মহিলা সাহাবীদের জীবনী থেকে আলোচনা আর রাতে চলে শৈ ইবাদত।

মানবতার কল্যাণ ১৯৮০ সনে এই শিশু সংগঠন ত্রাণ তহবিল গঠন করে মানবতার সেবায় এগিয়ে আসে। ঢাকার বাইরেও সংগঠন দ্রুত প্রসার লাভ করতে থাকে।[১১৭] আল্লাহ্‌র রহমতে উপস্থিতি ও সাড়া এমন আশাব্যঞ্জক ছিল যে পুরো উদ্যমে কাজ শুরু হয়ে যায়। প্রথমে শুধুমাত্র ঢাকার মধ্যে কাজ হবে স্থানীয়ভাবে এটি সিদ্ধান্ত ছিল। কিন্তু ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনার কারণে সারা দেশব্যাপী কাজ করার সিদ্ধান্ত নিতে হয়। ছাত্রী সংস্থার অস্থায়ী কার্যালয় স্থাপিত হয় নাজিরা বাজার। এ সময়ই ১৯৭৯ সালের ২ জুন আহবায়ক কমিটি ভেঙ্গে ফর্মাল কমিটি গঠন করা হয়। ছাত্রী সংস্থা একটি আদর্শিক সংগঠন। একটি ক্যাডারভিত্তিক সংগঠন। এর রয়েছে কয়েকটি ক্যাডার বা স্তর। যা শুধুমাত্র মান ও যোগ্যতার ভিত্তিতেই নির্ধারণ করা হয়। আর এর প্রথম মান হলো সদস্যা। ৮ জন ছাত্রী প্রথম শপথ করে সদস্যা হন।

১১৭। দ্বিতীয় বার্ষিকী সম্মেলন স্মারক ১৯৮০, বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রী সংস্থা, প্রাগুক্ত, পৃ-৪১-৪৫।

Dhaka University Institutional Repository

তাঁরা হলেন, খোন্দকার আয়েশা খাতুন বি.এ. অনার্স ইডেন, নাসিম হামিদা বানু এম.এ. ফলপ্রার্থী (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়), নুরুন্নিসা সিদ্দীকা বি.এসসি, ইডেন, মারজিয়া বেগম, বি.এসসি অনার্স, কেমিস্ট্রি ইডেন, ফজিলা বেগম মিতু, অনার্স পরীক্ষার্থী, কামরুন্নেছা আই.এসসি, লালমাটিয়া কলেজ, নুরুন্নাহার দশম শ্রেণী, মাহমুদা খাতুন এস.এস.সি. পরীক্ষার্থী। এই আটজন ছাত্রীকে নিয়েই প্রথম সরাসরি গোপন ভোট অনুষ্ঠিত হয়। প্রথম সভানেত্রী নির্বাচিত হন খোন্দকার আয়েশা খাতুন। মনোনীত সেক্রেটারী নুরুন্নিস সিদ্দীকা। এই আটশনই পরামর্শ সভার সদস্যা হিসেবে গণ্য হন এবং এঁদের নিয়েই প্রথম সেক্রেটারীয়েট গঠন করা হয়।[১১৮] এই পরামর্শ সভায় সংগঠনের গঠনতন্ত্র অনুমোদন করা হয়। ছাত্রী সংস্থা গঠনের পর ব্যাপকভাবে ঢাকার বাইরে থেকে সাড়া আসতে থাকে। কিন্তু ঠিক ঐ সময় সংগঠনকে কেন্দ্রীয়করণে বিভিন্ন সমস্যা দেখা দেয়।

১৯৭৯ সালের ৬ ও ৭ ডিসেম্বর প্রথম বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।[১১৯] ১৯৮১ সালে প্রথম সদস্যা সম্মেলনে সদস্যদের প্রথম গোপন ভোটে কেন্দ্রীয় সভাপতি নির্বাচিত হন খোন্দকার আয়েশা খাতুন এবং প্রথম সেক্রেটারী জেনারেল রাবিয় খাতুন। কেন্দ্রীয়করণের জন্য সংবিধান প্রণয়ন করা হয়। ঢাকা সিটি এবং অন্যান্য জেলার, জেলা শাখা গঠিত হয়। এমনিভাবেই সংস্থার কাজ ছড়িয়ে পড়ে জেলা শহরগুলো থেকে মহকুমা, মহকুমা থেকে থানা বা উপজেলা, উপজেলা থেকে গ্রামের প্রত্যন্ত অঞ্চল পর্যন্ত।

আল্লাহহীন সাহিত্যের আঙিনায় আল্লাহমুখী চেতনার সয়লাব বইয়ে দেবার উদ্দেশ্যে পর্যায়ক্রমে ছাত্রী সংস্থা প্রতীতি, বাঙময় বৈভব, আর "অগ্নিকণ", "সিয়াম", "আবহ", নামে সাহিত্য পত্রিকা বেশ করছে। ঢাকায় রয়েছে "সমন্বয় সাহিত্য গোষ্ঠী", নামে একটি সাহিত্য সংস্কৃতিক গোষ্ঠী। এছাড়াও শাখাগুলো থেকে বিপরীত শব্দাবলি, প্রত্যাশা, প্রত্যয়, মরু গোলাপ ইত্যাদি সাহিত্য পত্রিকা বের করা হয়। আধুনিক জাহেলিয়াতের বাঁধ ভাঙা সাংস্কৃতিক প্লাবনের মোকাবিলায় নৈতিকতা সৃষ্টির লক্ষ্যে ছাত্রী সংস্থা "রাইয়্যান", "হেরার রাশ্মি","রেনেসা", "প্রতিধ্বনি", "জাগরণী", "ইউসেনা", "সত্যের সন্ধানী", প্রভৃতি সাংস্কৃতিক শিল্পী গোষ্ঠী গড়ে তুলেছে।[১২০]

১১৮। ছাত্রী বার্তা-৮৮, বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রী সংস্থা নভেম্বও, ১৯৮৮, প্রাগুক্ত, পৃ-২০।
১১৯। ছাত্রী বার্তা, বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রী সংস্থা, ১৯৯৮, প্রাগুক্ত, পৃ-২১।
১২০। ছাত্রী বার্তা, বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রী সংস্থা, ১৯৯০, প্রাগুক্ত, পৃ-১১।

Dhaka University Institutional Repository

পবিত্র কুর'আনের আলো ছাত্রী সমাজে পৌঁছে দেয়ার পবিত্র উদ্দেশ্য নিয়ে ১৯৭৮ সালের ১৫ জুলাই বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রী সংস্থা এদেশের বুকে ছোট এক ভিত রচনা করে। সময়ের তীব্র প্রয়োজনে, দুর্গম পথ বেয়ে দৃঢ় পদক্ষেপ এই সংগঠন আজ ইসলামী আন্দোলনের এক অন্যতম শক্তিশালী সংগঠন হিসেবে কাজ করে যাচ্ছে।[১২১]

১২১। সম্মেলন স্মারক ১৯৯৯, বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রী সংস্থা, প্রাগুক্ত, পৃ-২৪-২৫।

Dhaka University Institutional Repository

গ্রন্থপঞ্জি

Dhaka University Institutional Repository

- আল-কুরআনুল করীম
- ড. মুস্‌তাফা আস্‌ সিফায়ী, ইসলাম ও পাশ্চাত্য সমাজে নারী, বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ঢাকা, ডিসেম্বর-২০০৪।
- আব্দুল খালেক, নারী, দীনা পাবলিকেশন্স, ৯৩, মতিঝিল, ঢাকা।
- সাইয়্যেদ জালাল উদ্দীন আনসার উমরী, ইসলামী রাষ্ট্রে নারীর অধিকার, সালাউদ্দিন বইঘর, বাংলা বাজার, ১৯৯৮।
- ড. ক্যাপ্টেন আব্দুল বাছেত, নারীর মর্যাদা; ইসলাম ও অন্যান্য ধর্মে, দৈনিক ইনকিলাব, ১১ এপ্রিল, ২০০৫।
- নারী নির্যাতন, ইসলামী সমাধান, খিলাফত প্রকাশনী, এইচ.এস. সিদ্দিক ম্যানশন, ঢাকা, ২০০৮।
- ইমাম আল জাসসাশ(অনুঃ মাওলানা আবদুর রহীম), আহকামুল কুরআন, ২য় খন্ড, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা-১৯৯৫।
- মাসিক মদীনা, জুন ২০০২ ঃ সীরাতুন্নবী (সঃ) সংখ্যা ৫৫/বি, পুরানা পল্টন, ঢাকা-১০০০।
- ড. মাহবুবা রহমান, কুরআন ও হাদীসের আলোকে নারী, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৫।
- অধ্যক্ষ মুহাম্মদ শামসুল হুদা, নারীর অধিকার ও মর্যাদা, ঢাকা ঃ আসা রাফিয়া বইঘর, ১৯৯৫।
- মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম, পরিবার ও পারিবারিক জীবন, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, ১৯৮৩।
- ড. আল্লামা জামাল আল বাদাভী, ইসলামিক টিচিং কোর্স, ৩য় খন্ড, অনুবাদ ঃ আবু খালদুন আল মাহমুদ, ইসলামের সামাজিক বিধান, ঢাকা ঃ দি পাইওনিয়ার, ১৯৯৯।
- মাওলানা আমীরুল ইসলাম ফরদাবাদী, মহানবী (সঃ) এর পারিবারিক জীবন ও নারী স্বাধীনতা, ঢাকা ঃ ফরদাবাদী মহল, ১৯৯৫।
- আল্লামা আবদুল কাইউম নদভী, ইসলাম আওর আওরাত, লাহোর ঃ ইদারায়ে ইলামিয়া।
- মাওলানা ইসহাক ওবায়দী, যুগে যুগে নারী, ঢাকা, শান্তিধারা প্রকাশনী, ১৯৯৬।
- মুফতী আব্দুল্লাহ ফারুক, ইসলাম রমনীর মাল, আল ফারুক প্রকাশনী, ১৯৯৮।
- চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়, দেববানী।
- আবু মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ ইবন আব্দুর রহমান আল দারেমণ, সুনানুদ দারেমী, ১ম খন্ড, করাচী ঃ কাদীমী কুতুবখানা।
- সমাজ বিজ্ঞান ও ইসলাম, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, গবেষণা বিভাগ, জুন, ২০০১।
- আবু দাউদ, সুলায়মান ইবনুল আশআস,সুনান, ১ম খন্ড কিতাবুত তালাক, দিল্লী, মাকতাবা রাশীদিয়া, প্রা. বি.।
- মাওলানা মোঃ ফজলুর রহমান আশরাফী, ইসলামী উত্তরাধিকার আইনে নারীর অধিকার ও ফারায়াজ, ঢাকা ঃ আর আই এস পাবলিকেশন্স, ১৯৯৫।
- হুজ্জাতুল ইসলাম মোহাম্মদ তাকী মেসবাহ; নারী মানব সমাজের অর্ধেক, ইসলামে নারীর মর্যাদা, ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, ধানমন্ডি, ঢাকা-১৯৮৭।
- শহীদ মুহাম্মদ জাভেদ বাহোনার, ইসলাম ও নারীর অধিকার, ইসলামে নারীর মর্যাদা, ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, ধানমন্ডি, ঢাকা-১৯৮৭।
- ইবন কায়িস আল জাওযিয়্যা, যাদুল মা'আদ (মিসর ঃ মাতবা আ মুসতাফাল বাবিল হলবী, ১৯০৫হিঃ), ১ম খন্ড।

Dhaka University Institutional Repository

- ড. এইচ. এস. মুজতবা হোছাইনঃ হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সঃ) সমকালীন পরিবেশ ও জীবন, ঢাকাঃ ১৯৯৮খিঃ/১৪১৯ হিঃ ঢাকা ইসলামিক রিসার্চ ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ, প্রথম প্রকাশ।
- শিবলী নু'মানী ঃ সীরাতুন্নবী (আযম গড় ঃ মাতবা মা'আরিফ, ১৩৬৯ হিঃ) ২য় খন্ড।
- ইবন আব্দুল রব, আল্ ইস্তী আব, বৈরুত ঃ দারুল জেল, ১৯৫৩ খ্রিঃ, ২য় খন্ড।
- ইমাম মুহাম্মদ ইবন ইসমাঈল বুখারী, সহীহ আল বুখারী, ঢাকা, আধুনিক, ৩য় খন্ড।
- মুহাম্মদ নূরুয্যামান, সংগ্রামী নারী, ঢাকা ঃ আধুনিক প্রকাশনী, ২য় প্রকাশ, জানুয়ারী, ১৯৯৭খ্রিঃ।
- ইবন সায়্যিকদুন্নাস, উয়ূনুল আসর (বৈরুতঃ দারুল জেল, ১৯৭) ২য় খন্ড।
- জালালুদ্দিন সুয়ূতী, আল কানযুল মদফুন (মিসর ঃ মুসতাফাল বাবিল হালবী, ১৯৩৯ খ্রিঃ)।
- মাওলানা আব্দুর রউফ দানাপুরী, আসাহহুস্ সিয়ার (ঢাকাঃ কুতুব খানা রশীদিয়া, ১৯৯০খ্রি)।
- মুহাম্মাদ আব্দুল মা'বুদ আসহাবে রাসূলের জীবন কথা, বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার কাটাবন, প্রথম প্রকাশ, ১৯৯৯ খ্রিঃ রমাদান-১৪২০।
- যরকানী, শাহ শওয়াহিবিল লাদুন্নিয়া (মিসর ঃ তাব'আতুল আযহাবিয়্যা, ১৩২৮ হিঃ, ২য় খন্ড।
- আবু মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ ইবন আব্দুর রহমান আদদারিমী, সুনানুদ দারিমী, ২য় খন্ড।
- ইব্ন কাসীর, আসসীরাতুন নববিয়্যা, মিসর ঃ ইসাল বাবিল হালবী; ১৯৪৬ খিঃ, ৩য় খন্ড।
- মাওলানা আবুল বারাকাত, " আব্দুর রউফ দানাপুরী, ঢাকাঃ কুতুবখানা রশীদিয়া, ১৯৯০ খ্রিঃ।
- ইবনুল আসীর ইস্দুল গাবা ফী মা'রিফাতিস সাহাবা (বৈরুতঃ দারু ইহইয়া, আত-তুরান আল আজাদী, ৫ম খন্ড।
- মুসলিম ইবন হাজ্জাজ আল-কুশায়রী, সহীহ মুসলিম, (দিল্লী ঃ আল-শকতাবা রশীদিয়া, ১৩৭৬ হিঃ, অধ্যায় কিতাবুন নিকাহ।
- সাইয়্যেদ আবুল আলা মওদূদী, আফহীমুল কুরআন, আধুনিক প্রকাশনী, ঢাকা ঃ জুলাই-১৯৯৯, সফর-১৪১৪, ১২শ খন্ড।
- ইবন হাজার আসকালানী, আল-ইসাবা ফী তামযীরিস সাহাবা, বৈরুত ঃ দার আল-ফিকর ১৯৭৮ খ্রিঃ ৪র্থ খন্ড।
- ইবন আবদিল বার; আল ইসতীয়াব-আল-ইসাবা গ্রন্থেও পার্শ্ব টিকা, ২য় খন্ড।
- ইবনুল আসীর, উসুদুল ঢাকা ফী মা'রিফাতিস সাহাবা (বৈরুত ঃ দারু ইহইয়া আত-তুরাস আল আরাবী, ৫ম খন্ড।
- ইফসুফ আল-কানধালুবী, হায়তুস সাহাবা(দিসাযাক, দারুল কালাম, ২য় সংস্করণ, ১৯৮৩ খ্রিঃ), ২য় খন্ড।
- সায়্যিদ 'আব্দুল্লাহ হাশিম' জম'উল ফাওয়াহিদ (মিসর ঃ দারুত অলীফ, ১৯৬১ খ্রিঃ), ২য় খন্ড।
- মুহাম্মদ সায়্যিদ আস সাফাতী, অনুবাদ মাহমুদুল হাসান ইফসুফ, মুসলিম নারী প্রসঙ্গ, ঢাকা ঃ দারুল ইহসান বিশ্ববিদ্যালয়, মে, ২০০০ খ্রিঃ।

Dhaka University Institutional Repository

- তাফসীর কুরতুবী, ১৭/২৬৯; তাফসীর ইবন কাছীর, ৮/৬০-৬১।
- শায়খ ওয়ালী উদ্দিন আবু আব্দুল্লাহ আল খ্বীব (রঃ), অনুবাদ ঃ এস. আফলাতুন কায়সার, "আসমাউর রিজাল" ঢাকাঃ এমদাদিয়া লাইব্রেরী।
- কবিতা সুলতানা, ধন্য আমি নারী, ঢাকা ঃ মদিনা পাবলিকেশন্স, ১৯৯৫।
- সাইয়্যেদ আব্দুল আলা মওদুদী; পর্দা ও ইসলাম, ঢাকা ঃ জাতীয় গ্রন্থ বিতান, বাংলা বাজার, ঢাকা, ১৯৭৫।
- মোহাম্মদ আমীর হোসেন, সমাজ বিজ্ঞান, গ্লোব লাইব্রেরী, ঢাকা-১৯৮২।
- ড. মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান, সমাজ বিজ্ঞান পরিচিতি, হাসান বুক হাউস, ঢাকা-২০০০।
- অধ্যাপক আবদুল খালেক, ইসলামের আলোকে পৌর বিজ্ঞান, আরাফাত পাবলিকেশন্স, ঢাকা-১৯৯৩।
- নারী ও শিক্ষা ঃ উইমেন ফর উইমেন রিসার্চ এন্ড স্টাডি গ্রুপ, ৮/৫, লালমাটিয়া, ঢাকা।
- নাজমির নূও বেগম, উপার্জন ও সামাজিক অবস্থান ঃ নীলগঞ্জের মহিলা, নারী গ্রন্থ প্রবর্তনা, ঢাকা-১৯৮২।
- গাজী শামছুর রহমান, নারী, বাংলাদেশের আইনের ভাষ্য, এসোসিয়েশন ফর সোশ্যাল এডভান্সমেন্ট, ঢাকা-১৯৯০।
- মোহাম্মদ রেজাউল করীম, 'পরিবার গঠনে আর্থ-সামাজিক অবদানসমূহের ভূমিকা' সমবায়ের পরিকল্পনা প্রশিক্ষণ নির্দেশিকা, বাংলাদেশে পল্লী উন্নয়ন বোর্ড, ঢাকা-১৯৮৭।
- তাহমিনা আখতার, মহিলা উন্নয়ন ও পরিকল্পনা, বাংলাদেশ প্রেক্ষাপট, বাংলা একাডেমী, ঢাকা-১৯৯৫।
- সুরাইয়া বেগম, নারী নির্যাতনের একটি দিক, বাংলাদেশে নারীর নির্যাতন, সম্পাদনা-বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীর ও জরিনা রহমান খান) সমাজ নিরীক্ষণ কেন্দ্র, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৮৭।
- রেহনুমা আহমেদ, ধর্মীয় মতাদর্শ ও বাংলাদেশে নারী আন্দোলন, বাংলাদেশ নারী নির্যাতন।
- অলি আল-দীন মুহাম্মাদ, বাব-আল শাফকাত ওয়া-আল রাহমাত আল খলকী।
- ওবায়েদুল্লাহ ইবনে মাস উদ, শরাহ বেকায়া, (অনু-মাওঃ রফিকুল ইসলাম) ইসলামিয়া কুতুবখানা, ঢাকা, ১৯৯৯।
- সম্পাদকীয়, ৬ জুলাই, ২০০২ দৈনিক ইত্তেফাক (উল্লেখ্য যে, Statistical Year Bookc B.B.S.2000-এ বাংলাদেশে মুসলমানের হার শতকরা ৮৮.৩% বলা হয়েছে-যা অভিসন্দর্ভের ভূমিকায় উল্লেখ করা হয়েছে।
- ডুব্লু-গালিচান, উইমেন আন্ডার পলিগেলি, ড. জ্ঞানেশ মৈত্র, নারী জাগৃতি ও বাংলা সাহিত্য, কলকাতা ঃ ন্যাশনাল পাবলিসার্স, ১৯৮৭।
- গোপাল হালদার, বাংলা সাহিত্যেও রূপরেখা (কলিকাতা ঃ এ মুখার্জী অ্যান্ড কোং প্রাইভেট লিমিটেড, প্রথম প্রকাশ, ১৩৬৫।
- মালেকা বেগম, বাংলার নারী আন্দোলন (ঢাকাঃ ইউনিভার্সিনিট প্রেস লিমিটেড, দ্বিতীয় সংস্করণ, ২০০২ খ্রিঃ।
- নির্মল সেনগুপ্ত, রাজর্ষি রামমোহন, সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজ কর্তৃক প্রকাশিত, ১৯৭২ খ্রিঃ।
- এশিয়াটিক জার্নাল, ১৮২৬ খ্রিঃ ভলিয়্যুম ২৩।

Dhaka University Institutional Repository

- চিত্রাদেব, অন্তঃপুরের আত্মকথা, আনন্দ পাবলিশার্স, ১৯৮৪ খ্রিঃ।
- মাহমুদ কবীর, বাংলাদেশের নারী (ঢাকাঃ সুচিপত্র, প্রথম প্রকাশ, ফেব্রুয়ারী, ২০০৩।
- খোকা রায়, সংগ্রামের তিন দশক (১৯৩৮-১৯৮৬) ঢাকাঃ জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী, পুরানা পল্টন, ফেব্রুয়ারী, ১৯৮৭।
- বাঙালী মুসলিম রাজনীতিবিদ, জোবেদা খাতুন চৌধুরীর অবদান উল্লেখযোগ্য শত বছরে বাংলাদেশের নারী, নারী গ্রন্থ প্রবর্তনা।
- সাপ্তাহিক বেগম, সওগাত প্রেস, পটুয়াটুলী, ডিসেম্বও, ১৯৫০।
- আব্বাস আলী খান, জামায়াতে ইসলামীর ইতিহাস, প্রথম খন্ড, ঢাকাঃ জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ প্রকাশনা বিভাগ, দ্বিতীয় প্রকাশ, জমাদিউল আওয়াল ১৪১৭, সেপ্টেম্বর, ১৯৯৬।
- গোলাম কিবরিয়া পিনু, দৌলতন নেসা খাতুন, ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী, প্রথম প্রকাশ, জুন ১৯৯৯ খ্রিঃ।
- অধ্যাপক গোলাম আযম, জীবনে যা দেখলাম, দ্বিতীয় খন্ড, ঢাকাঃ কাসিয়াব প্রকাশন, প্রথম প্রকাশ, ২০০২ ডিসেম্বর।
- ১৯৬৯ সালের দৈনিক ইত্তেফাক, সংবাদ, সাপ্তাহিক বেগম, মালেকা বেগম, নারী আন্দোলনের পাঁচ দশক, ঢাকাঃ অন্য প্রকাশ, প্রথম প্রকাশ, ফেব্রুয়ারী, ২০০২।
- সুফিয়া কামাল, একাত্তরের ডায়েরী, ঢাকাঃ জ্ঞান প্রকাশনী, ১৯৮৯।
- বামাবোধিনী পত্রিকা, ১২০ সংখ্যা, আগষ্ট, ১৮৭০।
- তাহমিনা আলম, বাংলার সাময়িক পত্রে, বাঙালি মুসলিম নারী সমাজ, ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী, প্রথম প্রকাশ, জুন ১৯৯৭ খ্রিঃ।
- মোহাম্মদ আবদুল কাইউস, ঢাকা ঃ মুসলমান সুহৃদ সম্মিলনী সাহিত্যিক, ১৪শ বর্ষ বসন্ত সংখ্যা, ১৩৮৪।
- রওশন আরা বেগম, নবাব ফয়জুন্নেসা ও পূর্ব বঙ্গেও মুসলিম সমাজ, ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী, জুন ১৯৯৩।
- ডাঃ মুহাম্মদ এনামুল হক, মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যে একমাত্র মুসলিম মহিলা কবি, বাংলা একাডেমী পত্রিকা, ১ম সংখ্যা।
- গোলাম মুরশিদ, রাম সুন্দরী থেকে রোকেয়া নারী প্রগতির একশো বছর, ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী, প্রথম প্রকাশ, ১৯৯৩ খ্রিঃ।
- মোবাশ্বেও আলীর 'নবাব ফয়জুন্নেছা' এবং 'রূপজালাল' শত বার্ষিকী স্মরণী: ১৯৭৬, পশ্চিম গাঁও, কুমিল্লা, ১৯৭৭ খ্রিঃ।
- সোনিয়া নিশাত আমীন, বাঙালী মুসলিম নারীর আধুনিকায়ন।
- মুহাম্মদ মুনসুর উদ্দিন, এম.এ. বাংলা সাহিত্যে মুসলিম সাধনা, ১-৩ খন্ড, ৩য় সংস্করণ ঢাকাঃ রতন পাবলিকেশন্স, ১৯৮১ খ্রিঃ।
- রাজিয়া খাতুন চৌধুরানী, বঙ্গীয় মুসলিম মহিলাগণের শিক্ষার ধারা, সওগাত, ভাদ্র ১৩৩৪।
- দি উইটনেস, রোকেয়া সন্ধানে, সম্পাদনায় তাহসিনা তাকিয়া (ঢাকা ঃ প্রকাশকাল-ডিসেম্বর, ১৯৯১ খ্রিঃ।

Dhaka University Institutional Repository

- শামসুন নাহার, রোকেয়া জীবনী, প্রথম প্রকাশ, বুলবুল পাবলিশিং হাউস, জুন মদ্রা (১৯৩৭), ঢাকা ঃ রিয়াদ মাহমুদ, ১৯৮৭।
- মিসেস আর.এস. হোসেন, বঙ্গীয় নারী শিক্ষা সমিতি, সওগাত, ৪র্থ, ১০ম সংখ্যা চৈত্র, ১৩৩৩/১৯২৭।
- বেগম রোকেয়া, ধ্বংসের পথে বঙ্গীয় মুসলমান, মাসিক মোহাম্মদ, জৈষ্ঠ-১৩৩৮।
- বেগম রোকেয়া, গৃহ, মতিচুর, প্রথম খন্ডের প্রবন্ধ।
- শামসুন্নাহার নিজামী, স্বীন প্রতিষ্ঠায় মহিলাদেও দায়িত্ব, ঢাকা ঃ সাহিত্য প্রকাশনী, তৃতীয় প্রকাশ, জমাদিউস সানী, ১৪১০, জানুয়ারী, ১৯৯০।
- হাফেজা আসমা খাতুন, নারী মুক্তি আন্দোলন ও ইসলাম, ঢাকা ঃ সাফওয়ান পাবলিকেশন, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারী, ২০০১ খ্রিঃ।
- খাদিজা আখতার রেজায়ী, মুসলিম নারীর দায়িত্ব ও কর্তব্য, ঢাকা ঃ প্রীতি প্রকাশন, দ্বিতীয় প্রকাশ, রবিউল আওয়াল ১৪১৪, সেপ্টেম্বও, ১৯৯৩।
- শিরিন সুলতানা, বৈবাহিক ক্ষেত্রে নারী নির্যাতন, এম.এস.এস. মনোগ্রাফ, সকগই, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৯৮ খ্রিঃ।
- মোঃ নুরুল ইসলাম, নারীর নিরাপত্তায় বাংলাদেশে প্রচলিত সামাজিক আইনঃ একটি পর্যালোচনা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা, সংখ্যা ঃ ৬৬, ফেব্রুয়ারী, ২০০২খ্রিঃ।
- সরদার সাহাবুদ্দীন আহমেদ, নারী নির্যাতনের রকমফের, ঢাকা ঃ বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ, প্রথম প্রকাশ, ৮ মার্চ, ২০০১ খ্রিঃ।
- আসগার হোসেন, অভিষপ্ত এন.জি.ও. এবং আমাদেও ধর্ম স্বাধীনতা ও নারী।ল
- সুলতানা মোস্তফা খানম, বাংলাদেশে নারী উন্নয়ন ও ক্ষমতায়ন ঃ মীথ এবং বাস্তবতরা, ঢাকা ঃ উইমেন ফর উইমেন গবেষণা ও পাঠচক্র, ২০০২, সংখ্যা ৪।
- আবেদা সুলতানা, ক্ষমতা কাঠামো ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে নারী ঃ বৈশ্বিক ও বাংলাদেশ বিষয়ে একটি অনুসন্ধান। ক্ষমতায়ন ২০০২ সংখ্যা ৩, ঢাকা ঃ উইমেন ফর উইমেন গবেষরা পাঠচক্র।
- নারী ও রাজনীতি, ঢাকা ঃ উইমেন ফর উইমেন, প্রথম সংস্করণ, সেপ্টেম্বর, ১৯৯৪।
- নারী বার্তা, ১ম বর্ষ, ২য় সংখ্যা, ঢাকা ঃ উইমেন ফর উইমেন ১৯৯৬, নারী ও উন্নয়ন।
- সৈয়দা রওশন কাদিও, স্থানীয় পর্যায়ে মহিলাদেও রাজনীতিতে অংশ গ্রহণ প্রক্রিয়ার সমস্যা ও সম্ভাবনা, নারী ও রাজনীতি উইমেন ফর উইমেন, গবেষণা ও স্টাডি গ্রুপ, প্রথম সংস্করণ, সেপ্টেম্বর, ১৯৯৪।
- গঠনতন্ত্র, জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ, ঢাকা ঃ প্রকাশনা বিভাগ, জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ, ১৬শ সংস্করণ, জানুয়ারী, ২০০৩।
- মোহাম্মদ আব্দুল মান্নান, আমাদেও জাতিসত্তার বিকাশধারা।
- ছাত্রী বার্তা, বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রী সংস্থা (ঢাকা ঃ প্রথম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, নভেম্বও ১৯৮৮, রবিউল আওয়াল ১৪০৯)।
- সম্মেলন সারক ঃ ৯১, বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রী সংস্থা (ঢাকা ঃ জমাদিউল আউয়াল ১৪১২, নভেম্বও ১৯৯১।
- খন্দকার আয়েশা খাতুনের সাক্ষাৎকার গ্রহণ, ২০০৩, সম্মেলন স্মারক, ১৯৯৯, বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রী সংস্থা।

Dhaka University Institutional Repository

- Quoted in Mace, Dovid and vera, Marriagee: East and West, Dolphin Books, Double day and co. Ine Ng. 1960.
- Encyclopedia Britanicac in Propotion Encyelopedia Britanicac, Canada, Vol-19, 1974.
- Husain al-shaikh, Studies in the Greek and Romans Civilization.
- Romesh Chandra Mazumdar, "Ideal and Position of Indian Women in Domestic life". Great women of India 9ed0 Swamei and Mazumdar.
- Said Abdullah self Al-Hatimy. Women in Islam, Islamic Publication Ltd. Lahore, Pakistan.
- Professor Indra; Statues of Women in Mahbharat.
- Pospishil, vctor: Divorce and Marrige, London.
- Klansner, Joseph :From Jesus to Paul, London,1964.
- Dr. G. Iebon, Arab Civilization.
- The Jewish Encyclopaedia, Vol.XIII.
- The Encyclopedia Britanicac, Vol-V.
- Philip Hitti, History of the Arabs, London, Sent Martin Press, 1951.
- Robartson Smith : Kinship and Marriage in Early Arabia (Cambrize University Press, 1903).
- Rustum and Zurayk : History of the Arab's and Arabic Culture, Beirut, 1940.
- O' Leary D Lacy : Arabia Before Muhammad, London, 1927 and Jhomas, Berfram, The Arabs, London, 1937.
- Ruth in Ansion (SM) Family : Its Runction nad Desting, Newyourk, Harpar and Brather's, 1989.
- O' Leary De Lacy : Arabia Before Muhammad, London, 1927.
- Tamas Amand : The Prencher of Islam, London, Constable, co-1993.
- Abdel Rahim Umran, Family planing in thd legacy of Islam, New York and London, 1992.
- Hummudovh Abdalati, Islam in Rucus,Al-Madina printing and pablication, Jeddah-1973.
- Thomas. J. Cottle : The sexual Revolution and the young. The New york time Magazine, November, 26, 1972.
- Ruter-Dawn, Jan-7, 1952.
- Prostitution in the U.S.A.P. 64-69.
- Sexual Behaviour in Human Male.
- An encyclopaedia of Britanica, part-23.
- India to day, July 31, 1988. p-67-68, International ed.
- The New straits Times, kuala Lumpur, Malaysia, Hune.23, 1988.
- UN AIDS and WHO : AIDS epidemic update. December, 2004, pl-3.
- UN AIDS : Report on the global HIV/AIDS epidemic, 2002.
- George Lindsey, Revolt of Modern Youth, p 82-87.
- Dr. Eddit Hooker, Laws of set.
- Dr. Henri C. Link, The Discovery of Morals. P-17.

Dhaka University Institutional Repository

- Paul bureau, Towards Moral Bankruptcy, P. 74-75.
- Prof. Fulton, J, Sheen Communism and Conscience of the wert.
- Ayesha Noman, Status of women, University Press lemited-1983.
- The Constitution of the people's Republic of Bangladesh (as modified upto May-2000).
- Gazi Shamsur Rahman, Islamic Law, Islamic Roundation Bangladesh, Dhaka-1981.
- Statistical year Book of Bangladesh-2000, Bangladesh Bureau of statistics, 21st ed.
- M.M. Siddiqui, Women in Islam, Chapt. III.
- The Autobiography of an un known Indian, N.C. Choudhury.
- Khawar Mumtaz and Farida Shaheed (Eds) Woman of Pakistan : Zed books Ltd. London, New Jes Jersey U.S.A. 1987.
- Sayyid Ameer Ali, The Influence of women in Kslam, The Nineteeth century, May,1899.
- Bimanbehari Mazumdar, History of Political thought from Rammohun to dayannda, 1821-84, vol-1 : Bangal (Calcutta, 1934).